রচনামালা।

শ্রীরজনীকান্ত গুপ্ত সঙ্কলিত।

কলিকাতা

৪৬নং পঞ্চাননতলা লেন, ভারতমিহির যন্ত্রে,

শ্রীযাদবচন্দ্র লাহিড়ী দ্বারা মুদ্রিত

ও

২০১নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্, মেডিক্যাল লাইব্রেরী হইতে

শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

১২৯৫।

বিজ্ঞাপন।

একখানি গ্রন্থে ভিন্ন ভিন্ন লেখকের লিখিত রচনাবলী সন্নিবেশিত হইলে, শিক্ষার্থিগণ সেই গ্রন্থখানি পড়িয়া বিভিন্ন লেখকের বিভিন্ন রচনা-প্রণালী অনেকাংশে আয়ত্ত করিতে পারে। এজন্য বিদ্যালয়সমূহে উৎকৃষ্ট প্রবন্ধাবলীর সংগ্রহের অধ্যাপনা হয়। বিশ্ববিদ্যালয়েও এইরূপ সংগ্রহ পাঠ্য হইয়া থাকে। রচনামালাও এই উদ্দেশ্যে সঙ্কলিত ও প্রচারিত হইল। ইহাতে গদ্য ও পদ্য, দুইই সন্নিবেশিত হইয়াছে। যাহা পড়িলে শিক্ষার্থিগণের ভাষা-শিক্ষার সহিত নীতিজ্ঞান জন্মে, রচনা-সংগ্রহকালে তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখা হইয়াছে।

যাঁহাদের রচনা উপস্থিত সংগ্রহে সন্নিবেশিত হইয়াছে, আমি তাঁহাদের নিকট আন্তরিক কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিতেছি।

শ্রীরজনীকান্ত গুপ্ত।

সূচী।

গদ্যাংশ।

ভারত-মহিমা	রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়	১
প্রতাপ সিংহ	রজনীকান্ত গুপ্ত	৯
লোকারণ্য	কালীপ্রসন্ন ঘোষ	২৭
ব্রহ্মচর্য্য	চন্দ্রনাথ বসু	৩১
মহারাষ্ট্রের মহাশক্তি	রজনীকান্ত গুপ্ত	৩৯
শিক্ষা	রজনীকান্ত গুপ্ত	৫৮
অহঙ্কার	অক্ষয়চন্দ্র সরকার	৬২
দ্রৌপদীযুধিষ্ঠির সংবাদ	কালীপ্রসন্ন সিংহ	৬৩
বাঙ্গালার কলঙ্ক	বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	৭১
নন্দিনীর বরপ্রদান	চন্দ্রকান্ত তর্কভূষণ	৭৭
রঘুর তনুত্যাগ	চন্দ্রকান্ত তর্কভূষণ	৮৩
ভারতের বৈষম্যের অন্তরে সাম্য	অক্ষয়চন্দ্র সরকার	৮৫
রামের অরণ্য-যাত্রা	হেমচন্দ্র ভট্টাচার্য্য	৮৭
ভারতে আর্য্য-বসতি	রজনীকান্ত গুপ্ত	৯০
কুরুক্ষেত্র	ভূদেব মুখোপাধ্যায়	৯৫
রণজিৎ সিংহ	রজনীকান্ত গুপ্ত	৯৭

পদ্যাংশ।

রামলক্ষ্মণকর্ত্তৃক সীতার অন্বেষণ	কৃত্তিবাস	১০৯
রামের স্বদেশে প্রত্যাগমন	কৃত্তিবাস	১১৩
ফুল্লরার বার মাসের দুঃখ	কবিকঙ্কণ	১১৪
শ্রীমন্তের সিংহলগমনে মাতার অনুজ্ঞা	কবিকঙ্কণ	১১৫
সাবিত্রীযম-সংবাদ	কাশীরাম দাস	১১৭
জরতীবেশে অন্নদার ছলনা	ভারতচন্দ্র রায়	১২০
অন্নদার ভবানন্দভবনে যাত্রা	ভারতচন্দ্র রায়	১২২
মাতৃভাষা	ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত	১২৪
স্বদেশ	ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত	১২৫
বঙ্গ-ভূমির প্রতি	মাইকেল মধুসূদন দত্ত	১২৬
চিতোরের পতন	রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়	১২৭
গঙ্গার উৎপত্তি	হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	১৩৩
মোহনলালের খেদ	নবীনচন্দ্র সেন	১৩৯

রচনামালা।

গদ্যাংশ।

ভারত-মহিমা।

ভারতবর্ষের মহিমা নিবিড় তমসাচ্ছন্ন। ভারতভূমি মানবসমাবে কি কি উপকার সাধন করিয়াছেন, ভারতসন্তানেরাও ভাবিয়া দেখেন কি না, সন্দেহ। আমরা জানি যে বর্ত্তমান সুসভ্য ইউরোপীয় জাতিগণ য়িহু দেশ হইতে ধর্ম্ম, রোমের নিকট হইতে ব্যবস্থা ও রাজনীতি, এবং গ্রীসে নিকট হইতে বিজ্ঞান, সাহিত্য, ইতিহাস, দর্শন ও শিল্প প্রাপ্ত হইয়াছে কিন্তু ভূমণ্ডলের উন্নতি সম্বন্ধে ভারতবর্ষ কিরূপ সহায়তা করিয়াছে আমাদিগের মধ্যে কয়জন লোকে অবগত আছেন? এই প্রবন্ধে সংক্ষে আমরা এতদ্বিষয়ের সমালোচনা করিব।

বিজ্ঞান লইয়াই বর্ত্তমান সভ্য জাতিদিগের গৌরব; এই নিমিত্ত আম প্রথমে বিজ্ঞানের কথাই বলিব। গণিতই বিজ্ঞানের মূল; বিজ্ঞানশাস্ত্রে যে শাখা যে পরিমাণে গণিতের অধীন হয়, তাহা সেই পরিমাণে উন্নতি লা করে। মাধ্যাকর্ষণের নিয়ম প্রকাশিত হইয়াই জ্যোতিষের এত উন্নতি তাপ, তড়িৎ, আলোক, শব্দ প্রভৃতির কার্য্য সংখ্যাদ্বারা ব্যক্ত করিতে পারিয়াই তাহাদিগের সম্বন্ধে বিজ্ঞানবেত্তৃগণ কত অভিনব তত্ত্ব আবিষ্কা করিয়াছেন। নির্দ্দিষ্ট পরিমাণে পদার্থ সকলের পরস্পর সংযোগ ঘটে, এ নিয়মের আবিষ্ক্রিয়া হইতেই রসায়ন উন্নতিসোপানে আরোহণ করিয়াছে এক্ষণে দেখা যাউক, গণিতসম্বন্ধে ভারতবাসিগণ কি করিয়াছেন।

এক্ষণে অধিকাংশ সভ্য জনপদে যে সংখ্যালিখনপ্রণালী চলিতেছে

ারতবর্ষেই তাহার উৎপত্তি। নয়টী অঙ্ক এবং শূন্যের সাহায্যে সমুদায় ংখ্যা লিখিবার রীতি ভারতবাসীরাই প্রকাশ করেন। এল্‌ফিন্‌ষ্টোন াহেব তৎকৃত "ভারতবর্ষের ইতিহাসে" স্বীকার করিয়াছেন, যে পাটী- ণিতের দশগুণোত্তর সংখ্যালিখনপ্রণালী হিন্দুদিগের সৃষ্টি। ইউরোপ- াসিগণ আরবদিগের নিকটে পাটীগণিত শিক্ষা করিয়াছেন। কিন্তু আর- বরা এতদ্বিষয়ে হিন্দুদিগকে গুরু বলিয়া মানেন। এসিয়াটিক রিসার্চ্চের াদশ খণ্ডে এক জন আরব গ্রন্থকারকে উল্লেখ করিয়া লিখিত আছে, বাহাউল্‌দিন ভারতবাসীদিগকে দশগুণোত্তর প্রণালীর অঙ্কগুলির সৃষ্টিকর্ত্তা লেন। ভারতবাসীরা যে এই অঙ্কগুলির স্রষ্টা, ইহার প্রমাণ একখণ্ড ারবী কবিতাবলীর প্রস্তাবনা হইতে সচরাচর প্রদত্ত হইয়া থাকে, এজন্য লা ভাল যে, সমুদায় আরবী এবং পারসী পাটীগণিত পুস্তকেই ভারত- াসীদিগকে স্রষ্টা বলিয়া উল্লেখ আছে।"

কেবল পাটীগণিত নহে, বীজগণিতও ভারতবাসীদিগের সৃষ্টি। বর্ত্তমান উরোপবাসীরা বীজগণিতও মুসলমানদিগের নিকটে পাইয়াছেন; াজগণিতের আলজেব্রা নামটী আরবী "আল্‌জিবর" শব্দ হইতে সমুৎপন্ন। ষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে লিওনার্ডো নামক ইতালিদেশীয় এক- ্যক্তি মুসলমানদিগের নিকটে বীজগণিত শিক্ষা করিয়া উহা প্রথমে উরোপখণ্ডে প্রচার করেন। আরবেরা যে, বীজগণিতের স্রষ্টা নহেন, াহার বিলক্ষণ প্রমাণ আছে। বিজ্ঞানসম্বন্ধে তাঁহারা হিন্দু এবং ীক জাতির ছাত্র। তাঁহাদিগের নূতন আবিষ্ক্রিয়া কিছুই দৃষ্ট হয় না। াহাদিগের পূর্ব্বে ভারতবর্ষে আর্য্যভট্ট, বরাহমিহির, ব্রহ্মগুপ্ত প্রভৃতি, বং গ্রীসদেশে দিওফান্তস নামক বীজগণিতকার প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। ানি আরব দেশে প্রথমে বীজগণিত প্রচার করেন, তিনি যে ভারতবাসী- াগের শিষ্য, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। সুবিখ্যাত কোলব্রুক সাহেব লিখিয়া- ছন, "মহম্মদ বেন মুসা আরবদিগের মধ্যে প্রথম বীজগণিত প্রকাশ রেন বলিয়া পরিচিত। তিনিই আল্‌মান্ সুরের রাজত্বকালে আল্‌- ামুনের সন্তোষার্থে একখানি ভারতবর্ষীয় জ্যোতিষগ্রন্থের সংক্ষিপ্তসার চনা করেন। তিনি হিন্দুদিগের গণনা-তালিকা সংশোধন করিবার অভি-

প্রায় প্রকাশ করিয়া তদবলম্বন পূর্ব্বক গণনা-তালিকা প্রস্তুত করেন; এ
তিনি ভারতবর্ষীয় সংক্ষিপ্ত গণনাপ্রণালী শিক্ষা করিয়া স্বদেশে প্রচ
করেন।” যে ব্যক্তি পাটীগণিত, জ্যোতিষ প্রভৃতি বিষয়ে হিন্দুদিগে
নিকটে পদে পদে ঋণী, সে ব্যক্তি যে, হিন্দুদিগের বীজগণিত শিক্ষা ক
নাই, ইহা সম্ভব বোধ হয় না। কোলব্রুক সাহেবও এইরূপ বিবেচ
করেন। তিনি বলেন, “গ্রীক ও হিন্দুজাতি আরবদিগের পূর্ব্বে যে বী
গণিত সৃষ্টি করিয়াছিলেন, তদ্বিষয়ে সংশয় নাই; আরবেরা বীজগণিতে
স্রষ্টা বলিয়া দাবিও করে না। বিজ্ঞানসম্বন্ধে তাহারা যে, অন্যের নিক
ঋণী, ইহা তাহারা স্বীকার করিয়া থাকে; এবং তাহাদিগের সর্ব্ববাদিসম্
কথা এই যে, তাহারা হিন্দুদিগের নিকট সংখ্যাশাস্ত্র শিক্ষা করিয়াছি
তাহারা যে, হিন্দুদিগের বীজগণিতও পাইয়াছিল, ইহা যেরূপ সম্ভব,
গণিতবেত্তা ভারতবর্ষীয় পাটীগণিত শিখিয়া আরবদিগকে শিখাইয়াছিলে
তিনি ভারতবর্ষীয় গণিতের কিছুমাত্র সাহায্য না পাইয়া বীজগণিত আ
ষ্কার করিয়াছেন, একথা সেরূপ সম্ভব নহে।”

৭৭৩ খৃষ্টাব্দে খলিফা আল্‌মানসুরের রাজত্বকালে প্রথম আরবগণিতবে
কর্ত্তৃক ভারতবর্ষীয় গণিতগ্রন্থ আরবী ভাষায় অনুবাদিত হয়। ৪
খৃষ্টাব্দে আর্য্যভট্টের জন্ম; ৫৮৭ খৃষ্টাব্দে বরাহমিহিরের মৃত্যু; এবং ৫
খৃষ্টাব্দে ব্রহ্মগুপ্তের জন্ম। সুতরাং যে সময়ে আরবেরা ভারতব
গণিত প্রাপ্ত হইলেন, সে সময়ে এদেশে বীজগণিতের বিলক্ষণ উন্ন
হইয়াছিল। এতদ্দেশীয় গণিতপ্রাপ্তির পরে শত বর্ষাধিক কাল পর্য্য
তাঁহারা গ্রীকগণিতের বিন্দুবিসর্গও জানিতেন না, এবং প্রায় দুই শতা
গত হইলে পর দিওফান্তসের গ্রন্থ অধ্যয়ন করিতে পাইয়াছিলে
অতএব আরবদিগের অনেক পূর্ব্বে এদেশে বীজগণিতের চর্চ্চা হইয়াছি
এবং তাঁহারা প্রধানতঃ এদেশেরই শিষ্য, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। বি
হিন্দুরা গ্রীকদিগের নিকটে বীজগণিত শিক্ষা করিয়াছিলেন কি
বিচার করিয়া দেখা আবশ্যক। গ্রেগরী আবুল ফরাজ নামক একা
আর্ম্মাণী খৃষ্টান লেখক বলেন যে, রোমক সম্রাট জুলিয়ানের সময়ে দিওফা
প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। একথা যদি সত্য হয়, তাহা হইলে অ

টাব্দ দিওফান্তসের প্রাদুর্ভাবকাল; সুতরাং তিনি আর্য্যভট্টেরও শত র্ষের পূর্ব্বের লোক হইতেছেন। কিন্তু আর্য্যভট্টও ভারতবর্ষের প্রথম ণিতবেত্তা নহেন। তাঁহার পূর্ব্বে পরাশর, গর্গ, বশিষ্ঠ প্রভৃতি গণিতবিৎ ণ্ডিতগণ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। অতএব আর্য্যভট্টকে দিওফান্তসের ছাত্র লা যুক্তিযুক্ত হইতেছে না। আর্য্যভট্ট যে, কেবল দিওফান্তসের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, এরূপ নহে; তিনি ও তাঁহার শিষ্যগণ যে প্রকার বীজগণিতের জ্ঞান খাইয়াছেন, দুইশত বৎসর পূর্ব্বে ইউরোপ খণ্ডে তদপেক্ষা অধিক দৃষ্ট ইত না। এস্থলে আর একটী বিষয়ও বিবেচনাযোগ্য। দিওফান্তস্ তিরিক্ত আর কোন গ্রীক বীজগণিতকারের নাম বা গ্রন্থ কোথাও পাওয়া না; এবং প্রাচীন গ্রীক ভাষায় বীজগণিতবোধক একটী শব্দ নাই। স দেশে বীজগণিতের চর্চ্চা থাকিলে এরূপ হইত না। ইহাতে ন্দহ হয় যে দিওফান্তস বিদেশীয় লোকের নিকটে বীজগণিত শিক্ষা রিয়াছিলেন। এই সন্দেহটী যে অমূলক নহে, এসিয়াটিক রিসার্চ্চের দশ খণ্ড পাঠ করিয়া অবগত হওয়া যায়। উহাতে লিখিত আছে, ৫৭৯ খৃষ্টাব্দে বম্বেলি নামক এক ব্যক্তি একখানি বীজগণিত গ্রন্থ প্রকাশ রেন; এবং উক্ত গ্রন্থে তিনি বলেন যে, তিনি এবং রোমের এক জন াদেশক দিওফান্তসের কিয়দংশ অনুবাদ করিয়াছিলেন এবং তাহাতে রতবর্ষীয় গ্রন্থকারদিগের বারংবার উল্লেখ দেখিয়া জানিয়াছিলেন যে, রবদিগের পূর্ব্বে ভারতবর্ষীয়েরা বীজগণিত জানিতেন।" অতএব ভারত-ই যে বীজগণিতের উৎপত্তিস্থান, এতদ্বিষয়ে সংশয় থাকিতে পারে না।

গণিতের পরে রসায়ন দ্বারাই বর্ত্তমান কালে বিজ্ঞানশাস্ত্রের বিশেষ ন্নতি হইয়াছে। কিন্তু রসায়নের মূলও ভারতবর্ষ। ইউরোপীয় কেমিষ্ট্রী রসায়ন আলকেমী হইতে সমুদ্ভূত। কিন্তু আলকেমী নামটী আরবী। হাতেই জানা যাইতেছে যে আরবদিগের নিকট হইতেই ইউরোপবাসিগণ সায়নের প্রথম শিক্ষা পাইয়াছিলেন। কিন্তু আরবেরা এতদ্দেশ হইতে বিষয়ের জ্ঞানলাভ করিয়াছিলেন, কিঞ্চিৎ অনুসন্ধান করিলেই বুঝিতে রা যায়। চরক ও সুশ্রুত এদেশের প্রধান চিকিৎসাগ্রন্থ। আরবেরা দ্যাশিক্ষার প্রতি মনোযোগ দিতে আরম্ভ করিয়া অল্পকালমধ্যে চরক

এবং সুশ্রুত অনুবাদ করিয়া লয়; এবং প্রকাশ্যরূপে ভারতবাসীদিগের নিকটে আপনাদিগের ঋণ স্বীকার করে। খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে বোগদাদের বিখ্যাত বাদসাহ হারনাল রসিদের সভায় দুইজন হিন্দু চিকিৎসক ছিল। হিন্দুরা যে কেবল ভাল চিকিৎসক ছিলেন, এরূপ নহে; তাঁহারা রাসায়নিক বিদ্যায়ও বিলক্ষণ পারদর্শী ছিলেন। এলফিন্‌ষ্টোন সাহেবের "ভারতবর্ষের ইতিহাসে" লিখিত আছে যে তাঁহারা গান্ধকিক অম্ল, যাবক্ষারিক অম্ল ও লাবণিক অম্ল; তাম্র, লৌহ, সীসক, রাং, এবং দস্তার অম্লজানজ; ইত্যাদি অনেক রাসায়নিক প্রক্রিয়া সমুৎপন্ন যৌগিক পদার্থ প্রস্তুত করিতে পারিতেন। এই পদার্থগুলির মধ্যে গান্ধকিক অম্লকে হিন্দুরা মহাদ্রাবক নাম দিয়াছেন; এবং এ নামটী কেমন যুক্তিসঙ্গত, ডাক্তার ওশানসী লিখিত কয়েক পংক্তির নিম্নস্থ অনুবাদ দৃষ্টে প্রতীয়মান হইবে;—"এই দ্রাবকের সাহায্যে আমরা যাবক্ষারিক, লাবণিক প্রভৃতি অন্যান্য দ্রাবক প্রস্তুত করিয়া থাকি। ইহা হইতেই আমরা সস্তায় সোডা, হরিতকাদি উৎপাদন করিতে পারি। ইহা রঙ্গকরের প্রক্রিয়ায় আবশ্যক, এবং ইহা হইতেই আমরা কালোমেল, কুইনাইন প্রভৃতি মহৌষধি পাইতেছি। বস্তুতঃ, যে সময়ে ইউরোপে অল্পব্যয়ে গান্ধকিক অম্ল প্রস্তুত হইতে আরম্ভ হইয়াছে, সেই সময় হইতে রাসায়নিক শিল্পজাত সম্বন্ধে ইউরোপের মহত্ত্বের প্রারম্ভ হইয়াছে।"

ভারতবর্ষ হইতে ভূমণ্ডলের আরও অনেক উপকার হইয়াছে। যে প্রখর প্রতিভা হইতে পাটীগণিত, বীজগণিত ও রসায়ন সমুদ্ভূত, তাহারই গুণে একটী নূতন বর্ণমালারও সৃষ্টি হইয়াছে। পৃথিবীতে তিনটী বর্ণমালা আছে। চীনদেশীয়, ফিনিসীয়, এবং ভারতবর্ষীয়। চীনদেশীয় বর্ণমালা চীন এবং জাপানে প্রচলিত। ফিনিসীয় বর্ণমালা য়িহুদী, মুসলমান এবং ইউরোপীয় জাতিদিগের মধ্যে চলিতেছে। ভারতবর্ষীয় বর্ণমালা ভারতবর্ষ, পূর্ব্ব উপদ্বীপ, তিব্বত, সিংহল ও বালিদ্বীপে দৃষ্ট হয়। কণ্ঠ, তালু, মূর্দ্ধা, দন্ত, ওষ্ঠ, এইরূপ উচ্চারণস্থানভেদে বর্ণোৎপত্তি কল্পিত বলিয়া ভারতবর্ষীয় বর্ণমালাটী যেরূপ বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে গঠিত, অন্য দুইটী তদ্রূপ নহে।

কিন্তু ধর্ম্ম ও নীতি বিষয়েই ভারতবর্ষ মনুষ্যসমাজের মহদুপকার করি-

য়াছেন। খৃষ্ট জন্মিবার প্রায় ছয় শত বৎসর পূর্ব্বে এতদ্দেশে বুদ্ধদেব জন্মগ্রহণ করিয়া জগন্মণ্ডলে প্রেমপূর্ণ সার্ব্বভৌম ধর্ম্ম প্রথম প্রচার করেন। তিনি রাজার পুত্র ও রাজসিংহাসনের উত্তরাধিকারী হইয়া রাজভোগে ছিলেন। ক্ষমতাশালী পিতা, স্নেহময়ী মাতা, পতিপ্রাণা পত্নী, সুন্দর সুত, আজ্ঞাবহ দাসদাসী, অপরিমেয় অর্থ, এ সকল তাঁহার ছিল; কিন্তু এ সকলে তাঁহার মনস্তুষ্টি হইল না। তিনি মানবজাতির দুঃখে কাতর হইয়া রাজ-ভোগ পরিত্যাগ পূর্ব্বক মোক্ষপথের অনুসন্ধানে বহির্গত হইলেন। ক্রমে তাঁহার জ্ঞানচক্ষু খুলিল। জাতিভেদ ও অবস্থাভেদ তাঁহার আর দৃষ্টিরোধ করিল না। তিনি দেখিতে পাইলেন যে, মুক্তিপথে প্রবেশ করিতে সক-লেরই সমান অধিকার। যিনি লোকের যন্ত্রণা অবলোকন করিয়া ব্যাকুল, তিনি পরপীড়ন দেখিতে পারিবেন কেন? তাঁহার হৃদয় হইতে এই মহা-বাক্য নিঃসৃত হইল, "অহিংসাই পরম ধর্ম্ম;" মনুষ্য হউক বা অপর জীব হউক কাহাকেও কষ্ট দিবে না, সকলকে সুখে রাখিবার চেষ্টা করিবে। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র এবং বহুসংখ্যক সঙ্কর জাতির বিবাদভূমিতে একতার বীজ রোপিত হইল। আর্য্য ও ম্লেচ্ছ একই বন্ধনে বদ্ধ হইবার উপায় হইল। ক্রমে সুগভীর সুবিস্তীর্ণ সিন্ধুসলিল অতিক্রম করিয়া, তুষারমণ্ডিত, মেঘভেদী, তুঙ্গশৃঙ্গ শৈলমালা উল্লঙ্ঘন করিয়া, মঙ্গলবার্ত্তা দূরদেশে ছুটিল। সমুদ্র পার হইয়া সিংহলদ্বীপে, হিমালয় অতিক্রম করিয়া চীন সাম্রাজ্যে, বৌদ্ধধর্ম্মের উজ্জ্বল তরঙ্গ লাগিল। পূর্ব্বে লোকে আপন আপন ধর্ম্ম লইয়াই সন্তুষ্ট থাকিত। সত্যধর্ম্ম সর্ব্বত্র প্রচার করিয়া সমুদায় মনুষ্যজাতিকে একধর্ম্মাক্রান্ত করিতে হইবে, এ নূতন ভাব বৌদ্ধধর্ম্মের সঙ্গে সঙ্গে ভূমণ্ডলে প্রথম উদিত হইল। ধর্ম্মপ্রচারকগণ দেশে দেশে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। নূতন উৎসাহে প্রীতিবিস্ফারিত হৃদয়ে তাঁহারা জগতের হিত-সাধনব্রতে ব্রতী হইলেন। সিন্ধু বা ব্রহ্মপুত্র, সাগর বা হিমাচল, কিছুতেই তাঁহাদিগের গতিরোধ করিতে পারিল না। এইরূপে খৃষ্ট জন্মিবার পূর্ব্বেই সিংহল দ্বীপ হইতে চীন পর্য্যন্ত বৌদ্ধধর্ম্মের শান্তিময়ী পতাকা উড্ডীন হইল। অদ্যাপি ভূমণ্ডলে বুদ্ধদেবের যত শিষ্য আছে, তত আর কোন ধর্ম্মপ্রবর্ত্তকের নাই। সকল দেশ, সকল জাতি, সকল বর্ণের জন্য ধর্ম্মের দ্বার বৌদ্ধদেব

প্রথম উদ্ঘাটন করেন। পরে য়িহুদীদেশীয় ঈশা এবং আরববাসী মহম্মদ সেই পথের পথিক হন। কিন্তু ঈশার প্রীতি নরজাতি পর্য্যন্তই বিস্তীর্ণ হইয়াছিল, উহা বৌদ্ধদেবের দয়ার ন্যায় সমুদায় জীবগণকে ক্রোড়ে ধারণ করে নাই। মহম্মদ ঈশ্বরের মহিমা প্রচার করিতে গিয়া ধরণীমণ্ডল নর-শোণিতে প্লাবিত করিয়াছেন। বলদ্বারা বৌদ্ধধর্ম্মের বিস্তার হয় নাই। বুদ্ধশিষ্যগণ অনেক অত্যাচর সহ্য করিয়াছেন, কখন কখন শত্রু-প্রদত্ত তুষানলে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন; কিন্তু অস্ত্রদ্বারা, শারীরিক বিক্রম দ্বারা তাঁহারা ধর্ম্মপ্রচার করিতে চেষ্টা করেন নাই। খৃষ্ট জন্মিবার প্রায় তিন শত বৎসর পূর্ব্বে বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী মগধপতি অশোক বা প্রিয়দর্শী প্রায় সমুদায় ভারতবর্ষের সম্রাট্ ছিলেন; পাষাণস্তম্ভে ও গিরিগাত্রে স্থানে স্থানে তাঁহার যে সকল অনুজ্ঞাপত্র ক্ষোদিত আছে, তাহাতে লোকের মঙ্গল-সাধনার্থে যে প্রকারে যত্ন এবং অন্য ধর্ম্মাবলম্বী লোকের প্রতি যেরূপ উদার ভাব লক্ষিত হয়, তদ্দর্শনে বর্ত্তমান সভ্যতাভিমানী ইউরোপবাসী নরপতি-দিগকেও লজ্জা পাইতে হয়, সন্দেহ নাই। দুর্ভাগ্যক্রমে এক্ষণে বৌদ্ধ-মতাবলম্বী জাতিগণ পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নহেন; কিন্তু যে কেহ মনোযোগ পূর্ব্বক ইতিহাস পাঠ করিয়াছেন, তিনিই স্বীকার করিবেন যে পাশ্চাত্য ভূভাগে ঈশা যে প্রেমজ্যোতি বিকীর্ণ করিয়াছেন, পূর্ব্বভূভাগে বুদ্ধদেব-প্রদীপ্ত প্রেমালোক কোন ক্রমেই তদপেক্ষা হীনপ্রভ নহে। যখন মনে হয় যে অল্প দিন হইল, বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী জাপান রাজ্যের নরপালগণ স্বদেশের উপকারার্থে সম্রাটের হস্তে আপন আপন সৈন্য, গড় ও রাজকোষ সমর্পণ করিয়াছেন, এবং জাপানবাসিগণ মহোৎসাহসহকারে উন্নতিপথে অগ্রসর হইতে যৎপরোনাস্তি চেষ্টা করিতেছেন, তখন আশা হয় বুঝি এসিয়াখণ্ডের পুনর্জ্জীবিত হইবার দিন উপস্থিত হইতেছে।

ভারতবর্ষ ভূমণ্ডলের জ্ঞান ও ধর্ম্ম বৃদ্ধি করিয়াছেন বলিয়া আর কোনরূপ উপকার করেন নাই, এরূপ নহে। এতদ্দেশবাসিগণ সিংহল, যব ও বালি-দ্বীপে উপনিবেশ সংস্থাপন করিয়া তথায় সভ্যতার সূত্রপাত করেন। সিংহলের ধর্ম্মগ্রন্থ সকল যে পালিভাষায় লিখিত, তাহা ভারতবর্ষ হইতে গৃহীত। সিংহলের রাজবংশ বাঙ্গালী। বালিদ্বীপে অদ্যাপি হিন্দু দেব-

দেবীর প্রতিমূর্ত্তি আছে ও তাহাদিগের পূজা হইয়া থাকে; এবং তথায় যে কবিভাষা প্রচলিত, তাহাও সংস্কৃত হইতে উৎপন্ন। পূর্ব্বকালে সিংহল ও ভারতসাগরীয় দ্বীপশ্রেণী হইতে অর্ণবপোতে মুক্তা ও দারুচিনি, এলাচ প্রভৃতি লইয়া আসিয়া ভারতবর্ষীয়গণ পাশ্চাত্য প্রদেশে প্রেরণ করিতেন। এইরূপে তাঁহাদিগের সামুদ্রিক বাণিজ্যের গুণে য়িহুদী, ফিনিসীয়, গ্রীক, রোমক প্রভৃতি অনেক জাতি উপকৃত হইতেন। এক্ষণে সভ্যসমাজে যে কার্পাসবস্ত্রের বহুল ব্যবহার, তাহার উৎপত্তি ভারতবর্ষে। সকলেই স্বীকার করেন যে, কার্পাস শিল্পজাতের জন্মভূমি ভারতবর্ষ। যে ঋগ্‌বেদ প্রায় খৃষ্টজন্মের পঞ্চদশশতবৎসর পূর্ব্বে লিখিত, তাহাতেও তন্ত্রস্থিত কার্পাসবস্ত্রের উল্লেখ দৃষ্ট হয়; সুতরাং তাদৃশ প্রাচীন কালেও এতদ্দেশে কার্পাসবস্ত্র-ব্যবসায় প্রচলিত হইয়াছিল। এতদ্ব্যতিরিক্ত গ্রীক, রোমক প্রভৃতি জাতিগণ যে, ভারতবাসীদিগের নিকট হইতে রেশমের কাপড় পাইতেন তাহারও প্রমাণ আছে। রেশমের উপৎপত্তি চীনেই হউক বা ভারতবর্ষেই হউক, ইউরোপের প্রাচীন সভ্য জাতিগণ যে এতদ্দেশ হইতে পট্টবস্ত্র প্রাপ্ত হইতেন, তাহার সন্দেহ নাই। ভারতবর্ষ বহুকাল পর্য্যন্ত অধিকাংশ সভ্যজনপদের কার্পাস ও রেশমী কাপড় যোগাইতেন। ইংরেজদিগের লিখিত গ্রন্থেই দৃষ্ট হয় যে, একশত বৎসর পূর্ব্বে এদেশে ঘরে ঘরে চরকা ঘুরিত এবং গ্রামে গ্রামে বস্ত্রব্যবসায়ী লোক ছিল। কিন্তু এখন আর সে দিন নাই। আমরা পরিধেয় বস্ত্রের জন্যও ইংরেজদিগের মুখ চাহিয়া থাকি। ম্যানচেষ্টরের কলের কাপড়ই এখন আমাদিগের প্রধান অবলম্বন হইয়াছে। সকল বিষয়েই এইরূপ। যে দেশে পাটীগণিত, বীজগণিত ও রসায়নের সৃষ্টি, সেই দেশের লোকেরাই এখন বিদেশী বিজ্ঞানের ছিটা ফোটা পাইয়াই আপনাদিগের জন্ম সার্থক জ্ঞান করেন। যে দেশে বৌদ্ধধর্ম্মের উৎপত্তি, সেই দেশের কৃতবিদ্য ব্যক্তিগণ সামান্য বিলাতী লেখকদিগকে ধর্ম্মবিষয়ে গুরু বলিতে লজ্জিত হন না। আর কতকাল এইরূপ চলিবে? হে ভারত-সন্তানগণ! ভারতের পূর্ব্বমহিমা স্মরণপূর্ব্বক সকলে একবার আপনাদিগের দুরবস্থা মোচনের চেষ্টা কর। তোমরা কি ছিলে এবং কি হইয়াছ, ভাবিয়া কি দেখিয়াছ?

৺ রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়।

প্রতাপ সিংহ।

প্রতাপ সিংহ মিবারের রাজবংশে জন্মগ্রহণ করেন। মিবারের রাজবংশীয়দিগের সাধারণ উপাধি 'রাণা'। রাণাগণ সূর্য্যবংশীয় বলিয়া পরিচিত ইঁহারা কহিয়া থাকেন, রামচন্দ্রের পুত্র লব, ইঁহাদের বংশের আদিপুরুষ লব পঞ্জাবে লবকোট (আধুনিক লাহোর) নামে একটি নগর স্থাপন করেন। এই লবকোট বা লাহোরই রাণাদিগের পূর্ব্বপুরুষগণের আদি নিবাস-ভূমি লবের বংশধরগণ বহুকাল লাহোরে অবস্থিতি করেন, পরে ইঁহাদের অধিনেতা কনকসেন ১৪০ খ্রীষ্টাব্দে লাহোর হইতে দ্বারকায় যাইয়া বাস করিতে থাকেন। ক্রমে কনকসেনের বংশীয়গণ বল্লভীপুরে রাজধানী স্থাপন করেন। কালক্রমে অসভ্য জাতির আক্রমণে বল্লভীপুর-রাজ বিনষ্ট হন, রাণীগণ ভর্ত্তার সহিত চিতানলে প্রাণ বিসর্জ্জন করেন। কেবল অন্যতমা রাণী পুষ্পবতী, ঘটনাক্রমে স্থানান্তরে থাকাতে ঐ ভীষণ বিপ্লব হইতে রক্ষা পান। জৈনদিগের গ্রন্থানুসারে ঐ বিপ্লব ৫২৪ খ্রীষ্টাব্দে সংঘটিত হয়।

বল্লভীপুর-ধ্বংসের সময়ে পুষ্পবতী গর্ভবতী ছিলেন। বল্লভী-পুরের শোচনীয় সংবাদ পাইয়া, তিনি একটি পর্ব্বতগুহায় আশ্রয় গ্রহণ করেন। এই গুহায় তাঁহার একটি পুত্রসন্তান ভূমিষ্ঠ হয়। পুষ্পবতী, কমলাবতী নাম্নী একটি ব্রাহ্মণ-জায়ার হস্তে তনয়ের রক্ষার ভার সমর্পণ করিয়া, ভর্ত্তার উদ্দেশে চিতাধিরোহণ করেন। গুহায় জন্ম হওয়াতে, পুষ্পবতী-তনয় গুহ নামে অভিহিত হন। কালক্রমে গুহ পার্ব্বত্য প্রদেশের ভিলদিগের অধিনায়ক হইয়া উঠেন। এই গুহ হইতে গোহিলোট (সাধারণতঃ গিহ্লোট) শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে।

গুহের সন্তানগণ অষ্টম পুরুষ পর্য্যন্ত এই পার্ব্বত্য প্রদেশে আধিপত্য করেন। অষ্টম ভূপতির নাম নাগাদিত্য। একদা অসভ্য ভিলগণ বিদেশীয় রাজার শাসনে উত্যক্ত হইয়া নাগাদিত্যের প্রাণ সংহার করে। নাগাদিত্যের বাপ্পা নামে তিন বৎসর-বয়স্ক একটি পুত্রসন্তান ছিল। এক জন ভিল দয়াপরবশ হইয়া, তাহাকে ভাণ্ডিয়ার দুর্গে আনিয়া রক্ষা করে। ভাণ্ডিয়ার হইতে বাপ্পা অধিকতর নিরাপদস্থল পরাশর অরণ্যে আনীত হন। এই

অরণ্যের নিকটেই ত্রিকূট পর্ব্বত রহিয়াছে। পর্ব্বতের পাদদেশে নগেন্দ্র নগর অবস্থিত। নগেন্দ্র নগর ব্রাহ্মণসম্প্রদায় ও ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের জন্য প্রসিদ্ধ ছিল। ব্রাহ্মণগণ এই স্থলে বেদগানে ও বেদোচিত ক্রিয়ার অনুষ্ঠানে সমস্ত সময় যাপন করিতেন। এই পর্ব্বত-পাদদেশে—ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের আশ্রয়ক্ষেত্রে বাপ্পার শৈশবকাল অতিবাহিত হয়।

এই সময়ে চিতোর রাজ্য প্রমরবংশীয় মোরি ভূপতিদিগের শাসনাধীন ছিল। গুহের জননী পুষ্পবতী প্রমরবংশীয় চন্দ্রবতীরাজের দুহিতা। গুহের বংশে বাপ্পারাওর জন্ম, সুতরাং বাপ্পার সহিত প্রমরবংশের সম্বন্ধ ছিল। এই সম্বন্ধের বিষয় অবগত হইয়া, বাপ্পা চিতোরে উপস্থিত হন। চিতোরের তদানীন্তন নৃপতি বাপ্পাকে সাদরে গ্রহণ করিয়া, সেনাপতিপদে প্রতিষ্ঠিত করেন। বাপ্পা এইরূপে চিতোরের সেনাপতি হইয়া কিছুকাল যুদ্ধকার্য্যে ব্যাপৃত থাকেন। যুদ্ধে তাঁহার অসাধারণ বিক্রম প্রকাশিত হয়। কালক্রমে মোরি-কুলের পতন হয়। বাপ্পা ৭২৮ খ্রীষ্টাব্দে চিতোরের সিংহাসন গ্রহণ করেন। কথিত আছে, যখন বাপ্পারাও চিতোরের সিংহাসনে আরোহণ করেন, তখন তাঁহার বয়স পনর বৎসর মাত্র ছিল।

এই বাপ্পারাও চিতোরে গোহিলোট বংশের প্রথম রাজা এবং এই বাপ্পা-রাও "হিন্দু-সূর্য্য" বলিয়া রাজস্থানে সম্মানিত। চিতোর-ভূমি যে, বীরকুল-ধাত্রী ও বীরকুলপ্রসবিনী হইয়া লোকের শ্রদ্ধা ও প্রীতির অধিকারিণী হইয়াছে, এই বাপ্পারাওই তাহার মূল। বাপ্পারাওর বংশধরগণ অনেকবার যবনের বিরুদ্ধে সমুত্থিত হইয়াছিলেন, এবং অনেকবার যবনদিগকে পরাস্ত করিয়া-ছিলেন। যখন পানিপথে লোদীবংশের পতন ও মোগলবংশের অভ্যুদয় হয়, তখন বাপ্পারাওর সন্তানগণ মিবারে সবিশেষ পরাক্রমশালী বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিলেন। এই প্রসিদ্ধ বংশে রাণা সংগ্রাম সিংহের জন্ম হয়। রাণা সংগ্রাম সিংহের পুত্রের নাম উদয় সিংহ। সংগ্রাম সিংহ পুত্রের মুখ দেখিয়া যাইতে পারেন নাই; উদয় সিংহের ভূমিষ্ঠ হইবার পূর্ব্বেই তাঁহার মৃত্যু হয়*। যাহা হউক, উদয় সিংহের বয়স যখন ছয় বৎসর, তখন তাঁহার জীবন

* কথিত আছে, সংগ্রাম সিংহ সর্ব্বদা যুদ্ধে ব্যাপৃত থাকাতে রাজমন্ত্রিগণ বিরক্ত হইয়া, বিষপ্রয়োগে তাঁহার প্রাণ নাশ করেন।

সঙ্কটাপন্ন হইয়া উঠে। উদয় সিংহ স্নেহময়ী ধাত্রী ও এক জন বিশ্ব নাপিতের কৌশলে ঐ সঙ্কট হইতে মুক্তি লাভ করেন *। রাণা সংগ্রা সিংহের সন্তানের জন্য রাজপুতধাত্রীর এই কৌশল জগতের ইতিহা দুর্লভ। যে চিতোরের জন্য, বাপ্পারাওর বংশরক্ষার নিমিত্ত, অবলীল ক্রমে স্নেহের অদ্বিতীয় অবলম্বন ও প্রীতির একমাত্র পুত্তলী শিশু সন্তান মৃত্যুমুখে সমর্পণ করে, তাহার স্বার্থত্যাগ কত দূর উচ্চ ভাবের পরিচায়ক যে স্বদেশের গৌরব রক্ষার্থ হৃদয়রঞ্জন কুসুম কলিকাকে বৃন্তচ্যুত দেখিয়া আপনার কর্ত্তব্যসাধনে পরাঙ্মুখ না হয়, তাহার হৃদয় কত দূর তেজস্বিতা কতদূর স্বদেশহিতৈষিতার পরিপোষক! প্রকৃত তেজস্বী ও প্রকৃত দে হিতৈষী ব্যতীত অন্য কেহ এই তেজস্বিনী নারীর হৃদয়গত মহান্ ভা বুঝিতে পারিবে না। ভীরুপ্রকৃতি, ধাত্রীকে রাক্ষসী বলিয়া ঘৃণা করিে পারে, কিন্তু তেজস্বিনী প্রকৃতি তাহাকে মূর্ত্তিমতী হিতৈষিতা বলিয়া, চি কাল যত্নের সহিত হৃদয়ে রক্ষা করিবে। ফলে ধাত্রীর নিঃস্বার্থ হিতৈষণ তাহার রাক্ষসী ভাবকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে। সাধারণে এমন অসাধার ভাব মনেও ধারণা করিতে পারে না। যাবৎ হিতৈষণা ও তেজস্বিতা সম্মান থাকিবে, তাবৎ এই স্বার্থত্যাগ ও তেজস্বিনী পান্নার নাম কখনও ইতি হাস হইতে বিলুপ্ত হইবে না।

চিতোর হইতে পলায়নের পর উদয় সিংহ বহুকাল পান্নার তত্ত্বাবধান

* বনবীর সংগ্রাম সিংহের ভ্রাতা পৃথ্বীরাজের পুত্র। একটি দাসীর গর্ভে ইঁহা জন্ম হয়। উদয় সিংহের বয়ঃপ্রাপ্তি না হওয়া পর্য্যন্ত বনবীরের হস্তে রাজ্যশাসনের ভা সমর্পিত হয়। কিন্তু রাজ্যলোলুপ বনবীর দীর্ঘ কাল আপনার রাজত্ব অব্যাহত রাখিব জন্য, উদয় সিংহকে বধ করিতে কৃতসংকল্প হন। একদা রাত্রিকালে উদয় সিংহ আহা করিয়া নিদ্রিত আছেন, এমন সময়ে এক জন নাপিত উদয় সিংহের ধাত্রীকে এই ভয়ান সংবাদ জানায়। ধাত্রী তৎক্ষণাৎ একটি ফলের চাঙ্গারির মধ্যে নিদ্রিত উদয় সিংহে রাখিয়া এবং উহার উপরিভাগ পত্রাদিতে আচ্ছাদন করিয়া, নাপিতের হস্তে সমর্পণ করে বিশ্বস্ত নাপিত সেই চাঙ্গারি লইয়া নিরাপদ স্থানে যায়। এমন সময়ে বনবীর অসিহ সেই গৃহে আসিয়া ধাত্রীর নিকটে উদয় সিংহের বিষয় জিজ্ঞাসা করেন। ধাত্রী বা নিষ্পত্তি না করিয়া স্বীয় নিদ্রিত পুত্রের প্রতি অঙ্গুলি প্রসারণ করে। বনবীর উ সিংহবোধে সেই ধাত্রী-পুত্রেরই প্রাণ সংহার করিয়া চলিয়া যান। এ দিকে রাজবংশী কামিনীগণের রোদনধ্বনির মধ্যে ধাত্রী-পুত্রের অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া সম্পন্ন হয়। ধাত্রী নীর ও অশ্রুপূর্ণ নয়নে স্বীয় শিশু সন্তানের অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া দেখিয়া, নাপিতের নিকটে গম করেন। এই ধাত্রীর নাম পান্না।

দেশান্তরে রক্ষিত হন। কালক্রমে মিবারের সর্দ্দারগণ উদয় সিংহকেই চিতোরের বিধিসঙ্গত রাজা বলিয়া স্বীকার করেন। উদয় সিংহের অনুকূলে মিবারের প্রধান প্রধান লোক সমবেত হইয়া, যুদ্ধ উপস্থিত করাতে, বনবীর চিতোর পরিত্যাগ করিয়া দেশান্তরে যাইতে অনুমত হন। সুতরাং, উক্ত রাজ্য উদয় সিংহের অধীন হয়। এইরূপে সুপ্রসিদ্ধ সূর্য্যবংশে জন্মগ্রহণ পূর্ব্বক, বহুকাল দেশান্তরে অজ্ঞাতবাসে থাকিয়া, উদয় সিংহ ১৫৪২ খ্রীষ্টাব্দে ত্রয়োদশ বৎসর বয়সে বাপ্পারাওর সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন। রাজ্যপ্রাপ্তির কিছু পূর্ব্বে তিনি ঝালোরের সর্দ্দারের দুহিতার পাণিগ্রহণ করেন। এই দম্পতীই প্রতাপ সিংহের জননী ও জনক।

প্রতাপ সিংহ কোন্ সময়ে জন্মগ্রহণ করেন, রাজস্থানের ইতিহাসে তাহার কোন উল্লেখ নাই। তবে তাঁহার সমকালে রাজস্থানের বড় শোচনীয় দশা উপস্থিত হয়, মোগলদিগের পুনঃ পুনঃ আক্রমণই এই দশাবিপর্য্যয়ের একমাত্র কারণ। এই আক্রমণের সময় ধরিলে প্রতীত হইবে, প্রতাপ সিংহ খ্রীঃ ষোড়শ শতাব্দীতে ভূমিষ্ঠ হন। যাহা হউক, যে সময়ে প্রতাপ সিংহ বাপ্পা রাওর সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন, সে সময়ে বীরপ্রসবিনী চিতোর-ভূমি কিরূপ অবস্থায় পতিত হইয়াছিল, এক্ষণে তাহা বর্ণিত হইতেছে।

রাজস্থানের প্রসিদ্ধ কবি চাঁদ বর্দ্দে কহিয়াছেন, "যে স্থানে বালক রাজত্ব করে, কিংবা স্ত্রীলোক শাসন-কার্য্য চালায়, সে স্থানকে ধিক্! যে স্থলে এই উভয়ের সমাবেশ হয়, সে স্থলের দুর্দ্দশার আর ইয়ত্তা থাকে না।" চিতোর-রাজ উদয় সিংহ এই বালক ও নারী, উভয়েরই প্রকৃতি ও ধর্ম্ম অধিকার করিয়াছিলেন। তাঁহার পূর্ব্বপুরুষগণ যে তেজস্বিতা ও বীরত্বের আধার ছিলেন, সেই তেজস্বিতা ও বীরত্বে উদয় সিংহের প্রকৃতি সমুন্নত হয় নাই। উদয় সিংহ প্রকৃতপক্ষে নিতান্ত ভীরু ও কাপুরুষ ছিলেন। প্রতাপ সিংহের পিতার এরূপ নিস্তেজ নারী-প্রকৃতি বীরভূমি চিতোরের ইতিহাস কলঙ্কিত করিয়া রাখিয়াছে। এই সময়ে আকবরের ন্যায় এক জন সুযোদ্ধা ও দিগ্বিজয়-পটু সম্রাট্ দিল্লীর সিংহাসনে অধিষ্ঠিত না থাকিলে, উদয় সিংহ চিতোরে সংযত-চিত্ত তপস্বীর ন্যায় কালাতিপাত করিতে পারিতেন। কিন্তু বিধাতা উদয় সিংহের অদৃষ্টে সেরূপ শান্তি লিখেন নাই। সুতরাং চিতোরে

থাকিয়া তিনি শান্তিসুখের অধিকারী হইতে পারিলেন না। এই সুখ-লাভের আশায় তাঁহাকে অন্য উপায় অবলম্বন করিতে হইল। তবে কি রাজপুতের হৃদয় বিকৃত ও রাজপুতনা পূর্ব্ব-গৌরবভ্রষ্ট? রাজস্থানের থর্ম্মাপলি * ও কাঙ্গ্রা (দুর্গ-প্রাচীর) তবে কি অলীক? ইতিহাসের অনুসরণ কর, এই সকল প্রশ্নের সদুত্তর পাইবে।

যে বৎসর উদয় সিংহের রাজ্য-প্রাপ্তিতে কমলমীরের † প্রাসাদ হইতে আনন্দ-কোলাহল সমুত্থিত হয়, সেই বৎসরই ক্রন্দনধ্বনির মধ্যে অমরকোটে একটি বালক জন্মগ্রহণ করে। কমলমীরের আনন্দস্বর সমস্ত মিবারে পরিব্যাপ্ত হয়, অমরকোটের শোক-স্বর বৃক্ষ-লতাশূন্য বিজন মরুভূমির বায়ুর সহিত মিশিয়া যায়। উদয় সিংহ সিংহাসনে অরোহণ করাতে, কমলমীরের জনগণ সমবেত ব্যক্তিদিগকে মুক্তহস্তে ধন দান করে; অমরকোটের বালক জন্মগ্রহণ করাতে, তাহার পিতা অন্য সম্পত্তির অভাবে একটি সামান্য কস্তূরী খণ্ড খণ্ড করিয়া, সমবেত বন্ধু-জনের মধ্যে বিতরণ করেন। এক সময়ে চিতোরের উদয় সিংহের সহিত অমরকোটের বালকের এইরূপ প্রভেদ ছিল, এক সময়ে একের সিংহাসনাধিরোহণ ও অপরের জন্মগ্রহণ এইরূপ বিসদৃশ ঘটনায় সূচিত হইয়াছিল। কিন্তু পরিবর্ত্তনশীল সময়ের সহিত পরিশেষে এই মরু-প্রান্তবর্ত্তী বালকের অবস্থাও পরিবর্ত্তিত হয়। কালে এই বালকের দোর্দ্দণ্ড প্রতাপ হিমালয় হইতে সুদূর কুমারিকা পর্য্যন্ত ব্যাপিয়া পড়ে, এবং কালে এই বালকের উদ্দেশে "দিল্লীশ্বরো বা জগদীশ্বরো বা" ধ্বনি উত্থিত হইয়া, সুদূর গগনতলে বিলীন হয়।

এই বালকের নাম আকবর। হুমায়ুন যখন রাজ্যভ্রষ্ট, শ্রীভ্রষ্ট হইয়া দেশান্তরে পলায়িত, তখন বিস্তীর্ণ ভারত-মরুর এক খণ্ড ওয়েসিসে ভারতের এই ভাবী সম্রাট ভূমিষ্ঠ হন। হুমায়ুন যেরূপে রাজ্য হইতে তাড়িত হইয়া দুরবস্থায় পড়েন, তাহা ইতিহাসে সবিশেষ বর্ণিত আছে। এ স্থলে তদ্বিষয়ের উল্লেখের কোন প্রয়োজন নাই; কেবল ইহা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে,

* থর্ম্মাপলি গ্রীস দেশের একটি প্রসিদ্ধ গিরি-সঙ্কট। এই স্থানে গ্রীক সেনাপতি লিওনিদস্ স্বদেশের স্বাধীনতারক্ষার্থ পারসীকদিগের সহিত যুদ্ধ করিয়া, প্রাণ বিসর্জ্জন করেন। হল্‌দিঘাট রাজস্থানের থর্ম্মাপলি।

† কমলমীরের প্রকৃত নাম কুম্ভমেরু। মিবারের রাণা কুম্ভ এই দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন।

পুত্রের জন্মসময়ে হুমায়ুনের ললাট হইতে রাজটীকা বিচ্যুত হইয়াছিল, হস্ত হইতে রাজ-দণ্ড অপহৃত হইয়াছিল, এবং দেহ হইতে রাজ-পরিচ্ছদ অপসারিত হইয়াছিল, দিল্লীর অর্দ্ধচন্দ্রশোভিত পতাকা মোগলের পরিবর্ত্তে শূরবংশের শাসন-চিহ্ন প্রকাশ করিতেছিল, এবং দিল্লীর রত্নখচিত সিংহাসন মোগল-বংশীয়ের পরিবর্ত্তে শূরবংশীয় শেরশাহের দেহ-কান্তিতে শোভিত হইতেছিল।

হুমায়ুন রাজ্যভ্রষ্ট হইয়া, দেশান্তরে দ্বাদশ বর্ষকাল অতিবাহিত করেন। এই অনতিদীর্ঘ সময়ের মধ্যে শূরবংশীয় ছয় জন নৃপতি ক্রমে দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করেন। সর্ব্বশেষ ভূপতির নাম সেকন্দর। ১৫৫৪ খ্রীষ্টাব্দে আকবরের পরাক্রমে সেকন্দর শূর পরাজিত ও রাজ্য হইতে তাড়িত হন। এই সময়ে আকবরের বয়স দ্বাদশ বৎসর, এই বয়সেই তাঁহার পিতামহ ফর্গনার সিংহাসন অধিকার করিয়াছিলেন। সেকন্দরের পর হুমায়ুন পুনরায় দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করেন। কিন্তু তিনি দীর্ঘকাল রাজত্ব-সুখ ভোগ করিতে পারেন নাই। রাজ্য-পুনঃপ্রাপ্তির ছয় মাস পরে তিনি একদা স্বীয় পুস্তকালয়ের সোপান হইতে পতিত হইয়া দারুণ আঘাত প্রাপ্ত হন। এই আঘাতেই তাঁহার মৃত্যু হয়। প্রাচ্য ভূপতিগণ পুস্তকালয়ে থাকিয়া, পুস্তকপাঠে অনেক সময় যাপন করিতেন। তাঁহাদের নিকটে লক্ষ্মীর ন্যায় সরস্বতীরও সমাদর ছিল। তাঁহাদের সভা, পণ্ডিত-মণ্ডলীতে সর্ব্বদা উজ্জ্বল থাকিত। প্রাচ্য দেশের সভা-মণ্ডপ যে সমস্ত কবি, ঐতিহাসিক, দার্শনিক ও গণিতবিৎ প্রভৃতিতে গৌরবান্বিত থাকিত, ইতিহাস হইতে তাঁহাদের নাম ও কীর্ত্তিকলাপ কখনও বিলুপ্ত হইবে না।

হুমায়ুনের মৃত্যুর পর আকবর দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করেন। এই সময়ে সাম্রাজ্যের অবস্থা বড় মন্দ ছিল। হুমায়ুনের রাজ্যচ্যুতির পর অধিকাংশ প্রদেশই একে একে দিল্লীর শাসনভ্রষ্ট হইয়া পড়ে। আকবর ত্রয়োদশ বর্ষ বয়সে এইরূপ ক্ষীণ ও দুর্ব্বল সাম্রাজ্যের অধিপতি হইলেন। কিন্তু আকবরের অভিভাবক বৈরাম খাঁর সাহস ও কার্য্যপরায়ণতায় অনেক স্থান অধিকৃত হইল। বৈরাম কাল্পী, চন্দেরী কলিঞ্জর, বুন্দেলখণ্ড ও মালব দিল্লীর অধীন করিলেন। ভারতীয় সল্লি * এইরূপে ভারতবর্ষে মোগল-

* সল্লি ফ্রান্সের অধিপতি চতুর্থ হেনরির রাজস্ব-সচিব ছিলেন। রাজনীতিতে তাঁহার

শাসন বদ্ধমূল করিয়া, পরিশেষে এই মোগল শাসনের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করেন। যাহা হউক, বৈরামের বিদ্রোহে আকবরের কোন অনিষ্ট হইল না। আকবর অবিলম্বে অষ্টাদশ বর্ষ বয়ঃক্রম সময়ে সাম্রাজ্যের শাসনভার গ্রহণ করিয়া নিজের ইচ্ছানুসারে শাসন-দণ্ড পরিচালনা করিতে লাগিলেন।

সাম্রাজ্যের সর্ব্বত্র শান্তি স্থাপিত হইলে, আকবর দিগ্বিজয়ে মনোনিবেশ করেন। রাজপুত-রাজ্যই তাঁহার লক্ষ্য হইয়া উঠে। আকবর মাড়বারের একটি নগর নষ্ট করিয়া ১৫৬৭ অব্দে চিতোরের বিরুদ্ধে সৈন্য চালনা করেন।

যে রাজ্যে রাজা আপনার ইচ্ছানুসারে সমস্ত কার্য্য করেন, সেই রাজ্যে মঙ্গল ও অমঙ্গল, রাজার ইচ্ছার অনুবর্ত্তী হইয়া থাকে। রাজা ধর্ম্মপরায়ণ হইলে, সেই রাজ্যের সর্ব্বপ্রকার উন্নতি হয়, রাজা পাপ-পরায়ণ হইলে, সেই রাজ্য অবনতির চরম সীমায় পতিত হইয়া থাকে। রাজা শৌর্য্য ও সাহস-সম্পন্ন হইলে, সেই রাজ্য অন্তঃশত্রু ও বহিঃশত্রুর আক্রমণে অটল থাকে। রাজা ভীরুস্বভাব হইলে, সেই রাজ্য শত্রুর আক্রমণে উৎসন্ন হইয়া যায়। দিল্লীর আকবর শাহ ও চিতোরের উদয় সিংহের রাজত্ব ইহার দৃষ্টান্তস্থল।

উদয় সিংহ যে বয়সে চিতোরের অধিপতি হন, আকবরও সেই বয়সে দিল্লীর শাসনদণ্ড গ্রহণ করেন। উভয়ের মধ্যে বয়ঃক্রমের এইরূপ সমতা থাকিলেও অন্যান্য অনেক বিষয়ে বৈষম্য ছিল। হুমায়ুন বাবরের নিকটে যেরূপ কষ্ট-সহিষ্ণুতা শিক্ষা করিয়াছিলেন, আকবরও হুমায়ুনের নিকটে সেইরূপ কষ্ট-সহিষ্ণুতা অভ্যাস করেন। পিতামহের মহামন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া, আকবর ক্রমে কষ্টসহিষ্ণু ও পরিশ্রমশীল হইয়া উঠেন। এ দিকে বৈরাম খাঁ, আবুল ফজল ও তোডরমল্লের ন্যায় বিচক্ষণ যোদ্ধা ও রাজনীতিজ্ঞগণ শাসনকার্য্যে আকবরের সাহায্য করেন। উদয় সিংহ এমন সৌভাগ্যের অধিকারী হইতে পারেন নাই, এমন কষ্ট-সহিষ্ণু হইয়াও শাসনকার্য্য নির্ব্বাহ করিতে সমর্থ হন নাই। মোগল ও রাজপুতের মধ্যে এইরূপ সৌভাগ্য ও শাসনোচিত ক্ষমতার বিভিন্নতা ছিল। এক জন অদৃষ্টের বিপাকে পড়িয়া, নানাস্থানে যাইয়া, মানবচরিত্রে বহুদর্শিতা লাভ করিয়াছিলেন, অন্য জন

প্রগাঢ় ব্যুৎপত্তি ছিল। আকবর ও বৈরাম খাঁ এবং চতুর্থ হেন্‌রি ও স্যুলি, ইঁহারা সকলেই প্রায় এক সময়ে বর্ত্তমান ছিলেন।

প্রাকারবেষ্টিত পার্ব্বত্য-দুর্গে জন্মিয়া সঙ্কীর্ণ সীমায় আবদ্ধ ছিলেন। অবারিত সংসার এক জনের বৈষয়িক জ্ঞান প্রসারিত করিয়াছিল, সঙ্কীর্ণ গিরিকন্দর অপরের বৈষয়িক জ্ঞান সঙ্কীর্ণ সীমায় আবদ্ধ রাখিয়াছিল।

আকবর মোগল সাম্রাজ্যের প্রকৃত স্থাপয়িতা। তিনিই প্রথমে রাজপুত-স্বাধীনতার গৌরব হরণ করেন। সাহাবদ্দীন ও আলার ন্যায় তিনিও রণমত্ত রাজপুতদিগকে তরবারির আঘাতে খণ্ড খণ্ড করেন। যে ধর্ম্মান্ধতা পাঠান-রাজত্বে প্রকাশ পাইয়াছিল, তাহা মোগল সাম্রাজ্যের শিরোভূষণ আকবরের রাজত্বেও প্রকাশ পায়। আকবর, আলার ন্যায় রাজপুতের আরাধ্য এক-লিঙ্গের মন্দিরের উপকরণ দ্বারা আপনাদিগের ধর্ম্মপুস্তক কোরাণের জন্য মম্বা (বেদি) নির্ম্মাণ করিতেও ক্রটি করেন নাই। এরূপ হইলেও এক সময়ে আকবরের কীর্ত্তিতে মোগলসাম্রাজ্য গৌরবান্বিত হইয়াছিল এবং এক সময়ে আকবর অসীম প্রতাপশালী হইয়া, চতুর্দ্দিকে আপনার গৌরব বিস্তার করিয়াছিলেন।

আকবর সৈন্যদল লইয়া চিতোর আক্রমণ করিলে, উদয় সিংহ জয়মল্ল নামক প্রসিদ্ধ যুদ্ধবীরের হস্তে নগররক্ষার ভার দিয়া, স্বয়ং অবসর গ্রহণ করেন। জয়মল্ল সাহস, বীরত্বপ্রভৃতি গুণে অলঙ্কৃত ছিলেন। তিনি বিশিষ্ট দক্ষতার সহিত চিতোররক্ষার বন্দোবস্ত করেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে চিতোর দীর্ঘকাল তাঁহার রক্ষাধীন থাকে না। জয়মল্ল একদা রাত্রিকালে মশালের আলোকে নগরের ভগ্ন প্রাচীরের সংস্কারকার্য্য দেখিতেছিলেন, ইত্যবসরে আকবর শাহ তাঁহাকে দেখিতে পাইয়া, তৎপ্রতি গুলি নিক্ষেপ করেন। গুলির আঘাতে জয়মল্লের তৎক্ষণাৎ পঞ্চত্ব-প্রাপ্তি হয়। এইরূপ গুপ্তহত্যা আকবরের চরিত্রের একটি কলঙ্ক। সম্মুখযুদ্ধ করাই যুদ্ধবীরের চিরন্তন পদ্ধতি, গোপনে নিরস্ত্র শত্রুর প্রাণ সংহার করা নৃশংসতা ও কাপুরুষতার লক্ষণ। বলা বাহুল্য, আকবর অন্যান্য সদ্‌গুণের অধিকারী হইয়াও, উপস্থিত স্থলে এইরূপ নৃশংসতা ও কাপুরুষতার পরিচয় দিয়াছিলেন।

সেনাপতির বিরহে চিতোর-বাসিগণ ভগ্নোৎসাহ হইয়া পড়ে। এ দিকে যুদ্ধক্ষেত্রে তাহাদের প্রধান প্রধান বীরগণের পতন হয়। অবশেষে পুত্ত চিতোরের সৈন্যের পরিচালন-ভার গ্রহণ করেন। পুত্ত ষোড়শবর্ষীয় বালক,

কিন্তু এই বালকের হৃদয় সাহসপূর্ণ ছিল। বস্তুতঃ সাহস ও বীরত্বে পুত্ত পৃথিবীর আরাধ্য দেবতা। স্বদেশ-বৎসলতার জন্য পুত্তের নাম অমরশ্রেণীতে নিবেশিত হইবার যোগ্য। পিতা রণস্থলে দেহ ত্যাগ করিলে, পুত্ত অতুল সাহসে যুদ্ধে যাইতে উদ্যত হন। তাঁহার মাতা তাঁহাকে সমরসজ্জায় সজ্জিত করিয়া "রণস্থল হইতে পলায়ন অপেক্ষা জন্মভূমির রক্ষার নিমিত্ত মৃত্যুও শ্রেয়স্কর" বলিয়া, বিদায় দেন। পুত্ত মাতৃ-আজ্ঞা পালনে প্রতিশ্রুত হইয়া, রণক্ষেত্রে প্রবেশ করেন। পুত্তের অসাধারণ পরাক্রমে যবন-সৈন্য বিধ্বস্ত-প্রায় হইয়া উঠে। এইরূপ লোকাতীত উৎসাহ-সহকারে যুদ্ধ করিয়া, পুত্ত মাতৃ-আজ্ঞা পালন করেন। আকবর শাহ শত্রুর শূরোচিত গুণ বিস্মৃত হন নাই। তিনি এ বিষয়ে বিশিষ্ট উদারতা দেখাইয়া, প্রকৃত বীরের সম্মান রক্ষা করেন। জয়মল্ল ও পুত্তের বীরত্বে আকবরের হৃদয় এত দূর আকৃষ্ট হয় যে, তিনি স্বীয় লেখনীতে তাঁহাদের অক্ষয় কীর্ত্তি বর্ণনা করিতে ত্রুটি করেন নাই। এতদ্ব্যতীত আকবর তাঁহার দিল্লীস্থ প্রাসাদ-দ্বারের উভয় পার্শ্বে দুইটি প্রকাণ্ড-কায় হস্তী নির্ম্মাণ করাইয়া, তাহার উপর জয়মল্ল ও পুত্তের প্রস্তরময়ী প্রতি-মূর্ত্তি স্থাপিত করেন। বিখ্যাত ফরাসী ভ্রমণকারী বার্ণিয়ারের সময়েও এই প্রতিমূর্ত্তিদ্বয় ভাল অবস্থায় ছিল। আকবর এইরূপে পরাক্রান্ত শত্রুর মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া প্রকৃত মহত্ত্বের পরিচয় দিয়াছেন, সন্দেহ নাই।

পুত্তের প্রাণবায়ুর সহিত চিতোরের সৌভাগ্য অন্তর্হিত হয়। অবিলম্বে শোচনীয় জহর ব্রতের অনুষ্ঠান হইতে থাকে। রাজপুত মহিলাগণ জ্বলন্ত চিতানলে প্রাণ বিসর্জ্জন করে। আট হাজার রাজপুত বীর একত্র বীরা * গ্রহণ করিয়া যুদ্ধক্ষেত্রে অরাতিনিপাত করিতে করিতে অনন্ত নিদ্রায় অভি-ভূত হয়। এইরূপ করাল হুতাশন-শিখা ও করাল নরশোণিতপ্রবাহ দেখিয়া, চিতোর রাজলক্ষ্মী চিতোর হইতে বিদায় গ্রহণ করেন।

কার্থেজের প্রসিদ্ধ বীর হানিবল 'কান্নি' নামক সমর-ক্ষেত্রে জয়ী হইলে, আপনার কৃতকার্য্যতার পরিচয়ার্থ রোমীয়দিগের অঙ্গুরীয়কসমূহ আহরণপূর্ব্বক, ধামা দ্বারা পরিমাণ করিয়াছিলেন। আকবরও এইরূপে রাজপুতদিগের

* বীরা অর্থাৎ সজ্জিত তাম্বূল। বিবাহসময়ে রাজপুতদিগের মধ্যে বীরাপ্রদানের পদ্ধতি আছে।

উপবীতসমূহ উন্মোচন পূর্ব্বক পরিমাণ করেন। পরিমাণে উহা ৭৪॥০ মণ * হয়। রাজস্থানের ব্যবসায়িগণের মধ্যে পত্রপৃষ্ঠে ৭৪॥০ অঙ্কপাতের পদ্ধতি আছে। ইহার অর্থ এই, যাঁহারা ঐ পত্র উন্মোচন করিবেন, চিতোর-ধ্বংসের সমস্ত পাপভার তাঁহাদের স্কন্ধে পতিত হইবে। অনেক স্থানে অনেক সম্প্রদায়ের মধ্যেও এই পদ্ধতির প্রচার দৃষ্ট হয়। বহুশত বৎসর অতীত হইল, চিতোর বিধ্বস্ত হইয়াছে, অদ্যাপি ৭৪॥০ অঙ্ক পত্রপৃষ্ঠে জাজ্বল্যমান থাকিয়া ঐ শোচনীয় সংবাদ সাধারণের নিকটে প্রচার করিতেছে।

উদয় সিংহ চিতোর পরিত্যাগ করিয়া, অরণ্যপ্রদেশে আশ্রয় গ্রহণ করেন; পরিশেষে তথা হইতে আরাবলী পর্ব্বতের উপত্যকায় উপস্থিত হন। চিতোর-ধ্বংসের পূর্ব্বে উদয় সিংহ উপত্যকার প্রবেশপথে একটি হ্রদ খনন করাইয়া, উহার নাম "উদয় সাগর" রাখিয়াছিলেন। এখন তিনি ঐ স্থানে একটি নগর স্থাপন করিয়া, নিজের নামানুসারে উহার নাম উদয়পুর রাখেন।

উদয় সিংহ চিতোর-ধ্বংসের পর চারি বৎসর জীবিত ছিলেন। ৪২ বৎসর বয়সে তাঁহার মৃত্যু হয়। তাঁহার পুত্র-সন্তানগণের মধ্যে প্রতাপ সিংহ পৈতৃক উপাধি ও গদির উত্তরাধিকারী হন।

এইরূপে প্রতাপ বংশানুগত "রাণা" উপাধি ধারণ করিলেন। এইরূপে মিবারের গৌরব-সূর্য্য উজ্জ্বল হইবার সূত্রপাত হইল। যদিও চিতোর বিধ্বস্ত হইয়াছিল, যদিও যবনের পরাক্রমে রাজপুতগণ হতাশ্বাস হইয়া পড়িয়াছিল, তথাপি প্রতাপের হৃদয় বিচলিত হয় নাই। তিনি চিতোর উদ্ধার করিতে কৃত-সংকল্প হইলেন। প্রতিজ্ঞা করিলেন, যতক্ষণ বাপ্পা রাওর শোণিতের শেষ বিন্দু ধমনীতে বর্ত্তমান থাকিবে, ততক্ষণ তিনি এই সংকল্প হইতে বিরত হইবেন না; প্রতিজ্ঞা করিলেন, যতক্ষণ গোহিলোট বংশের গৌরব মিবারের ইতিহাসে অঙ্কিত থাকিবে, ততক্ষণ তিনি মোগলের বশ্যতা স্বীকার করিবেন না। প্রতাপ এইরূপ স্থিরপ্রতিজ্ঞ হইয়া, উদ্দেশ্যসাধনে প্রবৃত্ত হইলেন। উচ্চতর সংকল্প, মহত্তর সাধনা তাঁহার হৃদয়কে উচ্চতর করিয়া তুলিল। তিনি স্বদেশ-হিতৈষিতা, স্বজাতিপ্রিয়তায় উত্তেজিত হইয়া, অনুচরবর্গকে উৎসাহিত করিতে লাগিলেন। প্রতাপের এইরূপ উৎসাহ, এইরূপ দৃঢ়প্রতিজ্ঞা দেখিয়া,

* এ স্থলে মণের পরিমাণ চারি সের।

অনেকে তাঁহার অনুবর্ত্তী হইল বটে, কিন্তু প্রধান প্রধান রাজপুতগণ মোগলের পক্ষ অবলম্বন করিলেন। মাড়বার, আম্বের, বিকানের এবং বুঁদীর অধিপতি-গণও স্বজাতি-প্রিয়তায় জলাঞ্জলি দিয়া আকবরের পক্ষসমর্থনে ত্রুটি করিলেন না। অধিক কি, তাঁহার ভ্রাতাও তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া, শত্রু-দলে মিশিলেন। কিন্তু দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ প্রতাপ ইহাতেও হতাশ্বাস হইলেন না; তিনি বাপ্পা রাওর শোণিত কলঙ্কিত না করিয়া, স্বদেশের উদ্ধারার্থে স্বীয় জীবন উৎসর্গ করিলেন।

প্রতাপ এইরূপে স্বজাতি—স্ববন্ধু কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া, ২৫ বৎসর কাল মোগল-শাসনের বিরুদ্ধাচরণ করেন। এই সময়ে এক এক বার তাঁহার দুরবস্থার একশেষ হয়। স্বয়ং পর্ব্বতে পর্ব্বতে বেড়াইয়া, স্ত্রীপুত্রের সহিত পার্ব্বত্যফল খাইয়া, কষ্টে কালাতিপাত করেন, তথাপি তিনি মোগলের বশ্যতা স্বীকার করেন নাই। এইরূপ স্বাধীনত্ব-প্রিয়তা পৃথিবীর ইতিহাসে দুর্লভ।

চিতোর-ধ্বংসের স্মরণার্থ প্রতাপ সর্ব্বপ্রকার বিলাস-দ্রব্যের উপভোগ পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। তিনি স্বর্ণ ও রৌপ্যপাত্র পরিত্যাগ করিয়া, বৃক্ষ-পত্রে অন্ন আহার করিতেন, কোমল শয্যা পরিত্যাগ করিয়া, তৃণাচ্ছাদিত শয্যায় শয়ন করিতেন এবং ক্ষৌরকার্য্য পরিত্যাগ করিয়া, লম্বমান দীর্ঘ শ্মশ্রু রাখিতেন। তাঁহার আজ্ঞায় অগ্রবর্ত্তী রণ-দুন্দুভি, সকলের পশ্চাতে ধ্বনিত হইত। মিবারের এই শোকচিহ্ন অদ্যাপি বর্ত্তমান রহিয়াছে, অদ্যাপি প্রতাপের বংশীয়গণ স্বর্ণ ও রৌপ্যময় আহার-পাত্রের নীচে বৃক্ষ-পত্র ও শয্যার নীচে তৃণ রাখিয়া থাকেন।

প্রতাপ পৈতৃক গদিতে আরোহণ করিয়া, কতিপয় অভিজ্ঞ সর্দ্দারের সাহায্যে শাসন-কার্য্য ও রাজস্বসংক্রান্ত বিষয়ের উৎকর্ষ সাধন করিতে লাগিলেন; যে কয়েকটি পার্ব্বত্য দুর্গ হস্তে ছিল, তৎসমুদয় সুদৃঢ় করিলেন। যতদিন মোগলদিগের সহিত তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছিল, ততদিন তাঁহার আজ্ঞায় বনাস্ ও বেরিস নদীর উভয় তীরবর্ত্তী উর্ব্বর-ভূমিতে কেহই থাকিতে পারিত না। নিজের আদেশ যথাবিধি পালিত হয় কি না, তাহার প্রতি প্রতাপের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ছিল। তিনি প্রায়ই কতিপয় অশ্বারোহী সমভিব্যাহারে স্থানীয় লোকের কার্য্য-কলাপ পরিদর্শন করিতেন। তাঁহার কঠিন আদেশে উর্ব্বরক্ষেত্র

মরুভূমির ন্যায় নিস্তব্ধ হইয়াছিল, তৃণরাজি শস্য-সমুহের স্থান পরিগ্রহ করিয়াছিল, গন্তব্য পথ কণ্টকাকীর্ণ বৃক্ষে অগম্য হইয়াছিল এবং মনুষ্যের আবাসভূমি বিবিধ বন্য জন্তুর বিহারক্ষেত্র হইয়াছিল। প্রতাপ এইরূপে সমুদয় ভূমি জঙ্গলময় করিয়া, বিজেতা মোগলদিগের লাভের পথ অবরুদ্ধ করিয়াছিলেন।

যে সমস্ত রাজপুত মোগলদিগের সহিত বৈবাহিক সূত্রে আবদ্ধ ছিলেন, প্রতাপ তাঁহাদিগকে সাতিশয় ঘৃণা করিতেন। আম্বেরের রাজা মানসিংহের সহিত আকবরের এইরূপ সম্বন্ধ থাকাতে, প্রতাপ, মানসিংহের সহিত সমুদয় সামাজিক সম্বন্ধ উঠাইয়া দেন। একদা মানসিংহ সোলাপুর অধিকার করিয়া, ফিরিয়া আসিতেছিলেন, এমন সময়ে প্রতাপের সহিত সাক্ষাৎ করিবার অভিপ্রায় জ্ঞাপন করেন। প্রতাপ সিংহ এই সময়ে কমলমীর প্রাসাদে অবস্থিতি করিতেছিলেন; তিনি আম্বের-রাজের অভিনন্দন জন্য উদয়সাগরের তীরে উপস্থিত হইলেন। অবিলম্বে এই স্থানে সমৃদ্ধ ভোজের আয়োজন হইল, প্রতাপের পুত্র কুমার অমর সিংহ, রাজা মানের অভ্যর্থনার জন্য, এই স্থলে উপস্থিত ছিলেন; মানসিংহ নির্দ্দিষ্ট স্থলে সমাগত হইলে, অমর সিংহ পিতার অনুপস্থিতির জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া, তাঁহাকে ভোজন-স্থলে বসাইলেন। মানসিংহ প্রতাপের সহিত একত্র ভোজন করিতে বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করাতে, প্রতাপ দুঃখসহকারে কহিয়া পাঠাইলেন, যিনি তুরুককে নিজের ভগিনী সম্প্রদান করিয়াছেন এবং সম্ভবতঃ যিনি তুরুকের সহিত আহারও করিয়াছেন, তিনি তাঁহার সহিত একত্র ভোজন করিতে পারেন না। রাজা মান, প্রতাপ সিংহের এই বাক্যে অপমান জ্ঞান করিয়া, ভোজন-স্থল হইতে গাত্রোত্থান করেন। প্রতাপ সিংহ এই সময়ে ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইয়াছিলেন, রাজা মান অশ্বে আরোহণ পূর্ব্বক, তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া কহিলেন, "যদি আমি তোমার গর্ব্ব খর্ব্ব না করি, তাহা হইলে আমার নাম মানসিংহ নহে।" মানসিংহ এই কথা বলিয়া চলিয়া গেলে, পবিত্র গঙ্গাজল দ্বারা ভোজনস্থান ধৌত করা হয়, এবং যাঁহারা ঐ ভোজের সহিত সংসৃষ্ট ছিলেন, তাঁহারা স্নান করিয়া, বস্ত্রান্তর গ্রহণ করেন। এই বিষয় আকবরের শ্রুতি-প্রবিষ্ট হইলে, আকবর মানসিংহের প্রতি প্রতাপ সিংহের তাদৃশ ব্যবহারে, আপ-

নাকে যারপরনাই অপমানিত জ্ঞান করিলেন। অবিলম্বে এই অপমানের প্রতিশোধ জন্য সংগ্রামের অনুষ্ঠান হইল। মানসিংহ ও মহব্বত খাঁ সৈন্যদল লইয়া প্রতাপের বিরুদ্ধে যাত্রা করিলেন।

প্রতাপ বাইশ হাজার রাজপুতের সাহস ও স্বদেশীয় পর্ব্বতমালার উপর নির্ভর করিয়া, ঐ সৈন্যদলের গতিরোধার্থ দণ্ডায়মান হইলেন। যে স্থলে তাঁহার সৈন্য সন্নিবেশিত হয়, তাহার দৈর্ঘ্য ও বিস্তার প্রায় আট মাইল। এই স্থান কেবল পর্ব্বত, অরণ্য ও ক্ষুদ্র নদীতে সমাবৃত। ইহার উত্তর, পশ্চিম ও দক্ষিণ, সকল দিকেই উন্নত পর্ব্বত লম্বভাবে রহিয়াছে। এই গিরি-সঙ্কট হল্‌দিঘাট নামে প্রসিদ্ধ। প্রতাপ মিবারের আশা-ভরসার স্থল রাজপুতদিগের সহিত এই গিরিসঙ্কট আশ্রয় করিয়া, দণ্ডায়মান হন। মোগলসৈন্য উপস্থিত হইলে, তুমুল সংগ্রাম হয়। রাজপুতগণ অসামান্য পরাক্রম—অশ্রুতপূর্ব্ব সাহসের সহিত যুদ্ধ করিয়া নিহত হন; বিজয়-শ্রী মোগলের পক্ষ অবলম্বন করেন; চতুর্দ্দশ সহস্র রাজপুতের শোণিতে হল্‌দিঘাটের ক্ষেত্র রঞ্জিত হয়; প্রতাপ জয়লাভে নিরাশ হইয়া, রণস্থল পরিত্যাগ করেন।

এইরূপে হল্‌দিঘাট সমরের অবসান হয়, এইরূপে চতুর্দ্দশ সহস্র রাজপুত হল্‌দিঘাট রক্ষার্থ অম্লানবদনে, অসংকুচিতচিত্তে আপনাদিগের জীবন উৎসর্গ করে। হল্‌দিঘাট পরম পবিত্র যুদ্ধ-ক্ষেত্র। কবির রসময়ী কবিতায় ইহা অনন্ত কাল নিবদ্ধ থাকিবে, ঐতিহাসিকের অপক্ষপাত বর্ণনায় ইহা অনন্তকাল ঘোষিত হইবে। প্রতাপ সিংহ অনন্তকাল বীরেন্দ্রসমাজে হৃদয়গত শ্রদ্ধার পূজা পাইবেন এবং পবিত্রতর হইয়া, অনন্তকাল অমরশ্রেণীতে সন্নিবিষ্ট থাকিবেন।

প্রতাপ অনুচর-বিহীন হইয়া চৈতক নামক নীলবর্ণ অশ্ব আরোহণে রণস্থল পরিত্যাগ করেন। এই অশ্বও তেজস্বিতায় প্রতাপের ন্যায় রাজস্থানের ইতিহাসে প্রসিদ্ধ। যখন দুই জন মোগল সর্দ্দার প্রতাপের পশ্চাদ্ধাবমান হয়, তখন চৈতক লম্ফ দিয়া একটি ক্ষুদ্র পার্ব্বত্য সরিৎ পার হইয়া স্বীয় প্রভুকে রক্ষা করে। কিন্তু প্রতাপের ন্যায় চৈতকও যুদ্ধস্থলে আহত হইয়াছিল। এই আঘাতে পথিমধ্যে চৈতকের প্রাণবিয়োগ হয়। প্রিয়তম বাহনের স্মরণার্থ প্রতাপ এই স্থলে একটি মন্দির নির্ম্মাণ করেন। অদ্যাপি এই স্থান “চৈতক্‌কা চবুতর্” নামে প্রসিদ্ধ আছে।

১৫৭৬ খ্রীঃ অব্দের জুলাই মাসে চিরস্মরণীয় হল্‌দিঘাট মিবারের গৌরব-স্বরূপ রাজপুতগণের শোণিতস্রোতে রঞ্জিত হয়। এ দিকে মোগল-সৈন্য বিজয়ী হইয়া, রণক্ষেত্র পরিত্যাগ করিল। কমলমীর ও উদয়পুর শত্রুর হস্তে পতিত হইল। প্রতাপ পরিবারবর্গের সহিত এক পর্ব্বত হইতে অন্য পর্ব্বতে, এক অরণ্য হইতে অন্য অরণ্যে, এক গহ্বর হইতে অন্য গহ্বরে যাইয়া, অনুসরণকারী মোগলদিগের হস্ত হইতে আপনাকে রক্ষা করিতে লাগিলেন। বৎসরের পর বৎসর পরিবর্ত্তিত হইতে লাগিল, তথাপি প্রতাপের কষ্টের অবধি রহিল না; প্রতি নূতন বৎসর, নূতন নূতন কষ্ট সঞ্চয় করিয়া, প্রতাপের নিকটে উপস্থিত হইতে লাগিল। এই সময়ে প্রতাপ সিংহ এরূপ দুরবস্থায় পড়িয়াছিলেন যে, একদা বিশ্বাসী ভিলগণ প্রতাপের পরিবারবর্গকে কোন নিরাপদ স্থানে লইয়া গিয়া, আহারদ্বারা সকলের প্রাণ রক্ষা করে।

প্রতাপের এইরূপ অসাধারণ স্বার্থত্যাগ ও অশ্রুতপূর্ব্ব কষ্টে সদাশয় শত্রুর হৃদয়ও আর্দ্র হইল। দিল্লীর প্রধান অমাত্য এইরূপ স্বদেশ-হিতৈষিতায় মোহিত হইয়া, প্রতাপকে সম্বোধন পূর্ব্বক, এই ভাবে একটি কবিতা লিখিয়া পাঠাইলেন, "পৃথিবীতে কিছুই স্থায়ী নহে। ভূমি ও সম্পত্তি অদৃশ্য হইবে; কিন্তু মহৎ লোকের ধর্ম্ম কখনও বিলুপ্ত হইবে না। প্রতাপ সম্পত্তি ও ভূমি পরিত্যাগ করিয়াছেন, কিন্তু কখনও মস্তক অবনত করেন নাই। হিন্দুস্থানের রাজগণের মধ্যে তিনিই কেবল স্বীয় বংশের সম্মান রক্ষা করিয়াছেন।" প্রতাপ এইরূপে বিধর্ম্মী শত্রুরও প্রশংসা-ভাজন হইয়া, বনে বনে বেড়াইতে লাগিলেন। প্রাণাধিক বনিতা ও সন্তানগণের কষ্ট এক এক সময়ে তাঁহাকে উন্মত্তপ্রায় করিয়া তুলিতে লাগিল। দুরন্ত মোগলগণ এ পর্য্যন্তও তাঁহার অনুসরণে ক্ষান্ত হইল না। তিনি পাঁচ বার খাদ্যসামগ্রীর আয়োজন করেন, কিন্তু সুবিধার অভাবে পাঁচ বারই তাহা পরিত্যাগ করিয়া, পার্ব্বত্য প্রদেশে পলায়ন করেন। একদা তাঁহার মহিষী ও পুত্রবধূ ঘাসের বীজ দ্বারা কয়েকখানি রুটী প্রস্তুত করেন। এই খাদ্যের একাংশ সকলে সেই সময়ে ভোজন করিয়া, অপরাংশ ভবিষ্যতের জন্য রাখিয়া দেন। কিন্তু একটি বন্য মার্জ্জার অকস্মাৎ এই অবশিষ্ট রুটী লইয়া, পলায়ন করে। অবশিষ্ট খাদ্য অপহৃত হইল দেখিয়া প্রতাপের একটি দুহিতা কাতরভাবে কাঁদিয়া উঠে। প্রতাপ

অদূরে তৃণশয্যায় শয়ান থাকিয়া, আপনার শোচনীয় অবস্থার বিষয় ভাবিতে-ছিলেন, দুহিতার আর্ত্তস্বরে চমকিত হইয়া দেখেন, খাদ্যসামগ্রী অপহৃত হওয়াতে বালিকা রোদন করিতেছে। প্রতাপ অম্লানবদনে হল্‌দিঘাটে স্বদেশীয়-গণের শোণিত-স্রোত দেখিয়াছিলেন, অম্লানবদনে স্বদেশীয়দিগকে স্বদেশের সম্মানরক্ষার্থ আত্ম-প্রাণ উৎসর্গ করিতে উত্তেজিত করিয়াছিলেন, অম্লানবদনে রাজপুত জাতি—রাজপুত-বংশের গৌরবরক্ষার জন্য রণস্থলের সংহারমূর্ত্তির বিভীষিকায় দৃক্‌পাত না করিয়া, কহিয়াছিলেন, "এই ভাবে দেহবিসর্জ্জনের জন্যই রাজপুতগণ জন্মগ্রহণ করিয়াছে।" কিন্তু এখন তিনি স্থিরচিত্তে তনয়ার কাতরতা দেখিতে সমর্থ হইলেন না। স্নেহাস্পদ বালিকাকে কাঁদিতে দেখিয়া তাঁহার হৃদয় নিতান্ত ব্যথিত হইল, যেন শত শত কালভুজঙ্গ আসিয়া, সর্ব্বাঙ্গে দংশন করিল; প্রতাপ আর যাতনা সহিতে পারিলেন না, আপনার কষ্ট দূর করিবার জন্য আকবরের নিকটে আত্ম-সমর্পণের অভিপ্রায় জানাইলেন।

প্রতাপের অধীনতা-স্বীকারের সংবাদে আকবর নগরমধ্যে মহোল্লাসে উৎসবের অনুষ্ঠান করিতে আদেশ করিলেন। প্রতাপ আকবরের নিকটে যে পত্র প্রেরণ করিয়াছিলেন, সেই পত্র পৃথ্বীরাজ দেখিতে পাইলেন। পৃথ্বীরাজ বিকানেরের অধিপতির কনিষ্ঠ ভ্রাতা। স্বজাতি-প্রিয়তা ও স্বদেশ-হিতৈষিতায় তাঁহার হৃদয় পূর্ণ ছিল। তিনি প্রতাপকে শ্রদ্ধা ও ভক্তি করিতেন। প্রতাপ হঠাৎ দিল্লীশ্বরের নিকটে অবনতমস্তক হইবেন, ইহা ভাবিয়া, তিনি নিতান্ত ক্ষুব্ধ হইলেন। পৃথ্বীরাজ আর কালবিলম্ব না করিয়া, নিম্নলিখিতভাবে কয়েকটি কবিতা রচনা পূর্ব্বক, প্রতাপের নিকটে পাঠাইয়া দিলেন :—

"হিন্দুদিগের সমস্ত আশাভরসা হিন্দুজাতির উপরেই নির্ভর করিতেছে। রাণা এখন সকল পরিত্যাগ করিতেছেন। আমাদের সর্দ্দারগণের সে বীরত্ব নাই, নারীগণের সে সতীত্ব-গৌরব নাই। প্রতাপ না থাকিলে, আকবর সকলকেই এই সমভূমিতে আনয়ন করিতেন। আমাদের জাতির বাজারে আকবর একজন দালাল; তিনি সকলকেই কিনিয়াছেন, কেবল উদয়ের তনয়কে কিনিতে পারেন নাই। সকলকেই হতাশ্বাস হইয়া, নৌরোজার বাজারে আপনাদের অপমান দেখিয়াছেন, কেবল হামীরের বংশধরকে আজ পর্য্যন্ত

সে অপমান দেখিতে হয় নাই। জগৎ জিজ্ঞাসা করিতেছে, প্রতাপের অবলম্বন কোথায়? পুরুষত্ব ও তরবারিই তাঁহার অবলম্বন। তিনি এই অবলম্বন-বলেই ক্ষত্রিয়ের গর্ব্ব রক্ষা করিতেছেন। বাজারের এই দালাল কিছু চিরদিন জীবিত থাকিবে না; এক দিন অবশ্যই ইহলোক হইতে অপসৃত হইবে। তখন আমাদের জাতির সকলেই পরিত্যক্ত ভূমিতে রাজপুত-বীজের বপন জন্য প্রতাপের নিকট উপস্থিত হইবে। যাহাতে ঐ বীজ রক্ষিত হয়, যাহাতে উহার পবিত্রতা পুনর্ব্বার উজ্জ্বল হইতে পারে, তাহার জন্য সকলেই প্রতাপের দিকে চাহিয়া রহিয়াছে।"

পৃথ্বীরাজের এই উৎসাহ-বাক্য শত সহস্র রাজপুতের তুল্য বলকারক হইল। ইহা প্রতাপের দেহে জীবনীশক্তি দিল এবং তাঁহাকে পুনর্ব্বার স্বদেশের গৌরবকর মহৎকার্য্যসাধনে উত্তেজিত করিল। প্রতাপ দিল্লীশ্বরের নিকটে অবনতি স্বীকারের সংকল্প পরিত্যাগ করিলেন। কিন্তু এই সময়ে বর্ষার এরূপ প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল যে, প্রতাপ কিছুতেই পর্ব্বতকন্দরে থাকিতে না পারিয়া, মিবার পরিত্যাগ পূর্ব্বক মরুভূমি অতিবাহন করিয়া, সিন্ধুনদের তটে যাইতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। এই সংকল্পসিদ্ধির মানসে তিনি পরিবারবর্গ ও মিবারের কতিপয় বিশ্বস্ত রাজপুতের সহিত আরাবলী হইতে নামিয়া, মরুপ্রান্তে উপনীত হন। এই সময়ে প্রতাপের মন্ত্রী তাঁহার পূর্ব্বপুরুষগণের সঞ্চিত সমস্ত অর্থ আনিয়া, প্রতাপের নিকটে উপস্থিত করিলেন। ঐ সম্পত্তি এত ছিল যে, উহাদ্বারা দ্বাদশ বর্ষ কাল পঞ্চবিংশতি সহস্র ব্যক্তির ভরণপোষণ নির্ব্বাহিত হইতে পারিত। কৃতজ্ঞতার এই মহৎ দৃষ্টান্তে প্রতাপ পুনর্ব্বার সাহসসহকারে অভীষ্ট মন্ত্রসাধনে উদ্যত হইলেন। অবিলম্বে অনুচরবর্গ একত্র হইল। প্রতাপ ইহাদিগকে লইয়া, দেবীরের প্রসিদ্ধ যুদ্ধে মোগল-সৈন্য পরাজয় করিলেন। কমলমীর ও উদয়পুর হস্তগত হইল। ক্রমে চিতোর, আজমীঢ় ও মণ্ডলগড় ব্যতীত সমস্ত মিবারপ্রদেশ প্রতাপের পদানত হইয়া উঠিল। পরাক্রান্ত আকবর শাহ বহু বৎসর কাল বহু অর্থ ব্যয় ও বহু সৈন্য নষ্ট করিয়া, মিবারে যে বিজয়শ্রী লাভ করিয়াছিলেন, প্রতাপ সিংহ এক দেবীরের যুদ্ধে তাহা আপনার হস্তগত করিলেন। কিন্তু এইরূপ বিজয়ী হইলেও, প্রতাপ জীবনের শেষ অবস্থায় শান্তি লাভ করিতে

পারেন নাই। পর্ব্বত-শিখরে উঠিলেই, তাঁহার নেত্র চিতোরের দুর্গ-প্রাচীরের দিকে নিপতিত হইত, অমনি তিনি যাতনায় অধীর হইয়া পড়িতেন যে চিতোরে বাপ্পা রাওর জীবিতকাল অতিবাহিত হইয়াছিল, যে চিতোরে রাজপুত-কুল-গৌরব সমরসিংহ স্বদেশের স্বাধীনতারক্ষার্থ দৃশদ্বতী নদীতীরে পৃথ্বীরাজের সহিত দেহত্যাগ করিতে সমর-সজ্জায় সজ্জিত হইয়াছিলেন, যে চিতোরে বাদল, জয়মল্ল ও পুত্ত সমরক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া অম্লানবদনে—অক্ষুব্ধহৃদয়ে আত্মপ্রাণ উৎসর্গ করিয়াছিলেন, অদ্য সেই চিতোর, শ্মশান! অদ্য সেই চিতোরের প্রাচীর অন্ধকারসমাচ্ছন্ন ভীষণ শৈলশ্রেণীর ন্যায় রহিয়াছে। প্রতাপ প্রায়ই এইরূপ চিন্তায়—এইরূপ কল্পনায় অবসন্ন হইতেন, প্রায়ই তরঙ্গের পর তরঙ্গের আঘাতে তাঁহার হৃদয় আলোড়িত হইত।

এইরূপ অন্তর্দ্দাহে প্রতাপ তরুণ বয়সেই ঐহিক জীবনের চরম সীমায় উপনীত হইলেন। দুরন্ত রোগ আসিয়া শীঘ্র তাঁহার দেহ অধিকার করিল। প্রতাপ ও তাঁহার সর্দ্দারগণ পেশোলা হ্রদের তীরে, দুর্গতির সময়ে আপনাদিগকে বর্ষা হইতে রক্ষা করিবার জন্য যে কুটীর নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, সেই কুটীরেই প্রতাপের জীবনের শেষ অংশ অতিবাহিত হয়। প্রতাপ স্বীয় তনয় অমর সিংহের প্রতি আস্থা-শূন্য ছিলেন। তিনি জানিতেন, কুমার অমর সিংহ সৌখীন যুবক; রাজ্য-রক্ষার ক্লেশ কখনই তাঁহার সহনীয় হইবে না। তনয়ের বিলাস-প্রিয়তায় প্রতাপ হৃদয়ে দারুণ ব্যথা পাইয়াছিলেন; অন্তিম সময়েও এই যাতনা তাঁহা হইতে অন্তর্হিত হইল না; এই দুঃসহ মনোবেদনায় আসন্ন-মৃত্যু প্রতাপের মুখ হইতে বিকৃত স্বর বাহির হইতে লাগিল। এক জন সর্দ্দার ইহা দেখিয়া, প্রতাপকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তাঁহার এমন কি কষ্ট হইয়াছে যে, প্রাণবায়ু শান্তভাবে বহির্গত হইতে পারিতেছে না। প্রতাপ উত্তর করিলেন, "যাহাতে স্বদেশ তুরুকের হস্তগত না হয়, তদ্বিষয়ে কোন প্রতিশ্রুতি জানিবার জন্য আমার প্রাণ এখনও অতি কষ্টে বিলম্ব করিতেছে। পরিশেষে তিনি কুটীর লক্ষ্য করিয়া কহিলেন, "হয় ত এই কুটীরের পরিবর্ত্তে বহুমূল্য প্রাসাদ নির্ম্মিত হইবে, আমরা মিবারের যে স্বাধীনতা রক্ষার জন্য এত কষ্ট স্বীকার করিয়াছি, হয় ত তাহা এই

ছুটীরের সঙ্গে সঙ্গেই বিলুপ্ত হইবে।” সর্দ্দারগণ প্রতাপের এই বাক্যে শপথ করিয়া কহিলেন, “যে পর্য্যন্ত মিবার স্বাধীন না হইবে, সে পর্য্যন্ত কোনও প্রাসাদ নির্ম্মিত হইবে না।” প্রতাপ আশ্বস্ত হইলেন, নির্ব্বাণোন্মুখ প্রদীপের ন্যায় তাঁহার মুখমণ্ডল উজ্জ্বল হইল। মিবার আপনার স্বাধীনতা রক্ষা করিবে শুনিয়া, তিনি শান্তভাবে ইহলোক হইতে অপসৃত হইলেন।

এইরূপে স্বদেশ-বৎসল প্রতাপ সিংহের পরলোকপ্রাপ্তি হইল। যদি মিবারে থিউকিদিদিস অথবা জেনোফন থাকিতেন, তাহা হইলে ‘পেলপনিসসের সমর’ অথবা ‘দশ সহস্রের প্রত্যাবর্ত্তন’ * কখনও এই রাজপুত শ্রেষ্ঠের অবদান অপেক্ষা ইতিহাসে অধিকতর মধুরভাবে কীর্ত্তিত হইত না। অনমনীয় বীরত্ব, অবিচলিত দৃঢ়তা, অশ্রুতপূর্ব্ব অধ্যবসায়সহকারে প্রতাপ দীর্ঘকাল প্রবলপরাক্রান্ত, উন্নতাকাঙ্ক্ষ, সহায়সম্পন্ন সম্রাটের বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছিলেন। এ জন্য আজ পর্য্যন্ত প্রতাপ সিংহ প্রত্যেক রাজপুতের হৃদয়ে দেবতারূপে বিরাজ করিতেছেন। যত দিন রাজপুতের স্বদেশহিতৈষিতা থাকিবে, তত দিন প্রতাপ সিংহের এই দেব-ভাবের ব্যত্যয় হইবে না।

প্রতাপ সিংহ স্বদেশের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য, দুরন্ত যবন হইতে মাতৃভূমির উদ্ধারার্থ যে সমস্ত মহৎকার্য্য সম্পন্ন করিয়াছেন, রাজস্থানের ইতিহাসে তাহা চিরকাল স্বর্ণাক্ষরে অঙ্কিত থাকিবে। শতাব্দের পর শতাব্দ অতীত হইয়াছে, অদ্যাপি রাজস্থানের লোকের স্মৃতিতে এই বৃত্তান্ত জাজ্বল্যমান রহিয়াছে। পূর্ব্বপুরুষের এই বৃত্তান্ত বলিবার সময়ে রাজপুতের হৃদয়ে অভূতপূর্ব্ব তেজের আবির্ভাব হয়, ধমনীমধ্যে রক্তের গতি প্রবল হয়, এবং নয়ন-

* গ্রীসের দুইটি নগর স্পার্টা ও এথিনা। এথিনা পারস্যের সহিত যুদ্ধে বিশেষ গৌরবান্বিত হইলে, তাহার প্রতিদ্বন্দ্বী স্পার্টা অসূয়াপরবশ হইয়া সমর-সজ্জার আয়োজন করে। ইহাই “পেলপনিসসের যুদ্ধ” বলিয়া বিখ্যাত। প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক থিউকিদিদিস এই মহাসমরের সবিস্তর বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

পারস্যের রাজা দ্বিতীয় দরায়স লোকান্তর গত হইলে, তাঁহার পুত্র অর্ত্তক্ষত্র পিতৃসিংহাসনে আরোহণ করেন। কিন্তু অর্ত্তক্ষত্রের ভ্রাতা কাইরস রাজ্যপ্রাপ্তির জন্য দশ সহস্র গ্রীক সৈন্যের সাহায্যে সমরে প্রবৃত্ত হন। খ্রীঃ পূঃ ৪০১ অব্দে কাইরস সমরে নিহত হইলে, গ্রীক সেনাপতি জেনোফন তাঁহার দশ সহস্র সৈন্যের সহিত বিশিষ্ট পরাক্রম ও কৌশলসহকারে স্বদেশে প্রত্যাগত হন। ইহাই ‘দশ সহস্রের প্রত্যাবর্ত্তন” বলিয়া ইতিহাসে প্রসিদ্ধ। গ্রীক সেনাপতি ও ইতিহাস-লেখক জেনোফন ইহার আনুপূর্ব্বিক বিবরণ লিখিয়াছেন।

জলে গণ্ডদেশ প্লাবিত হইয়া থাকে। বস্তুতঃ প্রতাপ সিংহের কার্য্য-পরম্পর রাজস্থানের অদ্বিতীয় গৌরব ও অদ্বিতীয় মহত্বের বিষয়। কোনও ব্যক্তি রাজবংশে জন্ম গ্রহণ করিয়া ও সর্ব্বপ্রকার সৌভাগ্য-সম্পত্তির অধিকারী হইয়া, প্রতাপের ন্যায় দুর্দ্দশাপন্ন হন নাই, কোনও ব্যক্তি স্বদেশহিতৈষিতা উত্তেজিত হইয়া স্বাধীনতারক্ষার্থ বনে বনে, পর্ব্বতে পর্ব্বতে বেড়াইয়া, প্রতাপের ন্যায় কষ্ট ভোগ করেন নাই। আরাবলী পর্ব্বত-মালার সমস্ত দরী সমস্ত উপত্যকাই প্রতাপ সিংহের জন্য গৌরবান্বিত রহিয়াছে। চিরকাল ঐ গৌরব-স্তম্ভ উন্নত থাকিয়া রাজস্থানের মহিমা প্রকাশ করিবে ভারত-মহাসাগরের সমগ্র বারিতেও উহা নিমগ্ন হইবে না, হিমালয়ের সমং শৃঙ্গপাতেও উহা বিচূর্ণ হইবে না।

লোকারণ্য।

মনের আকাঙ্ক্ষাবিষয়ে কাহারও সহিত কাহারও একতা নাই। কেহ সাগরের তরঙ্গবিক্ষোভিত সুনীল বক্ষে ফেনায়িত অট্টহাস দর্শনে পুলকিত হয়, কাহারও হৃদয়, ফুল, ফল, লতা, পাতা ইত্যাদি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বস্তুর সুকুমার সৌন্দর্য্যের জন্যই সতত লালায়িত থাকে। আমি এই উভয়বিধ শোভাই সমান আদরের সহিত নয়ন ভরিয়া পান করিয়া থাকি; কিন্তু একত্র বহু-সহস্রলোকের সমাবেশ দেখিলে, আমার যাদৃশ অনির্ব্বচনীয় আনন্দ বোধ হয়, জড়প্রকৃতির কোন পদার্থই আমায় সে আনন্দ প্রদান করিতে সমর্থ হয় না। আমি বিলাসীর প্রমোদ কাননে পরিভ্রমণ করিয়াছি, নদ, নদী, সরো-বর, বন, উপবন ও পর্ব্বতের নৈসর্গিক কান্তি অনিমেষলোচনে অবলোকন করিয়াছি, পূর্ণিমার প্রফুল্ল চন্দ্র তরুর পত্রে পত্রে, মেঘের পটলে পটলে কিরূপ মনোহর ক্রীড়া করে, তাহাও দর্শন করিয়াছি, ইহার কিছুই আমার নিকট লোকারণ্যের সেই বিস্ময়জনক ভয়ঙ্কর সৌন্দর্য্যের সমান বলিয়া প্রতীয়মান হয় নাই।

জড়প্রকৃতির সৌন্দর্য্যে প্রাণ নাই, উহা নিস্তেজ ও নির্জীব; লোকারণ্যের সৌন্দর্য্য প্রাণবিশিষ্ট, উহা সতেজ ও সজীব। সংসারে লোকারণ্যের ন্যায়

অদ্ভুত দৃশ্য কি আছে, জানি না। যাহার চিত্ত লোকারণ্য দেখিলেও নাচিয়া না উঠে, সে মনুষ্যসমাজের কেহই নহে, এবং মানবজাতির সুখ দুঃখ ও হর্ষ বিষাদের সহিত তাহার কখনও সহানুভূতি থাকিতে পারে না।

ত্রিতন্ত্রী, এস্রার, বীণা, বেণু, মন্দিরা ও মৃদঙ্গ প্রভৃতি বহুবিধ যন্ত্রের ধ্বনি একীভূত হইয়া নিঃসৃত হইলে, শ্রোতৃবর্গ যেরূপ অনুপম সুখানুভব করেন, ভাবুকের মন, লোকারণ্যের সমবেত কণ্ঠধ্বনি শ্রবণ করিয়া, তাহা অপেক্ষাও গভীরতর সুখ অনুভব করে। কেহ হাসে, কেহ গায়, কেহ দূর হইতে বন্ধুজনকে তারস্বরে আহ্বান করে, কাহারও কণ্ঠ হইতে ক্রোধের শ্রুতিকর্কশ কম্পিত স্বর বহির্গত হয়, কেহ বা পার্শ্বস্থিত প্রণয়িজনের চিরপিপাসু কর্ণে মৃদু মৃদু মধুধারা বর্ষণ করিতে থাকে। ঐ সমুদয় ধ্বনি, একস্রোতের ন্যায় মিশ্রিত হইয়া, মানবজীবনের জয়ধ্বনিরূপে গগনাভিমুখে উত্থিত হয়, এবং ভাবুক ব্যক্তি, শ্রবণ করিতে করিতে, উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব্ব, পশ্চিম, সমস্ত ভুলিয়া গিয়া ঐ স্রোতেই আপনার হৃদয় ঢালিয়া দেয়। সে আছে কি নাই, তাহাও তখন তাহার মনে থাকে না।

তরুলতার অরণ্য নয়নেরই বিনোদন করে, প্রকৃতপ্রস্তাবে হৃদয়ের উদ্দীপন করিতে সমর্থ হয় না। লোকারণ্য নয়নের প্রীতিকর, এবং হৃদয়েরও উদ্দীপক। যে অসংখ্য লোক একত্র মিলিত হইয়া ঐরূপ অপূর্ব্ব মূর্ত্তি ধারণ করে, তাহাদিগের প্রত্যেকেই এক একখানি কাব্য, অথবা এক একখানি ইতিহাস। প্রতিজনের মানসপটে কতই বা সুখের কথা এবং কতই বা দুঃখের কথা লিখিত রহিয়াছে, প্রতিজনের মস্তকের উপর দিয়া বিঘ্নবিপদের ঝঞ্ঝাবায়ু কত ভাবে ও কত বার প্রবাহিত হইয়াছে, সংসারের প্রতিকূল স্রোতে প্রতিজন কতই বিড়ম্বনা ভোগ করিয়াছে, তাহা চিন্তা করিলে, মন লৌকিক জগতের কত উর্দ্ধে উত্থান করে, তাহা কখনই বাক্যে নির্ব্বাচন করা যায় না। লোকারণ্যরূপ বিচিত্র দৃশ্য দর্শন করিয়া, কবি ও দার্শনিক, উভয়েই সমান মুগ্ধ হন, কল্পনা ও চিন্তা, উভয়ই তখন যুগপৎ জাগরিত হইয়া সমানভাবে ক্রীড়া করে।

মনুষ্যের আলস্য, ঔদাস্য এবং অকর্ম্মণ্য জীবন অবলোকন করিলে, মানবজাতি যে জীবিত আছে, এ বিষয়েই সংশয় হয়, এবং সংশয়ের সঙ্গে এক

ভয়ানক নৈরাশ্যের ভাব আসিয়া মনকে অবসন্ন করিয়া ফেলে। কিন্তু যখন দৈবাৎ কোন স্থলে হলহলাময় লোকধ্বনি শ্রবণ করি, এবং লোকারণ্যের ভৈরব ছবি প্রত্যক্ষ সন্দর্শন করি, তখন সেই সংশয় এবং সেই নৈরাশ্য আপনা হইতেই অপনীত হইয়া যায়। বহু সহস্র লোক কেন প্রমত্তভাবে একত্র হয়, কেন বহু লোকের হৃদয়যন্ত্র একভাবে একসঙ্গে বাজিয়া উঠে, ইত্যাদি চিন্তা-সূত্র অবলম্বন করিয়া লোক-সংগ্রহের মূলানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হও, একবারে মানব-প্রকৃতির মূল প্রস্রবণের সন্নিধানে উপস্থিত হইবে, এবং যাহা কখনও জানিতে পাও নাই, তাহা সাক্ষাৎ উপলব্ধি করিয়া, আশায় ও আনন্দে অশ্রু-ধারা বর্ষণ করিবে।

বুদ্ধি মনুষ্যের প্রকৃত জীবন নহে, জীবনের পথপ্রদর্শক অথবা আলোক-বর্ত্তিকা। মনুষ্যের প্রকৃত জীবন হৃদয়। হৃদয়ের প্রবাহ রুদ্ধ হইলে, অনু-রাগ, বিরাগ, সুখ, দুঃখ, নিদ্রা, জাগরণ, সকলই স্বপ্নবৎ অলীক হইয়া উঠে। মনুষ্যজাতির সেই হৃদয় আছে, না অদর্শন হইয়াছে, তাহার প্রধান পরীক্ষা-স্থান লোকারণ্য। লোকারণ্যে, কোথাও ভক্তির স্রোত প্রবলবেগে প্রবাহিত হইতেছে, কোথাও দেশানুরাগ, যুগান্তের মোহ হইতে সহসা উত্থিত হইয়া, ঝটিকাবায়ুর ভীমস্বরে গর্জ্জন করিতেছে, কোথাও বহু দিনের অপমান, ক্লেশ ও দুঃখ যন্ত্রণা, অকস্মাৎ বেলাভূমি অতিক্রম করিয়া, প্রলয়পয়োধির উচ্ছ্বাসের ন্যায়, সংসার ডুবাইয়া দিতেছে, এবং পুরাতন ও নূতন, ভাল ও মন্দ, যাহা কিছু সম্মুখে পড়িতেছে, সমুদয় ভাসাইয়া নিতেছে।

পৃথিবীর কতকগুলি জাতি মৃত, আর কতকগুলি জীবিত। মৃতজাতীয় মনুষ্য সকল বিষয়েই নির্লিপ্ত, তাহারা ভোগরত হইয়াও যোগী; কারণ, কিছু-তেই আশক্ত নহে; গৃহী হইয়াও বানপ্রস্থ, এবং বিলাসী হইয়াও উদাসীন। তাহাদিগের প্রধান লক্ষণ এই, তাহারা আপন বই বুঝে না, স্ত্রীপুত্র বই আর চেনে না, এবং বর্ত্তমান ক্ষণের বর্ত্তমান সুখ বিনা আর কিছুই চিত্তে ধারণা করিতে সমর্থ হয় না। তাহাদিগের হৃদয় তড়াগের বদ্ধজলের ন্যায়; উহাতে চাঞ্চল্য, প্রবাহ ও তরঙ্গ, কিছুই নাই; এবং আপনার ও বর্ত্তমান ক্ষণের সহিত যে বস্তুর সাক্ষাৎসম্বন্ধ নাই, তাহা তাহাদিগের নিকট সর্ব্বথা অবস্তুরূপে প্রতিভাত হয়। তাদৃশ লোকেরা লোকারণ্যের মহিমা কোন

প্রকারেই বুঝিতে পায় না, এবং লোকসমুদ্রে ঝাঁপ দিয়া সাধারণের অদৃষ্টের সহিত আপনাদিগের অদৃষ্ট মিশ্রিত করিতে, সাধারণের একাঙ্গ হইয়া সংসারের গতিপরিবর্ত্তের কারণ হইতে, কখনই ইচ্ছুক হয় না। যাহা আছে, তাহা ক্রোড়ে লইয়া, খট্টার তলে, কোন এক কোণে, মাথা লুকাইয়া প্রাণে প্রাণে কুশলে থাকিতে পারিলেই, তাহাদিগের সকল তৃষ্ণা চরিতার্থ হয়। যে জাতি জীবিত রহিয়াছে, যাহাদিগের হৃদয়ের স্রোত অদ্যাপি তর তর ধারে প্রবাহিত হইতেছে, তাহাদিগের লক্ষণ ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত। তাহারা প্রমত্ত, সুতরাং অতি সহজেই উত্তেজিত হয়। তাহারা জীবন্ত বারুদ-গৃহে, অগ্নির স্ফুলিঙ্গমাত্র পতিত হইলেই, ধগ্ ধগ্ করিয়া জ্বলিয়া উঠে। তাহারা হাসিতে জানে, কাঁদিতে জানে, লোককে প্রশংসা করিতে জানে, লোককে নিন্দা করিতে জানে, এবং কোন্ সূত্রে গ্রন্থন করিলে সকলের হৃদয় একটি স্তবকের ন্যায় গ্রথিত হইতে পারে, তাহাও বিলক্ষণরূপে জানে। মৃতজাতীয়-দিগের মধ্যে কখনও লোকারণ্য দেখিতে পাওয়া যায় না; জীবিতজাতীয় মনুষ্যদিগের বাসস্থলই লোকারণ্যের যথার্থ স্থান।

ফরাসী দেশ লোকারণ্যের এক প্রধান প্রদর্শনক্ষেত্র। সপ্তদশ শতাব্দীর সুপ্রসিদ্ধ বিপ্লবের কাল হইতে অদ্য পর্য্যন্ত, ফ্রান্সে নিত্যই নূতন লোকারণ্য লোকের নয়নগোচর হইতেছে। ইহার অর্থ এই, ফরাসীরা বিপদের পর বিপদে আক্রান্ত হইয়াছে, কখনও ভূতলে পড়িয়াছে, কখনও উপরে উঠিয়াছে, কখনও বা যাই যাই হইয়াছে, কিন্তু একবারে মরিয়া যায় নাই। তাহাদিগের লোকারণ্য অভিমানিনী এনের নিদ্রাভঙ্গ করিয়াছে, ষোড়শ লুইকে শান্তির শয্যা হইতে চমকিত করিয়া উঠাইয়াছে, এবং বৃটিশ পার্লিয়ামেণ্টে বার্ক প্রভৃতি প্রশান্তচিত্ত, সুস্থির, সুগভীর বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিকেও পাগল বানাইয়া তুলিয়াছে। ইহা কেন? না, ফ্রান্স জীবিত রাজ্য।

ইংলণ্ডে, প্রজাপ্রতিনিধিনির্ব্বাচন অথবা কোন রাজকীয় বিধির পরিবর্ত্ত-নের সময়ে, কিরূপ লোকভয়ঙ্কর তুমুল কাণ্ড উপস্থিত হয়, তাহা সকলেরই অবগতির বিষয়। তখন পণ্ডিত, মূর্খ, ধনী, নির্ধন, সকলেই দেশের এক প্রান্ত হইতে আর এক প্রান্ত পর্য্যন্ত ক্ষেপিয়া উঠে। বোধ হয় যেন সমস্ত দেশ উৎসন্ন যাইতেছে। এক এক স্থলে পঞ্চাশৎ সহস্রেরও অধিক লোক

মিলিত হইয়া চীৎকার করে, আর সেই চীৎকারে সমুদয় ইয়ুরোপ কাঁপিতে থাকে। ইংলণ্ড কি সভ্য নয়? ইংলণ্ডে কি বিদ্বান্ ও বুদ্ধিমান্ লোক বর্ত্তমান নাই? কিন্তু ইংলণ্ডের বিদ্যা, বুদ্ধি, সভ্যতা, সামাজিকতা, কিছুই উহার হৃদয়াবেগ এবং লোকারণ্য অবরোধ করিতে পারে না। কারণ, ইংলণ্ড জীবিত রহিয়াছে।

ভারতবর্ষ যখন জীবিত ছিল, তখন ভারতবাসীরা লোকারণ্য দর্শন করিয়া আহ্লাদে ঢল ঢল হইত। ইদানীং তাহা হয় না; কারণ, ইদানীং ভারতবর্ষ জীবিত নাই। পৃথ্বীরাজের পর হইতেই ভারতবর্ষ প্রাণহীন হইয়া এক ভয়ানক শ্মশানের বেশ ধারণ করিয়াছে; চাহিয়াও দেখিতে ইচ্ছা হয় না। ভারতবর্ষে ভক্তির স্রোত অদ্যাপি প্রবহমান রহিয়াছে; এই হেতু অদ্যাপি তীর্থস্থলে লোকারণ্যের মাহাত্ম্য কিয়দংশে অনুভূত হয়। কিন্তু অন্য কোন এক ভাব, কি কোন এক কথাতেই এদেশীয়েরা এইক্ষণ আর এক হৃদয়বৎ নাচিয়া উঠে না, অথবা একত্র দণ্ডায়মান হয় না।

শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন ঘোষ।

ব্রহ্মচর্য্য।

হিন্দুশাস্ত্রে ব্রহ্মচর্য্যের অনেক প্রশংসা দেখিতে পাওয়া যায়। এক কথায় বুঝাইতে হইলে বলা যাইতে পারে যে, ব্রহ্মচর্য্যের অর্থ ব্রত। ব্রত কাহাকে বলে, বোধ হয়, হিন্দুকে বুঝাইতে হইবে না। পৃথিবীতে হিন্দুর ন্যায় কেহ ব্রত করে না এবং করিতে পারে না। মহৎ উদ্দেশ্য সাধনার্থ দৃঢ় সংকল্প করিয়া সংযতচিত্তে কঠোর নিয়ম পালন করার নাম ব্রত। ব্রহ্মচর্য্যরূপ ব্রত দুই প্রকার—উপকুর্ব্বাণ ব্রহ্মচর্য্য এবং নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচর্য্য। মুক্তিলাভার্থ সংসার হইতে পৃথক্ থাকিয়া কঠোর প্রণালীতে জীবন ধারণ করিয়া জন্ম হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত, ব্রহ্মসাধনার নাম নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচর্য্য। এ ব্রহ্মচর্য্যের কথা এ প্রবন্ধে বলিব না। পরোপকারার্থ সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে হইলে যে শিক্ষালাভ আবশ্যক, নিয়মানুসারে সেই শিক্ষালাভের নাম উপকুর্ব্বাণ ব্রহ্মচর্য্য। মানুষের চারি আশ্রমের মধ্যে জীবনের প্রথম ভাগের জন্য, শাস্ত্রে

যে ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম নির্দ্দিষ্ট আছে, সে এই ব্রহ্মচর্য্যরূপ আশ্রম। অতএব, উপকুর্ব্বাণ ব্রহ্মচর্য্যের অর্থ, মনুষ্যজীবনের ভিত্তি। আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা কি প্রণালীতে সেই ভিত্তি স্থাপন করিতেন, তাহা যত সংক্ষেপে পারি বুঝাইতে চেষ্টা করিব।

শিক্ষা কাহাকে বলে বুঝিতে হইলে দুইটি বিষয় বুঝিতে হয়—শিক্ষার বিষয় এবং শিক্ষার নিয়ম। হিন্দুশাস্ত্রমতে শিক্ষার বিষয় চারিটি—দেহ, মন, আত্মা এবং হৃদয়।

ব্রহ্মচারী অথবা ছাত্রের দেহ সুস্থ এবং বলিষ্ঠ রাখিবার নিমিত্ত মনুসংহিতায় কতকগুলি ব্যবস্থা দেখিতে পাওয়া যায়। যথা :—

"যে ব্রহ্মচারীর শয়নাবস্থায় সূর্য্য উদিত বা অস্তমিত হয়, সে তাহার প্রায়শ্চিত্ত না করিলে মহাপাপে লিপ্ত হয়।

গুরু শয্যা হইতে উঠিবার পূর্ব্বেই শিষ্যকে শয্যা হইতে উঠিতে হইবে এবং গুরুর শয়ন করিবার পর শয়ন করিতে হইবে।"

স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য প্রত্যুষে শয্যা হইতে উঠা কত আবশ্যক তাহা সকলেই জানেন। সেই নিয়ম এই দুই শ্লোকে * এবং আরো কতকগুলি শ্লোকে নির্দ্দিষ্ট আছে।

শারীরিক বল এবং স্ফূর্ত্তি বর্দ্ধনার্থ দূরপথ গমন এবং শারীরিক পরিশ্রমের ন্যায় হিতকর ব্যায়াম আর কিছুই নাই। মনুও ব্রহ্মচারীর নিমিত্ত এইরূপ ব্যবস্থা করিয়াছেন :—

"শ্রমশীল হইয়া দূর হইতে যজ্ঞকাষ্ঠ আনিয়া তাহা রৌদ্রে শুখাইবে এবং তদ্দ্বারা সায়ং ও প্রাতে অগ্নিতে হোম করিবে।

জলকলস, পুষ্প, গোময়, মৃত্তিকা, কুশ, প্রভৃতি আচার্য্যের তাবৎ প্রয়োজনীয় দ্রব্য আহরণ করিবে এবং প্রতিদিন ভৈক্ষ্যচর্য্যা করিবে।"

এতদ্ব্যতীত আর এক প্রকার ব্যবস্থা আছে। তাহারো উদ্দেশ্য—শারীরিক বল, স্ফূর্ত্তি এবং স্বাস্থ্য।

মানসিক শিক্ষার নিমিত্ত বেদ প্রভৃতি শাস্ত্র শিখান হইত। তদ্দ্বারা

* মূল শ্লোক উদ্ধৃত হইল না। শিক্ষার্থীদিগের সহজ বোধের জন্য শ্লোকের অনুবাদ মাত্র গৃহীত হইল।

ছাত্রের মানসিক শক্তি এবং জ্ঞানভাণ্ডার কত দূর পরিবর্দ্ধিত হইত, তাহা এখন পরিষ্কাররূপে বুঝিবার উপায় নাই। তবে এটি বুঝিতে পারা যায় যে, গুরু শিষ্যকে অতি উৎকৃষ্ট শাস্ত্র সকল শিখাইতেন এবং যাহা শিখাইতেন, তাহা দীর্ঘকাল ধরিয়া শিখাইতেন।

আত্মার শিক্ষাও প্রাচীন শিক্ষা-প্রণালীর একটি প্রধান অঙ্গ ছিল। ব্রহ্মচারীর সম্বন্ধে মনুর ব্যবস্থা এই :—

"নিত্য স্নান করিবে। পবিত্র দেহে ও পবিত্র মনে দেব, ঋষি ও পিতৃলোকের তর্পণ ও দেবার্চ্চনা করিবে, এবং কাষ্ঠাহরণপূর্ব্বক হোমকার্য্য করিবে।

আচমন পূর্ব্বক পবিত্রভাবে ও অভিনিবিষ্টচিত্তে পবিত্র স্থানে বসিয়া দুই সন্ধ্যা সাবিত্রী উপাসনা করিবে।"

হৃদয়ের শিক্ষা সম্বন্ধেও অতি উৎকৃষ্ট নিয়ম দেখিতে পাওয়া যায়। পিতা, মাতা, আচার্য্য, জ্ঞানবান্ ব্যক্তি প্রভৃতিকে ব্রহ্মচারী ভক্তি ও সম্মান করিবে। যে কেহ কিঞ্চিন্মাত্র উপকার করে, তাহাকে ব্রহ্মচারী গুরু বলিয়া মান্য করিবে।

"যিনি অল্পই হউক বা বহুই হউক, ব্রহ্মচর্য্যার সাহায্য করেন, ব্রহ্মচারী তাঁহাকেও গুরুবৎ পূজা করিবে।"

যিনি ব্রহ্মচারী তাঁহার জীবহিংসা করা অকর্ত্তব্য।

এই যে হৃদয়ের শিক্ষা, ইহা কেবল উপদেশসম্বদ্ধ ছিল না। ব্রহ্মচারীকে এই শিক্ষা কার্য্যে পরিণত করিতে হইত।

"মাতা পিতা পুত্রের জন্য যে কষ্ট স্বীকার করেন, সাধ্য কি যে পুত্র শত শত বর্ষেও সে ধার শুধিতে পারে। নিত্য সেই পিতা মাতার এবং আচার্য্যের প্রিয় কর্ম্ম করিবে, ইহাঁরা তিনজন তুষ্ট হইলেই সকল তপস্যা সিদ্ধ হয়। এই তিনজনের শুশ্রূষাই মহা তপস্যা। তাঁহাদের বিনানুমতিতে অন্য কোন ধর্ম্মই আচরণ করিবে না।"

এই রকম অনেক নিয়ম ও উপদেশ হিন্দুশাস্ত্রে দেখিতে পাওয়া যায়। ফলতঃ এক রকম বুঝা যাইতেছে যে, প্রাচীন ভারতে ব্রহ্মচারী বা ছাত্রের শিক্ষা চারি প্রকারের ছিল—দেহের শিক্ষা, মনের শিক্ষা, হৃদয়ের শিক্ষা এবং আত্মার শিক্ষা। এখন এ দেশে ছাত্র কয় প্রকার শিক্ষা পাইয়া থাকে? বোধ

হয় এক প্রকার বই নয়, অর্থাৎ শুধু মনের শিক্ষা। এখন স্কুল কালেজে ছাত্রের কেবলমাত্র কিঞ্চিৎ বুদ্ধির পরিচালনা হইয়া থাকে এবং ছাত্র কিঞ্চিৎ জ্ঞান সঞ্চয় করে। হৃদয়ের প্রকৃত শিক্ষা স্কুল কালেজে হওয়া সুকঠিন। পূর্ব্বে যেমন গুরুগৃহে থাকিয়া বিদ্যাভাস করিবার রীতি ছিল, তাহাতে হইতে পারিত।

পূর্ব্বে গুরু শিষ্যকে সন্তানবৎ স্নেহ করিতেন এবং শিষ্য গুরুকে পিতৃবৎ ভক্তি করিতেন। অর্থাৎ গুরুশিষ্যের মধ্যে একটি হৃদয়ের গ্রন্থি থাকিত এবং সেই জন্য গুরুর কাছে শিষ্যের উত্তম হৃদয়ের শিক্ষা হইত।

আত্মার শিক্ষাসম্বন্ধেও এই সকল কথা খাটে। আমাদের স্কুল কালেজে প্রায়ই ধর্ম্মশিক্ষা দেওয়া হয় না। ফলতঃ প্রকৃত ধর্ম্মশিক্ষা কাহাকে বলে, তাহা বিবেচনা করিলে বোধ হয়, এ কথাও বলা যাইতে পারে যে, স্কুল কালেজ প্রকৃত ধর্ম্মশিক্ষার স্থান নয়। দুই চারি খানা ধর্ম্মগ্রন্থ পড়িলে ধর্ম্মশিক্ষা হয় না। ধর্ম্মচর্য্যাই প্রকৃত ধর্ম্মশিক্ষা। গৃহ, ধর্ম্মচর্য্যার উৎকৃষ্ট স্থান। কিন্তু এখন গৃহে সন্তানের ধর্ম্মচর্য্যার প্রতি পিতা পিতৃব্যের মনোযোগ নাই। কাজেই এখন আত্মার শিক্ষার অভাবে আমাদের শিক্ষা অত্যন্ত অঙ্গহীন হইতেছে।

শরীরের শিক্ষাও এখন হয় না বলিলেই হয়। প্রত্যূষে শয্যাত্যাগ প্রভৃতি যে সকল স্বাস্থ্যকর নিয়ম পালন করা উচিত, তৎপ্রতি লোকের এখন বিশেষ মনোযোগ নাই। সন্ধ্যাহ্নিকে আস্থা থাকিলে প্রকারান্তরে এই সকল নিয়মের প্রতি লোকের লক্ষ্য থাকিত। কিন্তু সে আস্থাও নাই, সে লক্ষ্যও নাই। হোমকাষ্ঠ আহরণার্থ পূর্ব্বকালে ছাত্রকে অনেক পথ হাঁটিতে হইত এবং শারীরিক পরিশ্রম করিতে হইত। এখন কেহ হোমও করে না, কেহ পথও হাঁটে না।

অতএব শিক্ষার বিষয় বিবেচনা করিতে হইলে অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে, প্রকৃত ব্রহ্মচারী এখন নাই, পূর্ব্বকালে ছিল—জীবনের প্রকৃত ভিত্তি এখন স্থাপিত হয় না, পূর্ব্বকালে হইত।

এখন প্রাচীন শিক্ষার নিয়ম কি ছিল, বুঝিয়া দেখিতে হইবে।

মনুসংহিতার দুই চারিটি শ্লোক পড়িলেই সে নিয়ম জানিতে পারা যায়।

"ব্রহ্মচারী গুরুকুলে বাস করতঃ ইন্দ্রিয় সংযমপূর্ব্বক নিজ তপোবৃদ্ধির নিমিত্ত এই সকল নিয়ম পালন করিবে।

মধু, মাংস, গন্ধ, মাল্য, রস, স্ত্রীসঙ্গ প্রভৃতি সকল প্রকার বিলাস এবং প্রাণিহিংসা পরিত্যাগ করিবে।

আভাঙ্ করিয়া তৈলাদি মর্দ্দন, নেত্ররঞ্জন, পাদুকা ও ছত্রধারণ, কাম, ক্রোধ, লোভ, নৃত্যগীতবাদ্য, এই সকল পরিত্যাগ করিবে।

ব্রহ্মচারী একজনের অন্নে জীবনধারণ করিবে না। ভিক্ষান্নে জীবিকা নির্ব্বাহ করিবে।

গুরুসমীপে শিষ্যের অন্ন, বস্ত্র ও বেশ সর্ব্বদা গুরুর অপেক্ষা হীন হইবে।

দ্যূতক্রীড়া, বৃথাবাগ্‌বিতণ্ডা, পরনিন্দা, মিথ্যা কথা এবং পরের অপকার পরিহার করিবে।"

এইরূপ আরো অনেক ব্যবস্থা আছে। অতি সামান্য অভিনিবেশ সহকারে ভাবিয়া দেখিলে বুঝিতে পারা যায় যে, শাস্ত্রকারদিগের মতে শিক্ষার নিয়ম চারিটি বস্তু,—(১) কষ্টসহিষ্ণুতা, (২) বিলাসবিদ্বেষ, (৩) চিত্তসংযমন, (৪) নিষ্ঠা। এই চারিটি একত্র না হইলে প্রকৃত শিক্ষা লাভ হয় না। বাবুগিরি করিলে মানুষ শিক্ষিত হইতে পারে না। বিলাসপ্রিয় হইলে মানুষ পরিশ্রম করিতে পারে না এবং বিনা পরিশ্রমে জ্ঞান লাভ করা যায় না। বিকলচিত্ত বা বিকলেন্দ্রিয় হইলে মানুষ বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে, কোন কাজই করিতে পারে না। যে কাজই কর, নিষ্ঠা না থাকিলে অর্থাৎ দেহের, মনের এবং প্রাণের যত শক্তি আছে, সেই সমস্ত শক্তি সেই কাজে বিনিযুক্ত না হইলে, সিদ্ধিলাভ একবারেই অসম্ভব। একটি কাজ করিতে করিতে অন্য কাজে মন দিলে কোন কাজই সুসম্পন্ন হয় না। কোন একটি কাজ যেমন করিয়া করা উচিত, তেমনি করিয়া করিতে হইলে তন্ময় হওয়া চাই। সম্পূর্ণ আত্মোৎসর্গ ব্যতিরেকে কেহ কখন ঈপ্সিত বস্তু লাভ করে নাই।

প্রাচীন ভারতে ব্রহ্মচর্য্যের যে নিয়ম ছিল, এখনও কি সেই নিয়ম আছে? বলিতে দুঃখ হয়, সে নিয়ম এখন নাই। লোকে এখন সন্তান সন্ততিকে কোন প্রকার কষ্ট দিতে চায় না। পঠদ্দশাতেই আমাদের বালক এবং যুবকদিগকে বিলক্ষণ বিলাসপ্রিয় দেখিতে পাওয়া যায়। আমাদের বালকেরা প্রচুর পরিমাণে উত্তম উত্তম জুতা, উত্তম উত্তম বস্ত্র, নানাবিধ গন্ধদ্রব্য ব্যবহার করিয়া থাকে, কখন কখন জামার বোতামে বড় বড়

গোলাপ ফুল গুঁজিয়াও স্কুলে আসে। চিত্তসংযমন কাহাকে বলে, এখনকার ছাত্রেরা জানিতে একবারেই অক্ষম।

তবেই বুঝা যাইতেছে যে, শিক্ষার যাহা প্রকৃত নিয়ম, এখন এ দেশে তাহা নাই। এখন শিক্ষার্থীর কষ্টসহিষ্ণুতা নাই, বিলাসবিদ্বেষ নাই, চিত্ত-সংযম নাই, নিষ্ঠা নাই। কিন্তু এগুলি না থাকিলে মানুষের প্রকৃত শিক্ষা হয় না, মনুষ্যজীবনের প্রকৃত ভিত্তি স্থাপিত হয় না, মানুষ মানুষ হয় না। স্মাইল ও ক্রেক্ সাহবের গ্রন্থে যে সকল লোকের মানুষ হওয়ার বিবরণ লিখিত আছে, এই সকল গুণ ছিল বলিয়াই তাঁহারা মানুষ হইতে পারিয়াছিলেন। আমাদের শাস্ত্রকারেরা বলেন যে, অধ্যয়ন একটি কঠোর তপস্যা। যে দেশের ইতিহাস দেখিতে ইচ্ছা হয়, দেখ, এই তপস্যার প্রমাণ পাইবে। এ তপস্যা আমরা এখন ভুলিয়া গিয়াছি, কিন্তু এ কঠোর তপস্যা আমাদের শেখা আবশ্যক হইয়াছে। মহাত্মা ভুদেব মুখোপাধ্যায় বলেন যে, "বাঙ্গালীকে অনেক ভার সহ্য করিতে হইবে, অনেক চাপ ঠেলিয়া উঠিতে হইবে; সুতরাং বাঙ্গালীর শিক্ষা কঠোর হওয়াই আবশ্যক। প্রতি পরিবারের কর্ত্তাকে এক একটি লাইকর্গস্ হইতে হইবে; কারণ, বাঙ্গালীকে স্পার্টান করিবার নিমিত্ত রাজকীয় লাইকর্গস্ জন্মিবে না।"

আরো এক কথা, হিন্দুশাস্ত্রকারদিগের মতে অধ্যয়ন ফুরাইলেই ব্রহ্মচর্য্য ফুরায় না, তপস্যা ফুরায় না। মনু বলিয়াছেন :——

"দারপরিগ্রহ করিয়া সংসারাশ্রমে থাকিয়াও ব্রহ্মচর্য্য রক্ষা করিবে।

যিনি অক্ষয় স্বর্গ এবং নিত্যসুখ কামনা করেন, তাঁহার পরম যত্নে এই গৃহস্থাশ্রম পালন করা কর্ত্তব্য। দুর্ব্বলেন্দ্রিয় ব্যক্তিগণ কদাচ ইহার পালনে সমর্থ হন না।"

এ সকল কথার অর্থ এই যে, মানুষের সমস্ত জীবনটিই ব্রহ্মচর্য্য হওয়া উচিত। জীবনকে একটি মহাব্রত মনে করিয়া সেই ব্রত উদ্‌যাপনার্থ জন্ম হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত মানুষকে কষ্টসহিষ্ণু, বিলাসবিরোধী, সংযতচিত্ত এবং নিষ্ঠাবান্ হইতে হইবে। যে মানুষ জীবনকে মহাব্রত মনে করিয়া মৃত্যু পর্য্যন্ত ব্রহ্মচর্য্য পালন না করে, তাহার জীবন নিতান্তই অসার, অর্থশূন্য এবং বিফল হইয়া থাকে। জগতে যাঁহার জীবন সার্থক হইয়াছে, তিনি চিরকালই

ব্রহ্মচারী। উদাহরণ—বুদ্ধদেব, চৈতন্য, যিশুখ্রীষ্ট, সক্রেতিস, মিল্টন, সেক্সপীয়র, সোফোক্লিস্, গাম্বফিল্দ্, গারিবল্দি। জগতে যিনি যখন ব্রহ্মচর্য্য পরিত্যাগ করিয়াছেন, তাঁহার জীবন তখনই নিষ্ফল ও কদর্য্য হইয়াছে। উদাহরণ—সিজরদিগের আমলের রোমক, এবং দ্বিতীয় চার্লসের আমলের ইংরাজ। আমাদের জীবনকেও যদি সার্থক করিতে হয়, তাহা হইলে আমাদিগকেও জন্ম হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত ব্রহ্মচর্য্য পালন করিতে হইবে। আমাদিগকেও জন্ম হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত কষ্টকে কষ্ট মনে না করিয়া, বিলাসকে তুচ্ছ করিয়া, চিত্ত এবং ইন্দ্রিয়কে আপন আপন দৃঢ় প্রতিজ্ঞার বশীভূত করিয়া, আমাদের সমস্ত শক্তিসহকারে ঘোর নিষ্ঠাবান্ হইয়া জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে হইবে। অতএব জীবনের একটি মহৎ উদ্দেশ্য স্থির করিয়া, সেই উদ্দেশ্য সাধনার্থ আমাদিগকে সংসারে থাকিয়া নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী হইতে হইবে।

এইখানে একটি সম্ভবপর প্রশ্নের মীমাংসা করা আবশ্যক। হিন্দুশাস্ত্রে ব্রহ্মচর্য্যের যেরূপ ব্যাখ্যা দেখা গেল, তাহাতে স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে, কঠোরতাই ব্রহ্মচর্য্যের প্রকৃত প্রাণ এবং গূঢ় অর্থ। যদি তাহাই হয়, তবে কোমলতার সহিত কি মানুষের কোন সম্পর্ক নাই, এবং রাখা উচিত নয়? আকাশে মেঘের যে বিচিত্র খেলা হয়, মানুষ কি তাহা চক্ষু মেলিয়া দেখিবে না? স্বচ্ছসলিলা স্রোতস্বিনীতে সান্ধ্য সমীরণে যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সুবর্ণপ্রভ বীচি উৎক্ষিপ্ত হয়, মানুষ তাহা কি দেখিবে না? বসন্তে বসুন্ধরা যে অপূর্ব্ব পুষ্পাবরণে আবৃত হয়, মানুষ কি তাহা দেখিবে না? অবশ্য দেখিবে। না দেখিলে মানুষ মানুষ হইবে না। মনুষ্যদেহে কঠিন অস্থিও আছে, কোমল মাংসও আছে। পৃথিবীতে কঠিনতম পর্ব্বতও আছে, কোমলতম কুসুমও আছে। জগতে রুদ্র রৌদ্রও আছে, কমনীয় কৌমুদীও আছে। বিশ্বের সেই দুই মূর্ত্তি ধ্যান না করিলে মানুষ মানুষ হয় না—ব্রহ্মচারীর ব্রহ্মচর্য্য সম্পূর্ণ হয় না। লক্ষ্মণ সসত্ত্বা সীতাদেবীকে তপোবনে রাখিয়া আসিলেন। ব্রহ্মচারী বাল্মীকি তাঁহাকে সান্ত্বনা করিবার নিমিত্ত বলিলেন:—

"তুমি নিজ বলের অনুরূপ জলকলস লইয়া যখন আশ্রমের চারাগাছগুলিকে বাড়াইবে, তখন স্তন্যপায়ী শিশুর উপর প্রসূতির যে অপূর্ব্ব প্রীতি, তাহা তুমি তোমার পুত্র জন্মিবার পূর্ব্বেই অনুভব করিবে।"

পৃথিবীর কোমলতার কি চমৎকার, কি রমণীয়, কি মহিমাময় ধ্যান! এইরূপে পৃথিবীর নীল আকাশ, পৃথিবীর স্বচ্ছ সলিল, পৃথিবীর সুপ্রস্ফুটিত কুসুম, পৃথিবীর সুকণ্ঠ, পৃথিবীর সুগন্ধ, পৃথিবীর সুন্দর দেহ, পৃথিবীর শ্যামল কান্তি ধ্যান করিও, তোমার ব্রহ্মচর্য্যার বিঘ্ন না হইয়া, বলবৃদ্ধি হইবে। চতুর্দ্দশ বৎসর বনবাস-রূপ কঠোর তপস্যায় যে রামচন্দ্র জয়ী হইয়াছিলেন, এইরূপেই সেই রামচন্দ্র জানকীরূপ সুকোমল সৌন্দর্য্যকে ধ্যান করিয়াছিলেন। যাহার তপস্যা যত কঠোর, তাহার তত কোমলতার প্রয়োজন। প্রখর-রবিকর-পীড়িত পথিকের সুস্নিগ্ধ, সুগন্ধি জলের যত প্রয়োজন, আর কাহারো তত নয় এবং সেই পথিকের হাতে সেই জল যত পুণ্যপথগামী হয়, আর কাহারো হাতে তত হয় না। সেই জন্য প্রাচীন ভারতে তপস্বীর তপোবনেই বেশী ফুল ফুটিত, বেশী মৃগ মৃগী খেলাইয়া বেড়াইত, বেশী কল্লোলিনীর কলকণ্ঠ শুনা যাইত। ব্রহ্মচারীর জীবন, বিশেষতঃ উপকুর্ব্বাণ ব্রহ্মচারীর জীবন, নিজের জন্য নয়, পরের জন্য। যে পরের জন্য বাঁচিয়া থাকে, তাহার যেমন আত্মত্যাগ বা আত্মনিগ্রহ আবশ্যক, তেমনি পরের সম্বন্ধে কোমল, সুমধুর এবং সহৃদয় হওয়া আবশ্যক। জগতের অপূর্ব্ব কোমলতায় হৃদয় মিশাইতে না পারিলে মনুষ্য-হৃদয় কেমন করিয়া জগতের সম্বন্ধে কোমল হইবে? পৃথিবীর সুকুমার এবং সুকোমল সৌন্দর্য্যই পরোপকারী ব্রহ্মচারীর শিক্ষার গূঢ় ভিত্তি। কোমলতার অর্থ না বুঝিলে ব্রহ্মচারীর ব্রত উদ্‌যাপন হয় না। তাই বলি যে, কেবল ব্রহ্মচারী পৃথিবীর সুকোমল সৌন্দর্য্যের প্রকৃত অর্থ বুঝিতে সক্ষম, অপর সকলে সে সৌন্দর্য্যের কেবল অপমান বা অপব্যবহার করে।

সেই জন্য জগতের সেবারূপ মহাব্রতধারী উপকুর্ব্বাণ ব্রহ্মচারীর হস্তে হিন্দুশাস্ত্রকার নারীরূপ কোমল, কমনীয় এবং পবিত্র কুসুমটি সযত্নে সমর্পণ করিয়াছিলেন। ব্রহ্মচারী ভিন্ন জগতের সৌন্দর্য্যের প্রকৃত অধিকারী আর কেহ নাই। ব্রহ্মচারীর চক্ষে জগতের সৌন্দর্য্য দেখিও, তাহা হইলে সে সৌন্দর্য্যে তুমি যত সৌন্দর্য্য দেখিবে, আর কেহই তত দেখিবেন।

শ্রীযুক্ত চন্দ্রনাথ বসু।

মহারাষ্ট্রের মহাশক্তি।

মোগল-সাম্রাজ্য যখন উন্নতির চরম সীমায় উপনীত হয়, আওরঙ্গজেবের কঠোর শাসনে যখন ভারতের উত্তরে ও দক্ষিণে, পূর্ব্বে ও পশ্চিমে, সর্ব্বত্রই ভীতি ও আতঙ্ক প্রসারিত হইয়া উঠে, স্বাধীনতার প্রধান উপাসক, তেজস্বিতার অদ্বিতীয় অবলম্ব, সাহসের একমাত্র আশ্রয় রাজপুতগণ যখন মোগলের অনুগত হন, তখন ভারতের দক্ষিণ প্রান্তে পশ্চিম-শৈলমালাপরিবৃত পবিত্র ক্ষেত্রে একটি মহাশক্তি ধীরে ধীরে সকলের হৃদয়ে গভীর বিস্ময়ের উৎপত্তি করে। ক্রমে ভারতের অদ্বিতীয় সম্রাট্ ইহার বিক্রমে কম্পিত হন, ক্রমে ইহা একই উৎসাহ ও তেজস্বিতার স্রোতে দক্ষিণাপথ হইতে আর্য্যাবর্ত্ত পর্য্যন্ত, সমস্ত জনপদ ভাসাইয়া দেয়। এই মহাশক্তি হিন্দু-রাজচক্রবর্ত্তী ভবানীভক্ত শিবজী।

শিবজী বীরত্বের জ্বলন্ত মূর্ত্তি, স্বাধীনতার অদ্বিতীয় আশ্রয়ক্ষেত্র। যখন শিবজীর আবির্ভাব হয়, তখন ভারতের পূর্ব্বতন বীরত্ব-বৈভব ধীরে ধীরে সময়ের অনন্ত স্রোতে ভাসিয়া যাইতেছিল; যাঁহারা এক সময়ে সাহসে ও বীরত্বে প্রসিদ্ধ ছিলেন, বীরেন্দ্র-সমাজের বরণীয় হইয়া অনন্ত কীর্ত্তি সঞ্চয় করিয়াছিলেন, তখন তাঁহাদের সন্তানগণ পরাধীনতার নিগড়ে ক্রমে দৃঢ়বদ্ধ হইতেছিলেন এবং স্বাধীনতায় জলাঞ্জলি দিয়া পরের আনুগত্য স্বীকারই যেন, আপনাদের জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য বলিয়া মনে করিতেছিলেন; যে তেজস্বিতায় পৃথ্বীরাজ পবিত্র তিরৌরী ক্ষেত্রে অজেয় হইয়াছিলেন, সমরসিংহ আত্মপ্রাণ তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া ভৈরব রবে বিধর্ম্মী শত্রুর সম্মুখে দাঁড়াইয়াছিলেন, এবং শেষে প্রাতঃস্মরণীয় প্রতাপ সিংহ দীর্ঘকাল, প্রবলপরাক্রম, সহায়সম্পন্ন শত্রুর সহিত সংগ্রাম করিয়া বিজয়-লক্ষ্মীতে পরিশোভিত হইয়াছিলেন, তখন সে তেজস্বিতা ও স্বাধীনত্বপ্রিয়তা ক্রমে অন্তর্হিত হইতেছিল, অনৈক্যপ্রযুক্ত বীর্য্যবন্ত আর্য্যপুরুষেরা ক্রমে পরস্পর বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িতেছিলেন, এবং মোগলের পদানত হইয়া অপনাদের শোচনীয় অধঃপতনের চরম ফল ভোগ করিতেছিলেন। মহাপরাক্রম শিবজী এই অনৈক্য দূর করেন, এবং জাতিপ্রতিষ্ঠার সূত্রপাত করিয়া দক্ষিণাপথে একটি মহাজাতি প্রতিষ্ঠিত করিয়া

তুলেন। ইঁহার মহামন্ত্রে অজেয় মোগল সাম্রাজ্য বিনষ্ট হয়, এবং বিজয়ী মুসলমান বিজিত হিন্দুর পদানত হইয়া পড়ে।

ভারত-মানচিত্রের দক্ষিণপশ্চিম অংশে শৈলমালা-পরিবৃত একটি প্রদেশ দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। ঐ প্রদেশের উত্তরে সাতপুরা পাহাড় গম্ভীরভাবে অবস্থিতি করিতেছে, পশ্চিমে অপার অনন্ত সমুদ্র তরঙ্গ-লীলা বিস্তার করিয়া, জড়জগতের অসীম শক্তির পরিচয় দিতেছে, পূর্ব্বে বরদা নদী বহিয়া যাইতেছে, এবং দক্ষিণে গোয়া নগর ও অসমতল পার্ব্বত্য ভূভাগ অবস্থিত রহিয়াছে। ঐ প্রদেশ মহারাষ্ট্র নামে পরিচিত। উহার পরিমাণফল ১০২,০০০ বর্গ মাইল। মহারাষ্ট্র দেশ মনোহর প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যে চিরবিভূষিত। উহার অভ্যন্তরে দুরারোহ সহ্যাদ্রি উত্তরে দক্ষিণে বিস্তৃত রহিয়াছে। হরিদ্বর্ণ বৃক্ষশ্রেণীতে গিরিবরের অধিকাংশ সুশোভিত। যেন পর্ব্বতশ্রেণীতে প্রকৃতি আপনার সৌন্দর্য্যের অনন্ত ভাণ্ডার সাজাইয়া রাখিয়াছে। চক্ষে না দেখিলে ঐ অনন্ত ভাণ্ডারের অপূর্ব্ব মাধুর্য্য হৃদয়ঙ্গম হয় না। প্রকৃতির এই প্রিয়তম আবাস-ক্ষেত্রে, অনন্ত জগতের এই সৌন্দর্য্য-পূর্ণ ভূখণ্ডে শিবজীর জন্ম হয়।

সম্রাট আওরঙ্গজেবের সময়ে দক্ষিণাপথের অনেক স্থলে মুসলমানদিগের আধিপত্য ছিল। বিজয়পুরের মুসলমান রাজারা বিশেষ ক্ষমতাপন্ন ছিলেন। শাহজী নামক এক জন মহারাষ্ট্রবাসী ব্রাহ্মণযুবক বিজয়পুরের রাজসরকারে চাকরী করিতেন। ক্রমে বিষয়কর্ম্মে শাহজীর ক্ষমতা পরিস্ফুট হয়, ক্রমে শাহজী বিজয়পুরের অধিপতির এক জন গণনীয় কর্ম্মচারী হইয়া উঠেন। শাহজী জিজিবাই নামে একটি মহারাষ্ট্ররমণীর পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন। জিজিবাইয়ের গর্ভে শাহজীর দুইটি পুত্রসন্তান জন্মে; প্রথমটির নাম শম্ভুজী, দ্বিতীয়টির নাম শিবজী।

শিবজী ১৬২৭ খ্রীঃ অব্দে মে মাসে পুনার পঞ্চাশ মাইল উত্তরে শিউনেরী দুর্গে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি পিতার তাদৃশ স্নেহের পাত্র ছিলেন না। শাহজী, শিবজী অপেক্ষা শম্ভুজীকেই অধিক ভাল বাসিতেন। এজন্য তিনি শম্ভুজীকে আপনার নিকটে রাখেন। শিবজী মাতার সহিত থাকেন। শিবজীর জন্মগ্রহণের তিন বৎসর পরে শাহজী টুকাবাই নামে আর একটি মহারাষ্ট্র-রমণীকে বিবাহ করেন। দ্বিতীয় বার দারপরিগ্রহ করাতে জিজি-

বাইয়ের সহিত শাহজীর বিরোধ উপস্থিত হয়, এজন্য শিবজী প্রায় ছয় বৎসর কাল পিতার দেখা পান নাই। যাহা হউক, শাহজী, দাদাজী কর্ণদেব নামক এক ব্যক্তিকে শিবজী ও তদীয় মাতার রক্ষণাবেক্ষণ এবং পূনার জাইগীরের তত্ত্বাবধান জন্য নিযুক্ত করেন। দাদাজী সাতিশয় ক্ষমতাপন্ন ও রাজস্ব-সংক্রান্ত বিষয়ে অভিজ্ঞ ছিলেন। তিনি জিজিবাইয়ের জন্য পূনাতে একটি বৃহৎ বাড়ী প্রস্তুত করেন। পূনার ঐ নূতন বাড়ীতে দাদাজী কর্ণদেবের তত্ত্বাবধানে শিবজীর শৈশবকাল অতিবাহিত হয়।

এই সময়ে মহারাষ্ট্রবাসীরা কদাচিৎ লেখা পড়া শিখিত। লেখা পড়া শিক্ষা অপেক্ষা বীরপুরুযোচিত গুণগ্রামে অলঙ্কৃত হইতেই তাহাদের বিশেষ উৎসাহ ও আগ্রহ ছিল। শিবজী নিজের নাম লিখিতে পারিতেন না। কিন্তু তিনি তীরনিক্ষেপে, তরবারি-প্রয়োগে, বড়শাসঞ্চালনে বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। তাঁহার স্বদেশীয়গণ সুনিপুণ অশ্বারোহী বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিল। শিবজী এ বিষয়ে স্বদেশের সকলকে অতিক্রম করিয়াছিলেন। তাঁহার অশ্ব-চালনা-কৌশল দেখিয়া, দর্শকগণ অপরিসীম বিস্ময় ও প্রীতির সহিত তাঁহার গুণ গান করিত। দাদাজী, শিবজীকে আপনাদের ধর্ম্মানুগত বিষয়ে আস্থা-যুক্ত করিতে প্রয়াস পাইয়াছিলেন। তাঁহার এই প্রয়াস সর্ব্বাংশে সফল হইয়াছিল। শিবজী পবিত্র হিন্দুধর্ম্মসম্মত কার্য্যে নিষ্ঠাবান্ ছিলেন। তিনি মনোযোগের সহিত হিন্দুধর্ম্মের কথা শুনিতেন। রামায়ণ, মহাভারত ও ভাগবতের আখ্যায়িকায় তাঁহার বিশেষ সুখানুভব হইত। বাল্যকাল হইতে কথকতার উপর তাঁহার এমন শ্রদ্ধা ছিল যে, যেখানে ঐ কথকতা হইত, তিনি নানা বিঘ্নবিপত্তি অতিক্রম করিয়া সেইখানে উপস্থিত হইতেন। হিন্দুধর্ম্মের উপর এইরূপ অচলা ভক্তি ও হিন্দুধর্ম্মসম্মত কার্য্যে এইরূপ আন্ত-রিক শ্রদ্ধা থাকাতে, মহাবীর শিবজী হিন্দু নামের গৌরব রক্ষা করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়াছিলেন, তাঁহার এই প্রতিজ্ঞা কিছুতেই বিচলিত হয় নাই। শত্রুর ভ্রূকুটিপাতে, বিপদের ঘোরতর অভিঘাতে তিনি এই প্রতিজ্ঞা হইতে বিচ্যুত হন নাই। শিবজী আপনার জীবনের শেষ সীমা পর্য্যন্ত নির্ভীক-হৃদয়ে, অবিচলিতচিত্তে এই সাধু প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিয়াছিলেন।

রামায়ণ ও মহাভারতের বীরত্বপূর্ণ কথায় শিবজীর তেজস্বিতা উদ্দীপ্ত

হইয়াছিল, সাহস বৃদ্ধি পাইয়াছিল এবং স্বজাতিপ্রিয়তা ও স্বদেশহিতৈষিতা বদ্ধমূল হইয়া উঠিয়াছিল। শিবজী মোগল-শাসনের মধ্যে হিন্দুরাজত্ব প্রতিষ্ঠিত করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছিলেন এবং ধর্ম্মান্ধ মুসলমানের কঠোর নিপীড়নের মধ্যে হিন্দুধর্ম্মের মহীয়সী শক্তির বিকাশ দেখাইতে চেষ্টা পাইয়াছিলেন। তাঁহার সঙ্কল্প ও চেষ্টা বিফল হয় নাই। যখন সম্রাট্ আওরঙ্গজেবের প্রতাপে প্রায় সমগ্র ভারতবর্ষ কম্পিত হইতেছিল, তখন দক্ষিণাপথে শিবজীর ক্ষমতায় একটি স্বাধীন হিন্দুরাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়। এই স্বাধীন রাজ্যের স্বাধীনতাভক্ত মহাবীরের অপূর্ব্ব বীরত্বে চিরজয়ী মোগলের বিজয়িনী শক্তি বিলুপ্ত হইয়া আসিয়াছিল। হিন্দুকীর্ত্তির গৌরবে বহুদিনের পর আবার হিন্দুর পবিত্র ভূমি গৌরবান্বিত হইয়া উঠিয়াছিল।

শিবজী মাওয়াল নামক পার্ব্বত্য স্থানের অধিবাসী মাওয়ালীদিগের একান্ত পক্ষপাতী ছিলেন। ইহারা দেখিতে সুশ্রী না হইলেও বিলক্ষণ কার্য্যপটু, সাহসী ও অধ্যবসায়-সম্পন্ন ছিল। শিবজী এই মাওয়ালী সৈন্যের উপর নির্ভর করিয়া অনেক স্থানে আপনার বিজয়-পতাকা উড্ডীন করেন। তিনি বাল্যকালেই মুসলমানদিগকে ঘৃণা করিতেন। বয়োবৃদ্ধির সহিত তাঁহার এই মুসলমান-বিদ্বেষ বৃদ্ধি পাইতে থাকে। তিনি প্রায়ই কহিতেন "আমি মুসলমানদিগকে পরাজিত করিয়া স্বাধীন রাজা হইব।" তরুণবয়স্ক বীরপুরুষের এই বাক্য নিষ্ফল হয় নাই। শিবজী মুসলমানদিগকে পরাভূত করিয়া স্বাধীন হিন্দুভূপতির সম্মানিত পদে অধিরূঢ় হইয়াছিলেন।

ষোল বৎসর বয়সে শিবজী এমন তেজস্বী ও সাহসী হইয়া উঠিলেন যে, দাদাজীর শাসন অতিক্রম করিয়াও অশ্বারোহী সৈনিক পুরুষদিগের সহিত পর্ব্বতে পর্ব্বতে বেড়াইতে লাগিলেন। এইরূপে স্বদেশের দুর্গম পার্ব্বত্য পথগুলি তাঁহার পরিচিত হইয়া উঠিল। মহারাষ্ট্রে অনেকগুলি গিরি-দুর্গ ছিল। শিবজী কৌশলক্রমে ঐ গিরি-দুর্গের অনেকগুলিতে আধিপত্য স্থাপন করিলেন। দুর্গগুলি বিজয়পুরের অধিপতির অধিকৃত ছিল। শিবজী উহা অধিকার করাতে বিজয়পুরের রাজার সহিত তাঁহার বিরোধ উপস্থিত হয়। আফজল্ খাঁ বিজয়পুরের সৈন্যের অধিনায়ক হইয়া, তাঁহার বিরুদ্ধে যাত্রা করেন। শিবজী এই সময়ে প্রতাপগড়ে অবস্থিতি করিতেছিলেন। তিনি

এই স্থানে থাকিয়া আফজল্ খাঁকে দমন করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। তাঁহার এই সঙ্কল্প-সিদ্ধির কোন ব্যাঘাত হইল না। সুসময় সম্মুখবর্ত্তী হইল, সুসময়ে শিবজী বিজয়পুরের সৈন্যের সম্মুখে প্রাধান্য স্থাপন করিতে কৌশলজাল বিস্তার করিলেন। তিনি আফজল্ খাঁকে জানাইলেন যে, বিজয়পুরের অধিপতির ন্যায় ক্ষমতাশালী লোকের বিরুদ্ধাচরণ করিতে তাঁহার কোনও ইচ্ছা নাই। তিনি আপনার ব্যবহারে অতিশয় দুঃখিত হইয়াছেন। যদি আফজল্ খাঁ দয়া করিয়া তাঁহাকে আশ্রয় দেন, তাহা হইলে তিনি নিজের অধিকৃত প্রদেশ তাঁহার হস্তে সমর্পণ করিতে প্রস্তুত আছেন।

শিবজীর এইরূপ অবনতিস্বীকারের কথায়, আফজল্ খাঁ সন্তুষ্ট হইলেন। জঙ্গলময় দুর্গম গিরিপ্রদেশে সৈন্য লইয়া অগ্রসর হওয়া যে, কত দূর কষ্টকর, তাহা তিনি অবগত ছিলেন। এখন শিবজী আপনা হইতেই তাঁহার অনুগত হইবেন, ইহা ভাবিয়া, আফজল্ খাঁ অনেক পরিমাণে নিশ্চিন্ত হইলেন। তিনি কালবিলম্ব না করিয়া, পন্তজী গোপীনাথ নামক এক জন মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণকে প্রতাপগড়ে শিবজীর নিকট পাঠাইয়া দিলেন। দূত দুর্গের নিম্নস্থিত গ্রামে উপস্থিত হইলে, শিবজী দুর্গ হইতে নামিয়া তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। পন্তজী ধীরতার সহিত শিবজীকে কহিলেন, "শাহজীর সহিত আফজল্ খাঁর বিশেষ বন্ধুত্ব আছে। আফজল, বন্ধুর পুত্রের কোনও অপকার করিতে ইচ্ছুক নহেন। তিনি আপনার সহিত শত্রুতা না করিয়া আপনাকে একটি জায়গীরের আধিপত্য দিতে প্রস্তুত আছেন।" শিবজী বিশেষ সৌজন্য ও বিনয়ের সহিত আফজল্ খাঁর প্রেরিত দূতকে বলিলেন, "একটি জায়গীর পাইলেই আমি সন্তুষ্ট হইব; আমি বিজয়পুর-ভূপতির এক জন সামান্য ভৃত্যমাত্র।" দূত শিবজীর এইরূপ শীলতা ও নম্রতা দেখিয়া সন্তোষ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। অনন্তর শিবজী দূতের অবস্থিতি জন্য যথাযোগ্য স্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিলেন। কিন্তু তাঁহার আদেশে দূতের সহচরগণ কিছু দূরে অন্য স্থানে অবস্থিতি করিতে লাগিল। একদা গভীর নিশীথে শিবজী পন্তজী গোপীনাথের নিকটে উপস্থিত হইয়া, আপনার পরিচয় দিয়া কহিলেন, "আমি হিন্দুজাতির পরিশুদ্ধ বিশ্বাস ও পবিত্র ভক্তির সম্মানরক্ষার জন্য সমস্ত কার্য্য করিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছি। ব্রাহ্মণ ও গাভীদিগকে রক্ষা করিতে,

পবিত্র দেবমন্দিরের অবমাননাকারীদিগকে শাস্তি দিতে, এবং স্বধর্ম্মবিরোধী শত্রুগণের ক্ষমতার গতিরোধ করিতে আমার বিশেষ আগ্রহ আছে। আমি ভবানীর আদেশে এই পবিত্র কার্য্যসাধনে ব্রতী হইয়াছি। আপনি ব্রাহ্মণ, সুতরাং আপনার সাহায্য করা আমার অবশ্য কর্ত্তব্য। আমার আশা আছে যে, স্বজাতি ব্রাহ্মণের সহিত আমি পরম সুখে কালাতিপাত করিতে পারিব।” শিবজী ধীরগম্ভীরভাবে ইহা কহিয়া পন্তজীকে একখানি গ্রাম ইনাম দিতে প্রতিশ্রুত হইলেন। পন্তজী এই তরুণ-বয়স্ক হিন্দুবীরের অসীম সাহস, অলোকসাধারণ দেবভক্তি ও অপরিমেয় স্বদেশ-হিতৈষিতায় মুগ্ধ হইলেন; আর তাঁহার মুখ হইতে শিবজীর বিরুদ্ধে কোনও কথা বাহির হইল না। তিনি ধীরভাবে শিবজীর কার্য্যসাধনে প্রতিশ্রুত হইলেন; প্রতিজ্ঞা করিলেন, যত দিন জীবন থাকিবে, তত দিন শিবজীর বিরুদ্ধাচরণ করিবেন না। শিবজীর আশা ফলবতী হইল। পন্তজী গোপীনাথ শিবজীর সাহস, স্বদেশভক্তি ও বাক্চাতুর্য্যে মোহিত হইয়া, তাঁহার চিরসহচরের মধ্যে পরিগণিত হইলেন।

পন্তজী গোপীনাথের পরামর্শে আফজল্ খাঁ শিবজীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে উদ্যত হইলেন। শিবজী প্রতাপগড় দুর্গের নিম্নে একটি স্থানে সাক্ষাৎ করিবেন বলিয়া, স্থির করিয়া রাখিলেন। তিনি ঐ স্থানের জঙ্গল কাটিয়া ফেলিলেন, এবং আফজল্ খাঁর আসিবার পথ পরিষ্কার করাইলেন। কিন্তু পার্শ্ববর্ত্তী স্থানের জঙ্গল পূর্ব্বের ন্যায় রহিল। শিবজী ঐ জঙ্গলে আপনার সাহসী মাওয়ালী সৈন্য সন্নিবেশিত করিয়া রাখিলেন; বিজয়পুরের সৈন্যগণ উহার কিছুই জানিতে পারিল না। নির্দ্দিষ্ট সময়ে আফজল্ খাঁ শিবজীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাত্রা করিলেন। তিনি যুদ্ধবেশে সজ্জিত ছিলেন না, তাঁহার পরিচ্ছদ মোটা মস্‌লিনের ছিল। পার্শ্বদেশে কেবল একখানি তরবারি ঝুলিতেছিল। পনর শত সৈন্য তাঁহার সঙ্গে আসিতেছিল, কিন্তু পন্তজী গোপীনাথের পরামর্শে ঐ সকল সৈন্য প্রতাপগড় দুর্গের কিয়দ্দূরে অবস্থিতি করিতে লাগিল। আফজল্ খাঁ কেবল এক জন মাত্র সশস্ত্র সৈনিক পুরুষ লইয়া পাল্কীতে শিবজীর নির্দ্দিষ্ট গৃহাভিমুখে যাত্রা করিলেন।

এ দিকে শিবজী আপনার অভীষ্ট কার্য্য সিদ্ধির জন্য প্রস্তুত হইতে লাগি-

লেন। তাঁহার দেহ লৌহ-বর্ম্মে আচ্ছাদিত হইল। ঐ বর্ম্মে বৃশ্চিক ও ব্যাঘ্রনখ * সন্নিবেশিত রহিল। অপরে না জানিতে পারে, এজন্য তিনি বর্ম্মের উপর পরিষ্কৃত কার্পাস-বস্ত্র পরিধান করিলেন। এইরূপে সজ্জিত হইয়া শিবজী ধীরে ধীরে দুর্গ হইতে নামিয়া যথোচিত শীলতার সহিত অভিবাদন করিতে করিতে আফজল্ খাঁর সমীপবর্ত্তী হইলেন। আফজল্ খাঁর ন্যায় তাঁহার সঙ্গেও এক জন সশস্ত্র অনুচর ছিল। যথারীতি অভিবাদনের পর, শিষ্টাচারের অনুবর্ত্তী হইয়া উভয়ে উভয়কে আলিঙ্গন করিলেন। অকস্মাৎ আফজল্ খাঁর ভাবান্তর হইল। অকস্মাৎ আফজল্ খাঁ "ঘোরতর বিশ্বাসঘাতকতা" বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিলেন। আলিঙ্গনসময়ে শিবজী আফজল্ খাঁর উদরে বাঘনখ প্রবেশিত করিয়া দিয়াছিলেন। যাতনায় অধীর হইয়া আফজল খাঁ শিবজীকে তরবারির আঘাত করিলেন। কিন্তু শিবজীর কার্পাস-বস্ত্রের নিম্নে লৌহ-বর্ম্ম থাকাতে ঐ আঘাতে কোন ফল হইল না। এই সকল কার্য্য নিমেষমধ্যে ঘটিল। নিমেষমধ্যে শিবজী অস্ত্রচালনা করিয়া আফজল্ খাঁকে নিস্তেজ করিয়া ফেলিলেন। আফজল্ খাঁর অনুচর ইহা দেখিয়া স্থির থাকিতে পারিল না। সে অবিচলিত ধীরতা ও প্রভূত সাহসসহকারে প্রভুহন্তা শত্রুর সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল। অনুচর এই যুদ্ধে অপরিসীম বীরত্ব দেখাইয়াছিল। কিন্তু কিয়ৎকালমধ্যে তাহারও পতন হইল। এই অবসরে পাল্কীবাহকেরা আফজল্ খাঁকে লইয়া পলাইতে উদ্যত হইয়াছিল। তাহাদের ঐ উদ্যম সফল হইল না। শিবজীর কয়েক জন সৈন্য হঠাৎ উপস্থিত হইয়া আফজল খাঁর শিরশ্ছেদপূর্ব্বক ছিন্ন মস্তক প্রতাপগড়ে লইয়া গেল। এ দিকে ইঙ্গিত পাওয়া মাত্র মাওয়ালীগণ জঙ্গল হইতে বাহির হইয়া একবারে চারি দিক হইতে বিজয়পুরের সৈন্য আক্রমণ করিল। বিপক্ষগণ ইহাদের আক্রমণ সহিতে পারিল না। তাহারা ছত্রভঙ্গ হইয়া চারি দিকে পলায়ন করিল। শিবজী বিজয়ী হইলেন। মহারাষ্ট্র-চক্রে তাঁহার অপরিসীম প্রতিপত্তি বদ্ধমূল হইল; তিনি অবিলম্বে বহু সৈন্য ও বহু সম্পত্তির অধিকারী হইয়া উঠিলেন।

যাঁহারা সরল হৃদয়, জীবনের প্রতিকার্য্যে যাঁহারা আপনাদের সরলতার

* বৃশ্চিক, বৃশ্চিকসদৃশ বক্র অস্ত্র। ব্যাঘ্রনখ, ব্যাঘ্রনখের আকার অস্ত্র।

পরিচয় দিয়া থাকেন, তাঁহারা এই কার্য্যে ঘোরতর বিশ্বাসঘাতক, পাষণ্ড বলিয়া শিবজীকে ধিক্কার দিতে পারেন। কিন্তু যাঁহারা দুর্দ্দান্ত শত্রুকে পরাজিত করিয়া স্বদেশের স্বাধীনতা রক্ষায় উদ্যত হইয়া থাকেন, স্বদেশ-দ্রোহীর মধ্যে স্বতন্ত্র রাজত্বস্থাপনে যাঁহাদের প্রয়াস হয়, তাঁহারা অন্য ভাবে এ বিষয়ের বিচার করিবেন। মুসলমানের চাতুরীবলে ভারতের স্বাধীনতা নষ্ট হইয়াছে। যখন মহাবীর পৃথ্বীরাজ স্বদেশের স্বাধীনতারক্ষার্থ বহুসংখ্য সৈন্য লইয়া দৃশদ্বতীর তীরে সমাগত হন, তখন দুরন্ত সাহাবদ্দীন গোরী তাঁহার অলোকসাধারণ তেজস্বিতা ও প্রভূত সৈন্য দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়াছিলেন। এই সাহাবদ্দীন চাতুরী অবলম্বন করিয়া রাত্রিতে প্রতিদ্বন্দ্বীর অজ্ঞাতসারে, হিন্দুসৈন্য আক্রমণ না করিলে, সহসা পৃথ্বীরাজের পতন হইত না, এবং সহসা পরাধীনতার অনন্ত অতল জলে ভারতের স্বাধীনতা-রত্ন ডুবিত না। যাহারা এইরূপ চাতুরী—এইরূপ প্রবঞ্চনা করিয়া ভারতে আপনাদের আধিপত্য স্থাপন করিয়াছে, তাহাদের সহিত সেইরূপ চাতুরী না করিলে অভীষ্ট-সিদ্ধ হইবে না, ইহা শিবজী বিলক্ষণ বুঝিয়াছিলেন। তাঁহার বিশ্বাস ছিল যে, চতুরের সহিত চাতুরী ও শঠতা না করিলে, তিনি কিছুতেই মুসলমান-সাম্রাজ্য অধঃকৃত করিয়া হিন্দুরাজ্যের গৌরব স্থাপন করিতে পারিবেন না। যে দস্যু অগোচরে অজ্ঞাতসারে আপনার দুরাকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ করিয়াছে, তাহার নিকটে সরলভাবের পরিচয় দিলে কখনই অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে না। শিবজী বাল্যকাল হইতেই এই নীতি শিক্ষা করিয়াছিলেন। এই নীতি-শিক্ষা-বলেই তিনি অভীষ্ট মন্ত্রসাধনে কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন। যাঁহারা স্বদেশ-হিতৈষিতায় উত্তেজিত হইয়া দুরন্ত ও চতুর শত্রুর ঘোরতর অত্যাচারের গতিরোধে উদ্যত হন, তাঁহাদের নিকটে শিবজীর এই শিক্ষার ফল কখনও অনাদৃত হইবে না।

সহ্যাদ্রির পশ্চিমে সমুদ্র পর্য্যন্ত ভূখণ্ড, কঙ্কণ নামে পরিচিত। বিজয়-পুরের সৈন্যের পরাজয়ের পর কঙ্কণ প্রদেশের অধিকাংশ শিবজীর হস্তগত হয়। ইহার পর শিবজী কঙ্কণের পানেলা দুর্গ অধিকার করিতে উদ্যত হন। এই দুর্গ বিজয়পুরের অধিপতির অধিকৃত ও দুর্ভেদ্য বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিল। শিবজী পানেলা দুর্গ অধিকারেও অপূর্ব্ব কৌশলের পরিচয় দেন। তিনি

আপনার কতিপয় প্রধান সেনা-নায়কের সহিত পরামর্শ করিয়া, ছলপূর্ব্বক তাঁহাদের সহিত বিবাদ করেন। ইহাতে সেনা-নায়কগণ অসন্তুষ্ট হইয়াই যেন, আট শত সৈন্যের সহিত শিবজীর চাকরী পরিত্যাগ করিয়া পানেলা দুর্গাধ্যক্ষের নিকটে উপনীত হন। দুর্গাধ্যক্ষ ইঁহাদের কৌশল বুঝিতে পারিলেন না, শিবজীর সহিত ইঁহাদের অসদ্ভাব হইয়াছে মনে করিয়া হৃষ্ট-চিত্তে ইঁহাদিগকে দুর্গে স্থান দিলেন। এদিকে শিবজী অবিলম্বে দুর্গাভিমুখে অগ্রসর হইলেন। দুর্গপ্রাচীরের সমান উন্নত কতকগুলি বৃক্ষ প্রাচীরের সম্মুখে ছিল। শিবজীর যে সকল সর্দ্দার দুর্গে স্থান পাইয়াছিলেন, একদা রাত্রিকালে তাঁহারা ঐ সকল বৃক্ষ অবলম্বন করিয়া বাহির হইতে শিবজী ও তাঁহার অনুচরদিগকে দুর্গের অভ্যন্তরে লইয়া গিয়া দুর্গদ্বার খুলিয়া দিলেন। দুর্গ সহজে অধিকৃত হইল।

এইরূপ পুনঃ পুনঃ জয়লাভে শিবজীর এত দূর প্রতিপত্তি হইল যে, নানাস্থান হইতে হিন্দু সৈনিক পুরুষেরা আসিয়া তাঁহার দল পরিপুষ্ট করিতে লাগিল। বলবৃদ্ধির সহিত শিবজী অধিকতর দুরূহ কার্য্যসাধনে প্রবৃত্ত হইতে লাগিলেন। তাঁহার অশ্বারোহী সৈন্যগণ মুসলমান ভূপতির অধিকৃত নানা জনপদ লুণ্ঠন করিতে লাগিল. ইহাদের উদ্যম, সাহস ও তেজস্বিতা বিচলিত হইল না। ইহারা দেখিতে দেখিতে বিজয়পুরের নগরপ্রাচীরের সম্মুখে আসিয়া বিলুণ্ঠনে প্রবৃত্ত হইল।

বিজয়পুরের ভূপতি ক্রুদ্ধ হইয়া, বশ্যতাস্বীকারের জন্য শিবজীর নিকটে দূত পাঠাইলেন। দূত শিবজীর সম্মুখে উপস্থিত হইল। শিবজী ধীরগম্ভীর-স্বরে তাহাকে কহিলেন, "দূত! আমার উপর তোমার প্রভুর এমন কি ক্ষমতা আছে যে, আমি তাঁহার কথায় সম্মত হইব। শীঘ্র এখান হইতে প্রস্থান কর, নচেৎ তোমাকে অপমানিত হইতে হইবে।" দূত চলিয়া গেল। বিজয়-পুরের অধিপতি শিবজীর এই উদ্ধতভাবের জন্য অধিকতর ক্রুদ্ধ হইয়া, শাহ-জীকে কারারুদ্ধ করিলেন; কহিলেন, "তোমার পুত্র শীঘ্র বশীভূত না হইলে, এই কারাগারের দ্বার গাঁথিয়া, তোমাকে জীবদ্দশায় সমাহিত করিব।" পিতার কারারোধের সংবাদে শিবজী কিছু শঙ্কিত হইলেন বটে, কিন্তু কর্ত্তব্য-বিমুখ হইলেন না। কয়েক বৎসর পরে বিজয়পুররাজ শাহজীকে ছাড়িয়া দিলেন।

বিমুক্ত হইয়া শাহজী, রায়গড়ে আপনার এই দুরদৃষ্টের মূল—তনয়ের কাছে গেলেন। শিবজী, পিতার সমুচিত সম্মান করিতে উদাসীন হইলেন না। তিনি পিতাকে গদিতে বসাইয়া, তাঁহার পাদুকা গ্রহণ পূর্ব্বক সামান্য ভৃত্যের ন্যায় পার্শ্বে দণ্ডায়মান রহিলেন। মহাবীর শিবজী কিরূপ পিতৃভক্ত ছিলেন, তাহা ইহাতে প্রকাশ পাইতেছে।

শাহজী বিমুক্ত হইলে, শিবজী পুনর্ব্বার আপনার আধিপত্য বিস্তারের চেষ্টা পাইতে লাগিলেন। এবার বিজয়পুররাজ শিবজীকে পরাজিত করিবার জন্য বহুসংখ্য সৈন্য পাঠাইলেন। একজন রণদক্ষ আবিসিনীয় সর্দ্দার এই সৈন্যদলের অধিনায়ক হইলেন। বিজয়পুরের সৈন্য শিবজীকে পানেলা দুর্গে অবরোধ করিল। কিন্তু এবারেও শিবজীর জয় হইল। তাঁহার কৌশলে আবিসিনীয় সর্দারের সমুদয় চেষ্টা ব্যর্থ হইয়া গেল। বিজয়পুর-ভূপতি অবশেষে ক্রুদ্ধ হইয়া, ঐ সর্দ্দারের প্রাণদণ্ড করিলেন।

যখন আওরঙ্গজেব তাঁহার পিতাকে সিংহাসনচ্যুত করিবার জন্য আগ্রায় যাত্রা করেন, তখন তিনি শিবজীর নিকটে কয়েকজন সম্ভ্রান্ত সর্দার পাঠাইয়া, তাঁহার সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছিলেন। কিন্তু শিবজী আওরঙ্গজেবের ন্যায়বহির্ভূত কার্য্যের অনুমোদন করেন নাই, তাঁহার প্রার্থনাও গ্রাহ্য করিতে ইচ্ছুক হন নাই। তিনি আওরঙ্গজেবের গর্হিত কার্য্যের কথা শুনিয়া, ঘৃণা ও বিরাগের সহিত দূতকে বিদায় দেন এবং দূত আওরঙ্গজেবের যে পত্র আনিয়াছিলেন, তাহা ঘৃণা ও বিরাগের সহিত কুক্কুরের লাঙ্গুলে বাঁধিয়া দিতে অনুমতি করেন। এই অবধি শিবজীর উপর আওরঙ্গজেবের প্রগাঢ় বিদ্বেষের সঞ্চার হয়। এই অবধি আওরঙ্গজেব শিবজীকে "পার্ব্বত্য মুষিক" বলিয়া অভিহিত করিয়া তাঁহার অনিষ্টসাধনে উদ্যত হন।

আওরঙ্গজেব বৃদ্ধ পিতাকে রাজ্যচ্যুত ও কারারুদ্ধ করিয়া স্বয়ং সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। এ দিকে শিবজীর সহিত বিজয়পুর-রাজের সন্ধি স্থাপিত হইল। এই সময়ে শিবজী সমস্ত কঙ্কণ প্রদেশের অধিকারী হইয়াছিলেন। তাঁহার সাত হাজার অশ্বারোহী ও পঞ্চাশ হাজার পদাতিক সৈন্য হইয়াছিল।

বিজয়পুর-রাজের সহিত সন্ধিস্থাপনের পর শিবজী মোগলরাজ্য আক্রমণ

করিতে উদ্যত হইলেন। তাঁহার আদেশে তদীয় সেনাপতিগণ দিল্লীশ্বরের অধিকার বিলুণ্ঠন করিয়া পূনায় ফিরিয়া আসিলেন। শায়েস্তা খাঁ এই সময়ে দক্ষিণাপথের শাসন-কর্ত্তা ছিলেন। সম্রাট আওরঙ্গজেব শিবজীকে দমন করিবার জন্য তাঁহার প্রতি আদেশ দিলেন। এই আদেশ অনুসারে শায়েস্তা খাঁ বহু সৈন্য লইয়া আওরঙ্গাবাদ হইতে যাত্রা করিলেন। শিবজী মোগল সৈন্যের আগমন-সংবাদ শুনিয়া, রায়গড় পরিত্যাগ পূর্ব্বক সিংহগড়ে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। শায়েস্তা খাঁ শিবজীর কৌশলের কথা জানিতেন। এজন্য সাবধানে আপনার আবাসগৃহ সুরক্ষিত রাখিলেন। তাঁহার অনুমতি-পত্র ব্যতীত কোন সশস্ত্র মহারাষ্ট্রীয় পূনায় প্রবেশ করিতে পারিত না। কিন্তু মোগল শাসন-কর্ত্তার এ সতর্কতাতেও কোন ফল হইল না। চতুর শিবজীর সাহসে ও কৌশলে সতর্ক মোগলের সর্ব্বনাশ হওয়ার উপক্রম হইল।

একদা রাত্রিকালে পৃথিবী ঘোর অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়াছে। পূনার পথ ঘাট, প্রাসাদ, সমস্তই যেন গভীর অন্ধকারে মিশিয়া গিয়াছে। কোথাও জনসমাগম নাই, কেবল এক দল বিবাহযাত্রী রাত্রির নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া ধীরে ধীরে পূনার অভিমুখে অগ্রসর হইতেছে। সাহসী শিবজী এই সুযোগে নির্দ্দিষ্ট স্থানে সেনানিবেশ করিয়া, কেবল পঁচিশ জন অনুচরের সহিত সেই বিবাহযাত্রীর দলে মিশিলেন। বরযাত্রীর দল আমোদ করিতে করিতে পূনায় প্রবেশ করিল, শিবজীও তাহাদের সঙ্গে মিলিয়া, পূনায় উপনীত হইয়া একবারে আপনার বাস-ভবনে পঁহুছিলেন। শায়েস্তা খাঁ নিদ্রিত ছিলেন। তাঁহার পরিবারের কয়েকটি স্ত্রীলোক, এই আকস্মিক আক্রমণের সংবাদ পাইয়া, তাঁহাকে জাগাইয়া দিল। শায়েস্তা খাঁ শয়ন-গৃহের গবাক্ষ দিয়া পলাইতে চেষ্টা করিলেন। এই সময়ে আক্রমণকারিগণের তরবারির আঘাতে তাঁহার হস্তের একটি অঙ্গুলি ছিন্ন হইয়া গেল। যাহা হউক, তিনি কোনরূপে পলাইয়া রক্ষা পাইলেন। কিন্তু তাঁহার পুত্র ও অনুচরগণ, সকলে নিহত হইল। শিবজী জয়োল্লাসে উৎফুল্ল হইয়া, বহুল মশালের আলোকে যাইবার পথ উদ্দীপ্ত করিয়া, পুনর্ব্বার সিংহগড়ে ফিরিয়া গেলেন।

সমস্ত মহারাষ্ট্রে মহাবীর শিবজীর এই বীরত্ব-কীর্ত্তি উদ্‌ঘোষিত হইল। সমস্ত মহারাষ্ট্রবাসী স্বদেশীয় মহাবীরের এই অপূর্ব্ব বীরত্বে মোহিত হইয়া

তাঁহার গুণ গান করিতে লাগিল। বহু বৎসর অতীত কালের তরঙ্গে ভাসিয়া গিয়াছে, কিন্তু শিবজীর ঐ সাহস ও বীরত্বের কাহিনী বিলুপ্ত হয় নাই। মহারাষ্ট্রীয়েরা আজ পর্য্যন্ত আহ্লাদের সহিত শিবজীর ঐ সাহস ও বীরত্বের কীর্ত্তন করিয়া থাকে।

পরদিন প্রাতঃকালে কতকগুলি মোগল অশ্বারোহী সিংহগড়ের অভিমুখে আসিল। শিবজী ইহাদিগকে দুর্গের নিকটে আসিতে অনুমতি দিলেন। ইহারা মহাবিক্রমে রণডঙ্কাধ্বনির সহিত নিষ্কোশিত তরবারি আস্ফালন করিতে করিতে দুর্গের সমীপবর্ত্তী হইল। তখন শিবজী ইহাদের সম্মুখে কামান স্থাপিত করিলেন। ইহারা তোপের নিকটে তিষ্ঠিতে পারিল না, ত্রস্ত হইয়া পলাইয়া গেল। শিবজীর একজন সেনাপতি পশ্চাদ্ধাবিত হইয়া হইসাদিগকে তাড়াইয়া দিলেন। এই প্রথমবার মোগল সৈন্য শিবজীর সৈন্যকর্ত্তৃক পরাভূত ও তাড়িত হইল। শিবজী আপনার অপূর্ব্ব বীরত্ব-বলে বিজয়ী হইয়া দক্ষিণাপথে আত্মপ্রাধান্য অব্যাহত রাখিলেন।

ইহার পর শিবজী অশ্বারোহী সৈন্য লইয়া, সম্রাট্ আওরঙ্গজেবের অধিকৃত সুরট নগর লুণ্ঠন করিয়া, অনেক অর্থ সংগ্রহ পূর্ব্বক রায়গড়ে ফিরিয়া আসিলেন। তিনি জলপথেও আধিপত্যস্থাপনে যত্নশীল ছিলেন। তাঁহার অনেকগুলি রণতরি ছিল। ঐ সকল রণতরি দ্বারা মোগল সম্রাটের রণতরি অধিকৃত হইল।

শিবজী সুরট নগর লুণ্ঠন করিয়া আসিয়া, শুনিলেন যে, তাঁহার পিতার মৃত্যু হইয়াছে। পিতৃবিয়োগে শিবজী সিংহগড়ে আসিয়া, শ্রাদ্ধাদি সম্পন্ন করিলেন। অনন্তর রায়গড়ে উপস্থিত হইয়া, আপনার প্রধান অমাত্যগণের সহিত অধিকৃত জনপদের শাসন-প্রণালীর সুবন্দোবস্ত করিতে লাগিলেন। এই কর্ম্মে কয়েক মাস অতিবাহিত হইল। এই সময়ে শিবজী "রাজা" উপাধি পরিগ্রহ পূর্ব্বক নিজ নামে মুদ্রা প্রস্তত করিতে লাগিলেন। বীরপুরুষের প্রতিজ্ঞা পূর্ণ হইল। মোগল সাম্রাজ্যের মহাপ্রতাপের মধ্যে ভারতের মহাবীর স্বাধীন রাজার সম্মানিত পদে অধিরূঢ় হইয়া, স্বাধীনভাবে শাসনদণ্ডের পরিচালনায় উদ্যত হইলেন।

মক্কা-যাত্রিগণ সুরট বন্দরে আসিয়া জাহাজে উঠিত। এজন্য মুসলমান-

গণের মধ্যে সুরট একটি পবিত্র স্থান বলিয়া পরিগণিত ছিল। ঐ পবিত্র স্থান বিলুণ্ঠন ও শিবজীর 'রাজা' উপাধি-গ্রহণ-সংবাদে আওরঙ্গজেব ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহার দমন জন্য রাজা জয়সিংহ ও দিলীর খাঁকে পাঠাইলেন। কিন্তু শিবজী ইঁহাদের সহিত সম্মুখযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন না। তিনি সন্ধির প্রস্তাব করিয়া প্রথমে রঘুনাথ পন্ত ন্যায়শাস্ত্রীকে জয়সিংহের নিকটে পাঠাইলেন। জয়-সিংহের সহিত দূতের অনেক কথা হইল। দূত বিদায় লইয়া শিবজীর নিকটে আসিলেন। শিবজী বীরধর্ম্মের পক্ষপাতী ছিলেন, সুতরাং কিছুমাত্র আশঙ্কা না করিয়া, অত্যল্প অনুচরের সহিত বর্ষার প্রারম্ভে জয়সিংহের শিবিরে উপ-স্থিত হইয়া, আপনার পরিচয় দিলেন। জয়সিংহ তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিয়া আনিবার জন্য একজন সম্ভ্রান্ত লোক পাঠাইলেন। শিবজী শিবির-দ্বারে উপ-স্থিত হইলে জয়সিংহ অগ্রসর হইয়া, তাঁহাকে আলিঙ্গন পূর্ব্বক আপনার আসনের দক্ষিণ পার্শ্বে বসাইলেন। সন্ধির নিয়ম নির্দ্ধারিত হইয়া, দিল্লীতে প্রেরিত হইল। সম্রাট সমস্তই অনুমোদন করিয়া পাঠাইলেন। ইহার পর শিবজী মোগলের পক্ষ হইয়া বিজয়পুরের বিরুদ্ধে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন; পরবর্ত্তী বৎসর সম্রাট কর্ত্তৃক নিমন্ত্রিত হইয়া আপনার পুত্র, পাঁচ শত অশ্বারোহী ও এক হাজার মাওয়ালী সৈন্যের সহিত দিল্লীতে যাত্রা করেন।

শিবজী দিল্লীতে উপনীত হইলেন। দিল্লীর সমগ্র অধিবাসী তাঁহাকে দেখিবার জন্য ব্যস্ত হইল। কিন্তু আওরঙ্গজেব দুর্ম্মতিপ্রযুক্ত এই পরাক্রান্ত হিন্দুভূপতির যথোচিত সম্মান করিলেন না। তিনি শিবজীকে আপনাদের প্রজাগণের সমক্ষে অপদস্থ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন।

শিবজী সম্রাটের সভাগৃহে সমাগত হইলে আওরঙ্গজেব আদর না করিয়া তাঁহাকে তৃতীয় শ্রেণীর কর্ম্মচারিগণের আসনে বসাইয়া দিলেন। শিবজী ইহাতে মর্ম্মাহত হইয়া সভাগৃহ পরিত্যাগ করিলেন। কিন্তু তিনি তৎক্ষণাৎ দিল্লী হইতে প্রস্থান করিতে পারিলেন না। সম্রাট তাঁহার বাসগৃহে প্রহরী রাখিতে নগরের কোতোয়ালকে বলিয়া দিলেন। এ দিকে চতুর মহারাষ্ট্র-পতি, দিল্লীর জলবায়ু সমভিব্যাহারী লোকের সহ্য হয় না বলিয়া, তাহা-দিগকে স্বদেশে পাঠাইতে সম্রাটের নিকটে অনুমতি চাহিলেন। সঙ্গের লোক চলিয়া গেলে শিবজী সহায়বিহীন, সুতরাং তাঁহার আয়ত্ত হইবেন

ভাবিয়া, সম্রাট তৎক্ষণাৎ অনুমতি দিলেন। ইহার পর শিবজী পীড়ার ভাণ করিয়া শয্যাশায়ী হইয়া রহিলেন। অনন্তর পীড়ার কিঞ্চিৎ উপশম হইয়াছে, এই কথা ঘোষণা করিয়া, বৃহৎ বৃহৎ ঝুড়ী মিষ্টান্নপূর্ণ করিয়া ফকীর সন্ন্যাসী-দিগকে ঐ মিষ্টান্ন দিতে লাগিলেন। এইরূপে তাঁহার আবাসগৃহ হইতে মিষ্টান্নপূর্ণ বড় বড় ঝুড়ী বাহির হইতে লাগিল। যখন প্রহরীদিগের সংস্কার জন্মিল যে, ঝুড়ীতে কেবল মিষ্টান্নই যাইতেছে, তখন সন্ধ্যার সময়ে শিবজী এক ঝুড়ীতে নিজে চড়িয়া এবং আর একটিতে তাঁহার পুত্র শম্ভুজীকে চড়াইয়া আবাসগৃহ হইতে বাহির হইলেন। নগরের উপকণ্ঠে অশ্ব সজ্জিত ছিল। শিবজী সেই অশ্বে আরোহণ করিয়া আপনার পশ্চাদ্ভাগে শম্ভুজীকে রাখিয়া তৎপরদিন মথুরায় উপনীত হইলেন। এইখানে কতিপয় বন্ধুর নিকটে শম্ভুজীকে রাখিয়া স্বয়ং সন্ন্যাসীর বেশে ভ্রমণ করিতে করিতে দক্ষিণাপথে আসিলেন। ইহার পর তাঁহার বন্ধুগণও শম্ভুজীকে লইয়া দক্ষিণাপথে উপস্থিত হন।

এই সময়ে বিজয়পুরের সহিত যুদ্ধ চলিতেছিল, পাছে শিবজী বিজয়পুর-রাজের সহিত মিলিত হন, এই আশঙ্কায় আওরঙ্গজেব তাঁহাকে জাইগীর দিয়া তাঁহার "রাজা" উপাধি দৃঢ়তর করিলেন। ইহার পর শিবজী বিজয়পুর ও গোলকুণ্ডার রাজাদিগের সহিত যুদ্ধ করিয়া তাঁহাদের নিকট কর গ্রহণ করেন।

কিছু দিনের জন্য যুদ্ধের বিরাম হইলে শিবজী নিজ রাজ্যের শৃঙ্খলাবিধান করেন। তিনি রাজস্ব-সম্বন্ধীয় সমস্ত কার্য্য ব্রাহ্মণের হস্তে দিলেন; কৃষক-দিগের উপর দৌরাত্ম্য না হয়, কেহ কাহাকে ঠকাইতে না পারে, তজ্জন্য সুনিয়ম প্রতিষ্ঠিত করিলেন। তাঁহার নিয়ম অনুসারে উৎপন্ন শস্যের পাঁচ ভাগের তিন ভাগ কৃষক পাইত, অবশিষ্ট দুই ভাগ সরকারে যাইত। শিবজী আপনার কর্ম্মচারী দ্বারা ঐ রাজস্ব সংগ্রহ করিতেন। এতদ্ব্যতীত তিনি সৈন্যদিগকে রাজ-কোষ হইতে বেতন দিবার নিয়ম করেন। তাঁহার পদাতিক সৈন্যের অধিকাংশই মাওয়ালী জাতীয়। তরবারি, ঢাল ও বন্দুক ইহাদের প্রধান অস্ত্র। ইহারা মাসে ৩৷৪ টাকা হইতে ১০৷১২ টাকা বেতন পাইত, অশ্বারোহী সৈন্য "বর্গী" ও শিলীদার," এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত

ছিল। বর্গীরা অশ্ব ও মাসে ৬।৭ টাকা হইতে ১৫।২০ টাকা পর্য্যন্ত বেতন পাইত। শিল্লীদারেরা আপনাদের অশ্বে কাজ করিত। ইহাদের বেতন ১৮।২০ টাকা হইতে ৪০।৫০ টাকা পর্য্যন্ত ছিল। লুণ্ঠনে যাহা পাওয়া যাইত, তৎসমুদয় রাজকোষে জমা হইত। লুণ্ঠনকারীরা কেবল উপযুক্ত পারিতোষিক পাইত। ১০ জন সৈন্যের উপর একজন নায়ক, ৫০ জনের উপর এক জন হাবিলদার ও ১০০ জনের উপর একজন জুম্‌লাদার থাকিত। হাজার পদাতিক সৈন্যের অধ্যক্ষকে এক হাজারী বলা যাইত। পাঁচ হাজারীর উপর প্রধান সৈন্যাধ্যক্ষ থাকিতেন।

পদাতিকদিগের ন্যায় অশ্বারোহী সৈন্যেরও শ্রেণী ছিল। ২৫ জন অশ্বারোহী সৈন্যের উপর হাবিলদার, ১২৫ জনের উপর জুম্‌লাদার ও ৬২৫ জনের উপর সুবাদার ছিল। ৬,২৫০ জন অশ্বারোহীর অধ্যক্ষকে পাঁচ হাজারী বলা যাইত। তরবারি, ঢাল ও বড়শা অশ্বারোহীদিগের প্রধান অস্ত্র ছিল। ইহাদের অশ্বগুলি ক্ষুদ্রাবয়ব ও দ্রুতগামী হওয়াতে ইহারা অনায়াসে ত্বরিতগতিতে পার্ব্বত্য প্রদেশে গমনাগমন করিতে পারিত।

হিন্দুদিগের মতে শরৎকালই দিগ্‌বিজয়-যাত্রার সময়। প্রতাপশালী শিবজী ঐ সময়ে আড়ম্বরসহকারে দশভুজা দুর্গার পূজা করিয়া দিগ্বিজয়ে বহির্গত হইতেন। শিবজী শত্রুদিগের অধ্যুষিত জনপদ লুণ্ঠন করিতেন বটে, কিন্তু কৃষক, গো অথবা স্ত্রীলোকদিগের উপর হস্তক্ষেপ করিতেন না। এইরূপ পরাক্রান্ত মোগল সাম্রাজ্যের উপর মহারাষ্ট্ররাজ্য স্থাপিত হয়, এবং এইরূপে মহারাষ্ট্রীয়গণ সাধারণের নিকটে একটি প্রধান জাতি বলিয়া পরিগণিত হইয়া উঠে।

আওরঙ্গজেব বাহিরে সৌজন্য দেখাইয়া, শিবজীকে আর একবার হস্তগত করিতে চেষ্টা পাইয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার ঐ চেষ্টা ফলবতী হয় নাই। শিবজী আওরঙ্গজেবের কৌশলজালে জড়িত হইলেন না। তিনি পূর্ব্বের ন্যায় দক্ষিণাপথের নানাস্থানে আধিপত্য বিস্তার করিতে লাগিলেন। সুতরাং মোগল সম্রাটকে এখন বাধ্য হইয়া শিবজীর সহিত প্রকাশ্য সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইতে হইল। শিবজী ইহাতে কিছুমাত্র ভীত হইলেন না, আত্মসম্মানে জলাঞ্জলি দিয়া মোগলের আনুগত্য স্বীকার করিলেন না। তিনি প্রকৃত

বীরপুরুষের ন্যায় আপনার বীরধর্ম্মরক্ষায় যত্নশীল হইলেন। অবিলম্বে মোগল সম্রাটের অধিকৃত কয়েকটি দুর্গে বিজয়-পতাকা স্থাপিত হইল। শিবজী ইহার পর পনর হাজার অশ্বারোহী সৈন্য লইয়া আর একবার সুরট নগরে উপনীত হইলেন। তিন দিন ধরিয়া নগর বিলুণ্ঠিত হইল। কেহই তেজস্বী মহারাষ্ট্র-পতির বিরুদ্ধাচরণে সাহসী হইল না। শিবজী অবাধে সুরটের ধনসম্পত্তি সংগ্রহ পূর্ব্বক স্বরাজ্যে প্রত্যাগত হইলেন।

শিবজী যখন সুরট হইতে ফিরিয়া আসিতেছিলেন, তখন দায়ুদ খাঁ নামক এক জন মোগল সেনাপতি পাঁচ হাজার অশ্বারোহী সৈন্য লইয়া তাঁহার পশ্চাদ্ধাবিত হন। শিবজী দায়ুদ খাঁকে আক্রমণ করিয়া, সম্পূর্ণরূপে পরাভূত করেন। এ দিকে তাঁহার সেনাপতি প্রতাপ রাও খান্দেশ প্রদেশে যাইয়া, নানা স্থান হইতে কর সংগ্রহ করিতে থাকেন। শিবজীর এইরূপ প্রতাপ ও আধিপত্যে চিন্তিত হইয়া আওরঙ্গজেব তাঁহার বিরুদ্ধে মহব্বৎ খাঁর অধীনে চল্লিশ হাজার সৈন্য দক্ষিণাপথে পাঠাইয়া দেন। শিবজী এই সৈন্যের সম্মুখে আত্মপ্রাধান্যস্থাপনে বিমুখ হন নাই। তিনি মরোপন্ত ও প্রতাপ রাও নামক আপনার দুইজন প্রধান সেনাপতিকে মোগল সৈন্যের সহিত যুদ্ধ করিতে অনুমতি দেন। এই সেনাপতি-দ্বয়ের আগমন সংবাদ শুনিয়া, মহব্বৎ খাঁ ইখলাস খাঁর অধীনে বহুসংখ্য সৈন্য ইঁহাদের বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন। এই যুদ্ধে মোগল সৈন্য সম্পূর্ণরূপে পরাজয় স্বীকার করে। তাহা-দের অনেকে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। ২২ জন সেনানায়ক নিহত হন। কয়েক জন প্রধান সেনাপতি আহত হইয়া বন্দিত্ব স্বীকার করেন।

মোগল সৈন্যের সহিত মহারাষ্ট্রীয়দিগের এইটি প্রধান সম্মুখ-যুদ্ধ। এই যুদ্ধে, শিবজীর সৈন্যগণ বিজয়লক্ষ্মীতে গৌরবান্বিত হয়। তাহাদের বিজয়িনী শক্তির মহিমা চারিদিকে পরিকীর্ত্তিত হইতে থাকে। শিবজী মহাপরাক্রান্ত ভূপতি বলিয়া সাধারণের নিকটে সম্মানিত হন। তাঁহার প্রতাপ, তাঁহার বীরত্ব, তাঁহার সমর-চাতুরীতে সকলেই বিস্মিত হইয়া তাঁহাকে অলোকসাধারণ বীরপুরুষ বলিয়া মনে করিতে থাকে। মোগল সম্রাট্ আওরঙ্গজেব এই পরা-ক্রান্ত শত্রুর অপূর্ব্ব প্রভাবে স্তম্ভিত হন। এই যুদ্ধে যে সকল সেনাপতি বন্দী হইয়াছিলেন, শিবজী তাঁহাদের সহিত কোনরূপ অসদ্ব্যবহার করেন নাই।

তিনি বন্দীদিগকে প্রভূত সম্মানের সহিত রায়গড়ে প্রেরণ করেন, এবং তাঁহাদের ক্ষত স্থান ভাল হইলে, প্রভূত সম্মানের সহিত তাঁহাদিগকে বিদায় দেন। ভারতের অদ্বিতীয় বীরপুরুষ পবিত্র বীরধর্ম্মের অবমাননা করেন নাই। আহত বন্দিগণকে রায়গড়ে কখনও কোনরূপ অসুবিধা ভোগ করিতে হয় নাই। শিবজীর আদেশে ইঁহাদের যথোচিত শুশ্রূষা হইয়াছিল। পতিত শত্রুর প্রতি এইরূপ সৌজন্য প্রকাশ করাতে শিবজী প্রকৃত বীরোচিত মহত্ত্ব ও উদারতার পরিচয় দিয়াছিলেন। এই মহত্ত্ব ও উদারতা, চিরকাল তাঁহাকে পবিত্র ইতিহাসের বরণীয় করিয়া রাখিবে।

শিবজী পূর্ব্বেই "রাজা" উপাধি গ্রহণ পূর্ব্বক নিজ নামে মুদ্রা অঙ্কিত করিয়াছিলেন। এখন বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণগণের সহিত পরামর্শ করিয়া শাস্ত্রের নিয়মানুসারে রাজ্যাভিষেকের আয়োজন করেন। অভিষেক-কার্য্য সম্পাদনের জন্য গঙ্গাভট্ট নামক একজন শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণ বারাণসী হইতে রায়গড়ে উপনীত হন। মহারাষ্ট্রের ইতিহাসে ১৬৭৪ খ্রীঃ অব্দের ৬ই জুন প্রাতঃস্মরণীয় পবিত্র দিনের মধ্যে পরিগণিত। এই পবিত্র দিনে দুরারোহ শৈল-শিখরবর্ত্তী রায়গড়ে মহারাজ শিবজী স্বাধীন হিন্দু-রাজচক্রবর্ত্তীর সম্মানিত পদে অধিষ্ঠিত হন। শাস্ত্র-পারদর্শী গঙ্গাভট্ট এই পবিত্র দিনে শিবজীকে রাজ্যে যথা-শাস্ত্র অভিষিক্ত করেন। ব্রাহ্মণগণ এই উপলক্ষে অনেক ধর্ম্মসম্মত কার্য্যে প্রবৃত্ত হন। মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠানে, মহোল্লাসের তরঙ্গে রায়গড়ে অপূর্ব্ব দৃশ্যের বিকাশ হয়। বহুদিনের পর স্বাধীনতাভক্ত হিন্দু বীরগণের পবিত্র জয়-ধ্বনিতে রায়গড় পরিপূর্ণ হইয়া উঠে। মহাবীর শিবজী রাজ-বেশে রাজ-সিংহাসনে উপবেশন পূর্ব্বক এই পবিত্র দিনের স্মরণার্থ একটি অব্দের প্রতিষ্ঠা করেন এবং রাজ্যসম্পর্কীয় উপাধি সকল পারস্য নামের পরিবর্ত্তে সংস্কৃত নামে অভিহিত করিতে আদেশ দেন। এইরূপে শিবজীর অভিষেক-কার্য্য সম্পাদিত হয়। এইরূপে এই শেষ বার পরাধীন পর-পীড়িত ভারতের হিন্দু বীর আপনার অসাধারণ বীরত্বে দুরন্ত শত্রুর মধ্যে রাজমুকুট গ্রহণ করিয়া স্বাধীনতার মহিমায় গৌরবান্বিত হন।

শিবজী রাজপদবী গ্রহণ করিয়া, যথানিয়মে রাজ্য শাসন করিতে লাগিলেন। নর্ম্মদা হইতে কৃষ্ণা নদী পর্য্যন্ত, দক্ষিণ ভারতবর্ষ তাঁহার অধীন

হইয়াছিল। তিনি এই বিস্তৃত রাজ্য-শাসনে কখনও ঔদাসীন্য দেখান নাই। যুদ্ধজয়ে ও রাজ্যাধিকারে তাঁহার যেরূপ ক্ষমতা ও কৌশল প্রকাশিত হয়, তিনি অধিকৃত রাজ্যের শৃঙ্খলাবিধানেও সেইরূপ ক্ষমতা ও কৌশলের পরিচয় দেন। শিবজী ইহার পরেও, নানাস্থানে যুদ্ধে ব্যাপৃত ছিলেন। এই সকল যুদ্ধেও তাঁহার অপরিসীম ক্ষমতা প্রকাশ পাইয়াছিল। তাঁহার সৈন্যগণ একসময়ে নর্ম্মদা নদী পার হইয়া মোগল সম্রাটের অধিকৃত জনপদ আক্রমণ করিতেও সঙ্কুচিত হয় নাই। যখন মোগল সেনানী দিলির খাঁ বিজয়পুরের অধিপতিকে আক্রমণ করেন, তখন বিজয়পুর-রাজ শিবজীর সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছিলেন। শিবজী এই সাহায্যদানে অসম্মত হন নাই। তাঁহার সমর-চাতুরীতে দিলির খাঁ এমনি ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠেন যে, তাঁহাকে অগত্যা বিজয়পুর পরিত্যাগ করিতে হয়। বিজয়পুররাজ এজন্য ভূসম্পত্তি দিয়া শিবজীর নিকটে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

এইরূপে নানাস্থানে নানাবিষয়ে আপনার অসামান্য সাহস, অপরিমেয় ক্ষমতা ও অবিচলিত তেজস্বিতার পরিচয় দিয়া, মহাবীর শিবজী ঐহিক জীবনের চরম সীমায় উপনীত হন। তাঁহার হাঁটু ফুলিয়া উঠাতে তিনি রায়গড়ে গমন করেন। ক্রমে প্রচণ্ড জ্বরের আবির্ভাব হয়। এই জ্বরের আর বিরাম হইল না। শিবজী জ্বরারম্ভের সপ্তম দিবসে ১৬৮০ অব্দের ৫ই এপ্রেল ৫৩ বৎসর বয়সে ইহলোক হইতে অন্তর্হিত হইলেন।

এইরূপে অসাধারণ বীরপুরুষের অসাধারণ ঘটনাপূর্ণ জীবনের অবসান হইল। বীরপুরুষের সমস্ত কার্য্যই লোকাতীতভাবে পরিপূর্ণ। ভারতের অদ্বিতীয় সম্রাটও তাঁহার ক্ষমতা ও প্রাধান্যরোধে সমর্থ হন নাই। যখন তাঁহার মাওয়ালী সৈন্য, তাঁহার সমর-পটুতা, তাঁহার সাহস ও তাঁহার রাজ্যশাসনের কথা মনে হয়, তখন তাঁহার প্রতি অপরিসীম শ্রদ্ধা ও প্রীতির সঞ্চার হইয়া থাকে। তিনি পিতার অজ্ঞাতসারে, বন্ধুজনের অনভিমতে নিঃসহায় নিরবলম্ব হইয়া অভীষ্ট কার্য্যসাধনে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। ইহাতে ক্ষণকালের জন্যও তাঁহার মনে কোনরূপ আশঙ্কা বা উদ্বেগের সঞ্চার হয় নাই। তিনি অপূর্ব্ব ক্ষমতা ও অধ্যবসায়-বলে আপনার গুরুতর সাধনায় সুসিদ্ধ হন, এবং কৃতকার্য্যতায় গৌরবান্বিত হইয়া অবিনশ্বর কীর্ত্তি স্থাপন করেন।

শিবজী স্বজাতির পূর্ব্বতন গৌরবের উদ্ধারকর্ত্তা। বহুশতাব্দীর অত্যাচার ও অবিচারে যে জাতি নিপীড়িত ও নিষ্পেষিত হইতেছিল, যে জাতি স্বাধীনতায় জলাঞ্জলি দিয়া, পরাধীনতাস্বীকারই পুরুষার্থ বলিয়া মনে করিতেছিল, শিবজী সেই জাতিকে ধীরে ধীরে উন্নতির পথে আনয়ন করেন, এবং ধীরে ধীরে সেই জাতির হৃদয়ে অচিন্তনীয় সাহস ও উৎসাহ প্রসারিত করিয়া তাহাদিগকে স্বাধীনতা-ভক্ত বীরপুরুষের সম্মানিত পদে স্থাপিত করিয়া তুলেন। মোগল সাম্রাজ্যের উন্নতির সময়ে, তাঁহার ক্ষমতায় একটি স্বাধীন হিন্দুরাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়। পরাধীনতার শোচনীয় সময়ে—নিপীড়নের ভয়াবহ কালে, হিন্দুর পবিত্র ভূমিতে, আর কোন হিন্দুবীরকর্তৃক এরূপ পরাক্রান্ত রাজ্যের প্রতিষ্ঠা হয় নাই।

অপরিসীম সাহস ও ক্ষমতা থাকাতে শিবজী সকল বিষয়েই কৃতকার্য্য হইতেন। তাঁহার ক্ষমতায় সুশিক্ষিত মোগল সৈন্যও ভীত হইয়া ইতস্ততঃ পলায়ন করে। বস্তুতঃ সাহসে, কৌশলে ও ক্ষমতায় তৎসময়ে তাঁহার কোন প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল না। সম্রাট আওরঙ্গজেব তাঁহাকে "পার্ব্বত্য মূষিক" বলিয়া ঘৃণা করিতেন। কিন্তু এই পার্ব্বত্য মূষিকের ক্ষমতায় দিল্লীর প্রতাপান্বিত সম্রাট এত দূর নিপীড়িত হইয়াছিলেন যে, অগত্যা তিনি ইঁহার প্রাধান্য স্বীকার করিতে বাধ্য হন। আওরঙ্গজেব শিবজীর মৃত্যু-সংবাদ শুনিয়া কহিয়াছিলেন,—"শিবজী এক জন প্রধান সেনাপতি ছিল; যখন আমি ভারতবর্ষের প্রাচীন রাজ্যগুলি বিনষ্ট করিতে চেষ্টা পাইতেছিলাম, তখন কেবল এই ব্যক্তিই একটি নূতন রাজ্য স্থাপন করে। আমার সৈন্য উনিশ বৎসর কাল তাহার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়াছিল, তথাপি তাহার রাজ্যের কোন অবনতি হয় নাই।" আওরঙ্গজেবের কথাতেই শিবজীর ক্ষমতার পরিচয় পাওয়া যাইতেছে।

শিবজী শত্রুর অপকারী ছিলেন। কিন্তু যাহারা পরাজিত ও বন্দীভূত হইত, তাহাদের প্রতি যথোচিত সৌজন্য দেখাইতেন। তিনি আত্মীয় স্বজন ও অধীনস্থ কর্ম্মচারীর সহিত কোনরূপ অসদ্ব্যবহার করিতেন না। এইরূপ সদয় ব্যবহারে সকলেই তাঁহার অনুরক্ত থাকিত। মিতাচার তাঁহার একটি গুণ ছিল। অসাধারণ ক্ষমতাবলে অপরিমিত ধনসম্পত্তির অধিকারী

হইলেও তিনি কখনও সৌখীনতার পরিচয় দেন নাই। তাঁহার নিকটে ভোগবিলাসের আদর ছিল না। তিনি সামান্য বেশে ও সামান্য আহার-পানে পরিতুষ্ট থাকিতেন।

শিবজী দক্ষিণাপথে যে রাজ্য প্রতিষ্ঠিত করেন, তাহার দৈর্ঘ্য চারি শত মাইল, বিস্তার এক শত কুড়ি মাইল। তাঞ্জোরেও তিনি আধিপত্য স্থাপন করিয়াছিলেন। নর্ম্মদা হইতে তাঞ্জোর পর্য্যন্ত, কঙ্কণ কইতে মাদ্রাজ পর্য্যন্ত, বিস্তৃত ভুখণ্ডের অধিপতিগণ কোন না কোন সময়ে শিবজীর সাহায্য প্রার্থনা করিতেন। সকলেই শিবজীকে কর দিয়া সন্তুষ্ট রাখিতেন। সমগ্র দক্ষিণা-পথে তাঁহার অসীম প্রভুত্ব ছিল। দক্ষতায়, একাগ্রতায়, সত্বরতায় তিনি সকল-কেই অতিক্রম করিয়াছিলেন। কেহই তাঁহার কৌশলজাল ভেদ করিতে পারিত না, কেহই তাঁহার অভিসন্ধি বুঝিতে সমর্থ হইত না, এবং কেহই তাঁহার ক্ষমতারোধে সাহস পাইত না। তিনি মুসলমানদিগকে বিশ্বাসঘাতক বলিয়া জানিতেন। মুসলমানের বিশ্বাসঘাতকতার জন্য যে, স্বদেশের অধঃ-পতন হইয়াছে, ইহা তিনি বেশ্‌ বুঝিতে পারিয়াছিলেন। তাঁহার ধারণা ছিল যে, বিশ্বাসঘাতকের সহিত বিশ্বাসঘাতকতা না করিলে অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে না। এই ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া, তিনি কোন কোন সময়ে বিশ্বাসের বহির্ভূত কার্য্য করিতেও বাধ্য হইয়াছিলেন।

শিবজী খর্ব্বকায় ছিলেন। তাঁহার চক্ষু উজ্জ্বল এবং মুখমণ্ডল সুগঠিত ও বীরত্বব্যঞ্জক ছিল। দেহের পরিমাণ অনুসারে তাঁহার বাহুযুগলের দৈর্ঘ্য অধিক বোধ হইত। তাঁহার অনুরক্ত স্বদেশীয়গণ তাঁহাকে দেবতার অবতার বলিয়া মনে করিয়া থাকেন। তিনি আপনার তরবারির নাম "ভবানী" রাখিয়াছিলেন। ঐ তরবারি সেতারার রাজার অধিকারে রহিয়াছে। আজ পর্য্যন্ত সেতারার রাজসংসারে শিবজীর ভবানীর পূজা হইয়া থাকে।

শিক্ষা।

শিক্ষা, বুদ্ধি পরিমার্জ্জিত ও হৃদয় সংস্কৃত করিবার প্রধান উপায়। বুদ্ধি পরিমার্জ্জিত না হইলে কল্পনা ও প্রতিভার বলে পবিত্র সুখভোগের অধিকারী

হওয়া যায় না, এবং হৃদয় সংস্কৃত না হইলে সর্ব্বপ্রকার উৎকর্ষ ও সর্ব্বপ্রকার অনবদ্যতার মনোহর আভরণে অলঙ্কৃত হইতে পারা যায় না। শিক্ষা প্রতিভা-শক্তিকে সুপ্রণালীক্রমে উন্মেষিত করে, এবং মানবী প্রকৃতিকে দেবভাবান্বিত করিয়া তুলে।

শিক্ষা-প্রভাবে যাহার হৃদয় সংস্কৃত হয় নাই, বুদ্ধি মার্জ্জিত হয় নাই, এবং বিবেক কর্ত্তব্য-পথ প্রদর্শনে অগ্রসর হয় নাই, সে পবিত্র মানবনামের যোগ নহে। জলধির অসীম বিস্তারে যেমন একই নীলিমা বিকাশ পায়, তাহার হৃদয় সেইরূপ অজ্ঞানের ঘোর অন্ধকারে আচ্ছন্ন থাকে। সে কেবল ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্ত হইলেই আপনাকে চরিতার্থ জ্ঞান করে। প্রকৃতির কার্য্যকারণের সূক্ষ্ম অনুসন্ধানে, আপনার কর্ত্তব্যনির্দ্ধারণের সূক্ষ্ম বিচারে তাহার মন নিয়োজিত হয় না। সে মহাসাগরের তরঙ্গাবলী দর্শনে ভীত হয়, উন্নত গিরি-শৃঙ্গে মেঘমালা দেখিয়া নয়ন মুদ্রিত করে, এবং গভীর বজ্রনাদ ও দিগ্দাহকারী দাবানলে সঙ্কুচিত হইয়া থাকে। এই সকল ভয়ঙ্কর দৃশ্য যে, জড় জগতের অনন্তশক্তি বিকাশ করিতেছে, তাহা তাহার মস্তিষ্কে নীত হয় না। মানবগণ প্রতিভা ও কল্পনার প্রভাবে এই অনন্ত শক্তিকে আয়ত্ত করিয়া পৃথিবীতে যে, অত্যদ্ভুত কার্য্যকলাপের অনুষ্ঠান করিতেছে, তাহা ভাবিয়া সে আনন্দ অনুভব করে না। কে তাহার সম্মুখে এই সকল ভয়ঙ্কর ও সুন্দর দৃশ্য প্রসারিত রাখিয়াছেন, কাহার অসীম শক্তির প্রভাবে এই জড় জগৎ ব্যবস্থাপিত হইয়া আপনার শক্তি প্রকাশ করিতেছে, তাহা সে একবারও অনুধাবন করে না। সে কূর্ম্মের ন্যায় আপনাতেই আপনি লুক্কায়িত থাকিয়া জীবিত কাল শেষ করে। সে বৃক্ষের অনায়াস-লব্ধ ফল ভোজন করিয়া পরিতৃপ্ত হয়, পরিষ্কৃত নির্ঝরবারি পান করিয়া তৃষ্ণা শান্তি করে, এবং অবলীলায় ও অসঙ্কোচে নানা প্রকার জগুপ্সিত কার্য্য সম্পন্ন করিয়া অপার আনন্দ অনুভব করিয়া থাকে। কিছুতেই তাহার চরিত্র সংগঠিত হয় না, জীবিত প্রয়োজন সাধিত হয় না, এবং বুদ্ধিবৃত্তি পরিমার্জ্জিত হইয়া সৎপথ অবলম্বন করে না। সে অজ্ঞানাবস্থায় ভূমিষ্ঠ হয়, এবং অজ্ঞানাবস্থাতেই কালাতিপাত করিয়া ইহলোক হইতে অবসৃত হইয়া থাকে।

কিন্তু সুশিক্ষা যাঁহাকে সর্ব্ব-শ্রেষ্ঠ গুণগ্রামে অলঙ্কৃত করিয়াছে, তিনি

পৌর্ণমাসী রজনীর জ্যোৎস্না-বিধৌত কুমুদস্থলের ন্যায় পবিত্র ও কলঙ্কশূন্য। তিনি নরলোকে থাকিয়াও দেবলোকের পবিত্র সুখ সম্ভোগ করিয়া থাকেন। পবিত্র চরিত্রের বলে, গভীর দূরদর্শিতার সাহায্যে ও সুস্থির বিবেক-বুদ্ধির প্রসাদে তিনি আপনার কর্ত্তব্য যথারীতি সম্পাদন করিয়া অবিনশ্বর কীর্ত্তিস্তম্ভ স্থাপন করেন। কিছুতেই তাঁহার সাধনা প্রতিহত হয় না, এবং কিছুতেই তাঁহার কর্ত্তব্য-বুদ্ধি অবনত হইয়া পড়ে না। তিনি কখনও ভূলোক হইতে সৌর জগতে উপস্থিত হইয়া গগন-বিহারী গ্রহগণের কার্য্য দেখিয়া পুলকিত হন, কখনও পার্থিব জগতে অবতরণ পূর্ব্বক প্রকৃতির গূঢ় তত্ত্ব নির্ণয় করিয়া সকলকে বিস্ময়ে অভিভূত করেন, কখনও অজ্ঞান ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন সমাজকে জ্ঞানালোকে আলোকিত ও পবিত্রতায় গৌরবান্বিত করিয়া তুলেন, এবং কখনও মূর্ত্তিমতী দয়া ও ন্যায়পরতা হইয়া রোগাতুরকে পথ্য, শোকসন্তপ্তকে সান্ত্বনা ও উচ্ছৃঙ্খলকে সদুপদেশ দিয়া সম্প্রীত করিয়া থাকেন। তাঁহার হৃদয় অটলতা ও নির্ভীকতায় পূর্ণ থাকে, তাঁহার কর্ত্তব্য-বুদ্ধি সুখে দুঃখে, সুসময়ে দুঃসময়ে, অটল গিরিবরের ন্যায় সদা উন্নত রহে, এবং তাঁহার ন্যায়পরতা ও দূরদর্শিতা সমস্ত বিঘ্নবিপত্তির দুশ্ছেদ্য আবরণ উন্মুক্ত করিতে সদা যত্নপর হইয়া থাকে। তিনি এইরূপে পবিত্রতার মনোহর আভরণে ভূষিত হইয়া সাধারণের অচিন্ত্য, অগম্য ও অনাস্বাদিত-পূর্ব্ব আনন্দ-প্রবাহে অভিষিক্ত হইতে থাকেন।

পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে, সুশিক্ষাবলে বুদ্ধিবৃত্তি পরিমার্জ্জিত ও হৃদয় সংস্কৃত হইয়া থাকে। যাহার হৃদয় সংস্কৃত হয় নাই, চরিত্র সংগঠিত হয় নাই এবং পবিত্রতা যাহার হৃদয়ে প্রতিফলিত হয় নাই, সে কখনও সুশিক্ষিত বলিয়া গণ্য নহে। যখন দেখিব, এক জন সাহিত্যে অসামান্য ক্ষমতার পরিচয় দিতেছে, গণিতে অসাধারণ পারদর্শিতা প্রদর্শন করিয়া সকলকে চমকিত করিতেছে, দর্শনের জটিল অর্থ উদ্ভেদ করিয়া আপনি মহাপ্রজ্ঞ ও মহাজ্ঞানী বলিয়া সাধারণের শ্রদ্ধাস্পদ হইতেছে, কিন্তু পরক্ষণেই যদি সে অত্যাচার ও অবিচারে সমাজকে ভারাক্রান্ত করিয়া তুলে, তাহা হইলে আমরা তাহাকে অশিক্ষিত বলিয়াই কাতর নয়নে চাহিয়া দেখিব। যে মস্তিষ্কের শক্তিতে মহীয়ান্ হইয়াও হৃদয়ের শক্তিকে উপেক্ষা করে, সে সুশিক্ষিত নহে, সুশিক্ষিত

নামের কলঙ্ক মাত্র, এবং ঈদৃশী শিক্ষাও সুশিক্ষা নহে, কুশিক্ষার অপবিত্র ছায়ামাত্র।

হৃদয়ের শক্তি মার্জ্জিত ও উন্নত করা, যেমন সুশিক্ষার প্রয়োজন, সেইরূপ স্বাবলম্বন-বলে অন্যের সাহায্য-নিরপেক্ষ হইয়া যথানিয়মে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করাও সুশিক্ষার একটি প্রধান উদ্দেশ্য। যে শিক্ষায় স্বাবলম্বন-শক্তির উন্মেষ হয় না, তাহা প্রকৃত "শিক্ষা" নহে। স্বাবলম্বন মানুষকে সর্ব্বদা উন্নত ও অবিচলিত রাখে। আত্মাবলম্বন না থাকিলে কখনই কেহ কোন দুরূহ কার্য্য সাধন করিয়া উন্নতি লাভে সমর্থ হয় না, এবং স্বাধীনতার সুখময় ক্রোড়ে লালিত হইয়া অমর-স্পৃহণীয় পবিত্র সুখ আস্বাদ করিতে পারে না। আত্মাবলম্বন ও আত্মাদর থাকিলে লোকে যে অবস্থাতেই পতিত হউক না কেন, সেই অবস্থায় থাকিয়াই, অসঙ্কুচিতচিত্তে আপনার উৎকর্ষ সাধন করিতে পারে।

হৃদয়ের শক্তির পরিমার্জ্জন এবং আত্মাবলম্বন ও আত্মাদরের উন্নতিসাধনের সহিতই সুশিক্ষার প্রয়োজন শেষ হয় না। এই সকলের সহিত পরমাত্মনিষ্ঠা ও চিত্তসংযম থাকা আবশ্যক। পরমাত্মানিষ্ঠ ও সংযতচিত্ত না হইলে শিক্ষা প্রগাঢ় ও কর্ত্তব্যবুদ্ধির উদ্দীপক হয় না। "মনুষ্য অপূর্ণ, অসমর্থ ও অসংখ্য-অভাব-বিশিষ্ট।" পরমাত্মানিষ্ঠায় এই অপূর্ণতায় পূর্ণতা, অসামর্থ্যে সামর্থ্য এবং অভাবে বিষয়-প্রাপ্তি, কিয়দংশে সম্পন্ন হইয়া থাকে। যে হৃদয় ঐশ্বরিকতত্ত্বে আকৃষ্ট নহে, সে হৃদয় বিশুষ্ক ও সে হৃদয় চিরশোভা-হীন। যিনি সিদ্ধিদাতা ঈশ্বরকে ভুলিয়া যদৃচ্ছাক্রমে সংসারে বিচরণ করেন, তিনি প্রকৃত-শিক্ষা-বিরহিত ও প্রকৃত-সাধনা-শূন্য। প্রশান্ত রজনীর সুনীল আকাশ প্রকৃতির কমনীয় কান্তি শতগুণে উজ্জ্বল করিতেছে। "দিব্য-লাবণ্য-শোভিত" পূর্ণ-চন্দ্র স্নিগ্ধ কিরণে চারিদিক্ হাস্যময় করিয়া তুলিতেছে, তরঙ্গিণী জ্যোৎস্না-বিধৌত হইয়া কলস্বরে সাগরের অভিমুখে ধাবিত হইতেছে, এই সকল সুন্দর দৃশ্য সকলেই দেখিয়া থাকে; কিন্তু প্রশান্ত আকাশ দেখিলে যাঁহার হৃদয় পবিত্র ভাবে পূর্ণ হয়, কমনীয় শশধরের হাস্য দেখিয়া যাঁহার হৃদয় হাসিতে থাকে, স্রোতস্বতীর বিমল বারি-রাশির সহিত যিনি স্বীয় অশ্রুপ্রবাহ মিশাইয়া তদ্গতচিত্তে সেই সর্ব্বশক্তিমান্, অনাদি, অনন্ত, পরম দেবতার জ্ঞান ও শক্তি

ধ্যান করেন, তিনিই প্রকৃত শিক্ষিত ও তিনিই প্রকৃত সাধু। তিনি মানব হইয়াও দেবভাবে পরিপূর্ণ থাকেন, এবং মর্ত্ত্যবাসী হইয়াও অমরবাসের সুখাস্বাদে পরিতৃপ্ত রহেন। তাঁহার সুমধুর দেব-প্রকৃতি সর্ব্বদা অতুলনীয় ও স্বর্গীয় সৌন্দর্য্যে চিরপরিপূর্ণ।

অহঙ্কার।

কোন মনুষ্যের যদি অহঙ্কার না থাকে, তবে সে নিতান্ত অপদার্থ জীব। ধর্ম্ম বল, বিদ্যা বল, বুদ্ধি বল, অহঙ্কার না থাকিলে কিছুই কিছু নহে এবং কিছুতেই কিছু হয় না। আপনার প্রতি আপনার বিশ্বাস না থাকিলে, আপনার প্রতি শ্রদ্ধা না থাকিলে, উৎসাহ থাকে না, প্রবৃত্তি থাকে না, সুতরাং ক্রমে কার্য্যকারিতা-শক্তিরও হ্রাস হয়। দম্ভের নাম অহঙ্কার নহে; দম্ভ সর্ব্বদাই ত্যজ্য, অহঙ্কার আরাধ্য বস্তু। ধার্ম্মিক বলিয়া যে আস্ফালন করিয়া বেড়ায়, সে প্রায়ই নির্ব্বোধ অথবা কুলোক; কিন্তু ধার্ম্মিক বলিয়া যাঁহার মনে মনে আপনার কাছে আপনার অহঙ্কার আছে, তিনি অনেক সময়ে সাধারণ মনুষ্য অপেক্ষা উন্নত নীতির লোক। আমাদের দেশের লোকের মনোমধ্যে যদি প্রকৃত অহঙ্কারের অধিকতর পরিব্যাপ্তি হয়, তাহা হইলে দেশমধ্যে এত কুনীতি, কুক্রিয়া কখনই থাকে না।

সামাজিক রীতি নীতির কোন কোন বিষয়ে, আমরা ইংরাজি সভ্যতার ঘাত বলে, ঠিক বিপরীত পথে যাইতেছি। কিছু দিন পূর্ব্বে এরূপ ছিল যে, প্রকৃত রাশি-ভারি লোক সমাজে মান্য গণ্য হইতেন; এখন অর্দ্ধশিক্ষিত-গণের সভ্যতার গুণে তাঁহাদিগকে অহঙ্কারী বলিয়া ঘৃণা প্রদর্শন করা প্রথা হইয়াছে; আর যে অপদার্থ পলিত-কেশ জীব তিন পুরুষের সহিত একত্র বসিয়া মদ খাইয়াছে, তাহার 'অমায়িকতার' প্রশংসাই বা কত! আপাততঃ দেখিলে, বোধ হয়, বুঝি এই ভূলোক, কালে "ইয়ার লোকে" পরিণত হইবে। কিন্তু সকলের মনে যদি যথোপযোগী অহঙ্কার থাকে, তাহা হইলে, কখন এরূপ হয় না। মনুষ্যজীবনের প্রথম শিক্ষা অহঙ্কার, আত্মগৌরব, আপনার উপর শ্রদ্ধা, আপনার উপর বিশ্বাস। কুসংসর্গে লোক মন্দ হইয়া যায়, অর্থাৎ

যাহার মনে নিয়মিত অহঙ্কার নাই, সেই উচ্ছিন্ন যায়। অনেককেই এইরূপ 'অমায়িক' তর্ক করিতে দেখা গিয়াছে, "আমরা অতি ক্ষুদ্রপ্রাণ, সামান্য মনুষ্য; কোন্ কীটাণুকীট, আমাদের আবার ধর্ম্মই বা কি, আর কর্ম্মই বা কি? আমদের আবার দৃষ্টান্তই বা কি, আর তাহার ফলাফলই বা কি?" কিন্তু বাস্তবিক আমরা তত ক্ষুদ্র জীব নহি। আমরা গৌতম, অরিষ্টটল, কোম্তের কুটুম্ব; এইরূপ অস্থি মজ্জা হইতেই বেদ, বাইবল্, রামায়ণ মহাভারত নিঃসৃত হইয়াছে, এইরূপ দ্বি-হস্তপদবিশিষ্ট জীবই দূরস্থিত গ্রহনক্ষত্রাদির সংক্রমণ, নিক্রমণাদি, হস্তামলকবৎ অভ্রান্তরূপে দর্শন করিতেছেন। আমাদের বুদ্ধি পরিমিত বটে, কিন্তু তদ্দ্বারা আমরা বিশ্বমণ্ডলের কার্য্যকলাপ পর্য্যবেক্ষণ করিতে পারি; হৃদয় ক্ষুদ্র বটে, কিন্তু সেই হৃদয়ে এই ব্রহ্মাণ্ডের কীটাণু পর্য্যন্ত কোটি কোটি জীবের প্রত্যেকটিকে ভালবাসিতে পারি, তবে কেন এ হেন মানবজন্মের গরিমা বিস্মৃত হইয়া, মস্তিষ্কের চালনা করিব না, বা হৃদয়ে তেজ ধারণ করিব না? ধর্ম্মের যে ভিত্তি, কর্ম্মের যে মূল, তাহার নাম অহঙ্কার; এ অহঙ্কার আরাধ্য বস্তু; দম্ভ এবং দাম্ভিক হইতে দূরে বিচরণ করিব বটে, কিন্তু অহঙ্কার নারীর সতীত্বের মত সযত্নে রক্ষা করিব।

শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র সরকার।

দ্রৌপদীযুধিষ্ঠির সংবাদ।

পাণ্ডবগণ সায়ংসময়ে কৃষ্ণার সহিত উপবিষ্ট হইয়া পরস্পর কথোপকথন করিতে লাগিলেন। অনন্তর মনোরমা বিদ্যাবতী পতিব্রতা পাঞ্চালী যুধিষ্ঠিরকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, অয়ি নাথ! দুরাত্মা দুর্য্যোধন কি নৃশংস! আমাদিগকে রাজ্যভ্রষ্ট, অজিনধারী ও বনচারী করিয়াও কিছুমাত্র দুঃখিত বা অনুতাপিত হয় নাই। তুমি ধর্ম্মপরায়ণ জ্যেষ্ঠভ্রাতা; তথাপি সে দুর্ম্মতি যখন তোমার প্রতি অতি কঠোর বাক্য প্রয়োগ করিল, তখন তাহার হৃদয় লৌহনির্ম্মিত, সন্দেহ নাই। হা নাথ! তুমি কখন দুঃখের মুখাবলোকন কর নাই, কিন্তু এক্ষণে সেই পাপাত্মা দুর্য্যোধন সুহৃদ্গণের সহিত একত্র আসীন

হইয়া তোমাকে দুর্ভেদ্য দুঃখশৃঙ্খলে বদ্ধ করতঃ সাতিশয় আনন্দিত হইয়াছে। তুমি যখন বনগমনের নিমিত্ত মৃগচর্ম্ম পরিধান করিয়া নির্গত হইলে, তখন কেবল দুর্য্যোধন, কর্ণ, শকুনি ও দুঃশাসন, এই চারিজন কঠোরহৃদয় পাপাত্মার অশ্রুপাত হয় নাই; কিন্তু আর সমুদায় কৌরবেরই নয়ন হইতে অবিরল ধারে শোকসলিল বিগলিত হইয়াছিল। হে মহাভাগ! তোমার এই নূতন শয্যা ও কুশময় আসন অবলোকন করিয়া সেই পুরাতম শয্যা ও নানাবিধ রত্নমণ্ডিত সিংহাসন আমার স্মৃতিপথে আরূঢ় হইতেছে। আমি আর শোকাবেগ সম্বরণ করিতে পারি না। হা নাথ! পূর্ব্বে তোমাকে সভামধ্যে রাজমণ্ডলীতে পরিবৃত দেখিয়াছিলাম, এক্ষণে আমি তোমার ঈদৃশ অবস্থা অবলোকন করিয়া কিরূপে শান্তিলাভ করিতে পারি? পূর্ব্বে তোমাকে চন্দনচর্চ্চিত সূর্য্যের ন্যায় তেজস্বী ও শুভ্র কৌশেয় বসনে সুসজ্জিত দেখিয়াছিলাম, এক্ষণে ধূলিধূসর-কলেবর ও চীরধারী দেখিতে হইল! হে রাজেন্দ্র! পূর্ব্বে তোমর গৃহে সহস্র সহস্র ব্রাহ্মণ, যতি, ব্রহ্মচারী ও গৃহস্থেরা সুবর্ণপাত্রে অভিলাষানুরূপ সুস্বাদু, দোষহীন অন্ন ব্যঞ্জনাদি ভোজন করিতেন এবং যথাযোগ্য সহস্র প্রকার সৎকার প্রাপ্ত হইতেন, এক্ষণে সে সকল লুপ্তপ্রায় হইয়াছে দেখিয়া, কি আমার অন্তঃকরণে শান্তির উদয় হইতে পারে? কুণ্ডলধারী যুবা সূপকার সকল তোমার যে ভ্রাতৃগণকে সমীচীনরূপে প্রস্তুত নানাবিধ অন্ন ভোজন করাইত, সেই দুঃখানভিজ্ঞ চিরসুখী ভ্রাতৃগণ এক্ষণে বন্য ফলমূলাদি দ্বারা জীবন ধারণ করিতেছেন, ইহা দেখিয়া আমার শোকসাগর একবারে উচ্ছলিত হইয়া উঠিল। যে ভীমসেন বিবিধ যান ও উচ্চাবচ বসন দ্বারা সৎকার প্রাপ্ত হইতেন, ও যিনি সমরে সমস্ত কুরুকুলকে উন্মূলিত করিতে পারেন, তিনি এক্ষণে বনবাসী হইয়া স্বয়ং দাসোচিত কর্ম্ম সকল নির্ব্বাহ করিতেছেন, ইহা দর্শন করিয়াও কেন তোমার রোষানল প্রজ্বলিত হইতেছে না? তিনি কেবল তোমার প্রতিজ্ঞাপাশে বদ্ধ হইয়া ঈদৃশ অসহ্য যন্ত্রণা সহ্য করিতেছেন। যে অর্জ্জুন দ্বিবাহু হইয়াও বহুবাহু অর্জ্জুনের সমকক্ষ, যিনি শরসন্ধানে লঘুহস্ততা প্রযুক্ত সমরে কালান্তক যমোপম, যাঁহার শস্ত্রপ্রতাপে সমস্ত পার্থিব অবনত হইয়া তোমার যজ্ঞে ব্রাহ্মণগণের উপাসনা করিয়াছিল, যিনি এক রথে দেবতা, মনুষ্য ও সর্পগণকে পরাজয় করিয়া দেবদানব

কর্তৃক পুজিত হইয়াছেন, যিনি অদ্ভুতাকার রথ, তুরঙ্গ ও মাতঙ্গে পরিবৃত হইয়া সমরে বিচরণ করিতেন, যিনি ভূপতিগণের নিকট হইতে বলপূর্ব্বক ধন গ্রহণ করিয়াছিলেন, যিনি এককালে পঞ্চ শত শর নিক্ষেপ করিতে পারেন, হা নাথ! তিনি তপস্বিবেশে বনবাসী হইয়াছেন দেখিয়াও কেন তোমার ক্রোধপাবক প্রদীপ্ত হইতেছে না? শ্যামকলেবর তরুণবয়স্ক নকুল ও প্রিয়দর্শন শৌর্য্যশালী সহদেব, এই সুকুমার মাদ্রীকুমারদ্বয় চিরসুখী হইয়াও বনবাসক্লেশে অতিমাত্র ক্লিষ্ট হইতেছেন, ইহা দেখিয়া কি নিমিত্ত ক্ষমাবলম্বন করিয়া রহিয়াছ, বলিতে পারি না। আমি দ্রুপদরাজদুহিতা, মহাত্মা পাণ্ডুর পুত্রবধূ, ধৃষ্টদ্যুম্নের ভগিনী, ও ব্রতশালিনী হইয়া বনচারিণী হইলাম; ইহা অপেক্ষা অধিক দুঃখের বিষয় আর কি হইতে পারে? হে পাণ্ডবনাথ! যখন আমাকে ও ভ্রাতৃগণকে এরূপ দুরবস্থাগ্রস্ত দেখিয়াও তোমার মন ব্যথিত হই-তেছে না, তখন বুঝিলাম, তুমি নিতান্ত ক্রোধশূন্য, তাহার সন্দেহ নাই। লোকে প্রসিদ্ধই আছে, ক্রোধশূন্য ক্ষত্রিয় নাই, কিন্তু তোমাতে তাহার বৈপ-রীত্য দেখিতেছি। যে ক্ষত্রিয় সমুচিত সময়ে তেজ প্রদর্শন না করে, সে সমুদয় লোকের নিকট পরাভব প্রাপ্ত হয়; অতএব শত্রুগণের প্রতি ক্ষমা করা কোন ক্রমেই কর্ত্তব্য নহে, এক্ষণে তেজ প্রকাশ করিয়া তাহাদিগকে সমূলে নির্ম্মূল করাই উচিত কর্ম্ম, তাহার সন্দেহ নাই। কিন্তু সময়বিশেষে ক্ষমাও অবলম্বন করিতে হইবে, কেননা, যে ক্ষত্রিয় ক্ষমাকালে ক্ষমাবলম্বন না করেন, তিনি সর্ব্বভূতের অপ্রিয় হইয়া ইহকালে বা পরকালে বিনাশপ্রাপ্ত হন।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, ক্রোধ মনুষ্যকে সংহার করে ও ক্রোধই মঙ্গলের কারণ হয়, সুতরাং সমস্ত শুভাশুভ ঘটনা ক্রোধ হইতেই সমুদ্ভূত হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি ক্রোধ সম্বরণ করিতে সমর্থ হয়, তাহারই মঙ্গল; কিন্তু যাহার ক্রোধাবেগ ধারণ করিবার সামর্থ্য নাই, নিদারুণ ক্রোধ তাহারই অমঙ্গলের কারণ হয়। ক্রোধই প্রজাদিগকে সমূলে নির্ম্মূল করে; অতএব হে শোভনে! মাদৃশ ব্যক্তি কিরূপে লোকবিনাশন ক্রোধ-হুতাশন অবলম্বন করিয়া কালাতিপাত করিবে? মানবগণ ক্রোধাবিষ্ট হইলে অশেষবিধ পাপানুষ্ঠান ও গুরুজনদিগেরও প্রাণ বিনাশ করিতে পারে, অতি কঠোর বাক্য প্রয়োগ-পূর্ব্বক শ্রেষ্ঠ লোকেরও অবমাননা করিয়া থাকে। রোষপরবশ

ব্যক্তির কদাচ বাচ্যাবাচ্য জ্ঞান ও অকার্য্যের বিচারণা থাকে না। সে ক্রোধপূর্ব্বক অবধ্যের বধ ও বধ্যের সৎকার করিয়া থাকে। অধিক কি, ক্রোধানল উত্তেজিত হইলে ক্রুদ্ধ ব্যক্তি অনায়াসে আপনাকেও শমনসদনে প্রেরণ করে। এই সমস্ত দোষ প্রদর্শনপূর্ব্বক অশেষ-জ্ঞানশালী পণ্ডিতেরা ক্রোধকে পরাজয় করিয়া ইহলোকে ও পরলোকে অশেষ সুখ সম্ভোগ করিতেছেন; অতএব এই সকল দোষ দেখিয়া আমি কিরূপে সাধুজন-বিগর্হিত ক্রোধ অবলম্বন করি। হে দ্রৌপদি! এই সমস্ত বিষয় পূর্ব্বাপর পর্য্যালোচনা করিয়া আমি ক্রোধানল শীতল করিয়াছি। যে ব্যক্তি ক্রোধীর প্রতি ক্রোধ প্রকাশ না করে, সে আত্ম পর, উভয়কেই মহৎ ভয় হইতে পরিত্রাণ করে; সুতরাং সে ব্যক্তি আত্ম পর, উভয়েরই উপকারক হইয়া উঠে। যদি রোষপরবশ দুর্ব্বল মূঢ় ব্যক্তি বলবান্ লোকের নিকট পরাভূত হইয়া ক্লেশ ভোগ করে, তাহা হইলে সে স্বতঃই আত্মহত্যা করিয়া থাকে। সেই অসংযত-চিত্ত আত্মঘাতীর পরলোক নষ্ট হয়; অতএব হে দ্রৌপদি! দুর্ব্বলের ক্রোধ সংবরণ করাই বিধেয়। বলশালী বিদ্বান্ ব্যক্তি অশেষ ক্লেশ ভোগ করিয়াও যদি ক্রোধপরবশ ও ক্লেশদাতাকে বিনাশ করিতে উদ্যত না হন, তাহা হইলে তিনি পরলোকে আনন্দ-সন্দোহ লাভ করিয়া সুখে কালাযপন করেন। অতএব আপৎকাল উপস্থিত হইলে বলবান্ ও দুর্ব্বল, উভয়েই পীড়য়িতাকে ক্ষমা করিবে। সাধু লোকেরা জিতক্রোধ ব্যক্তিকে সাতিশয় প্রশংসা করিয়া থাকেন। ক্ষমাপর সজ্জন ব্যক্তির নিশ্চয়ই জয় লাভ হইয়া থাকে। মিথ্যা অপেক্ষা সত্যই শত গুণে শ্রেষ্ঠ ও নৃশংসাচার অপেক্ষা অনৃশংসতাই নিতান্ত শ্রেয়ঃ। হে দ্রৌপদি! মাদৃশ ব্যক্তিরা দুর্য্যোধন হইতে নিধন প্রাপ্ত হইলেও বহু-দোষাকর সাধুবিগর্হিত ক্রোধকে কিরূপে প্রকাশ করিবে? যিনি বুদ্ধিবলে প্রবল ক্রোধ বশীভূত করিতে সমর্থ হন, যাহার হৃদয়াভ্যন্তরে কিঞ্চিন্মাত্র ক্রোধের সঞ্চার থাকে না, তত্ত্বদর্শী পণ্ডিতেরা তাঁহাকেই তেজস্বী বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। হে সুন্দরি! ক্রুদ্ধ ব্যক্তি প্রণালীক্রমে কদাচ কার্য্য পর্য্যালোচনা করিতে পারে না, মর্য্যাদারও অপেক্ষা রাখে না এবং অবধ্যের বধ ও গুরুজনের পীড়া প্রদানে রত থাকে; অতএব তেজস্বী পুরুষ অবশ্যই

ক্রোধ পরিত্যাগ করিবে। দেখ, ক্রোধাভিভূত ব্যক্তি দক্ষতা, অমর্ষ, শৌর্য্য ও আশুকারিতা, এই কয়েকটি তেজোগুণ কোন ক্রমেই লাভ করিতে পারে না। ক্রোধ পরিত্যাগ করিলে লোকে তেজ প্রাপ্ত হইয়া থাকে, কিন্তু রোষপরায়ণ ব্যক্তির পক্ষে যথাকালোপপন্ন সেই তেজ একান্ত দুঃসহ হইয়া উঠে। মূর্খেরাই ক্রোধকে তেজ বলিয়া নির্ণয় করিয়া থাকে। বিধাতা লোকসংহারার্থ মানবগণের মনোমধ্যে রজোগুণ-পরিণাম ক্রোধ বিধান করিয়া দিয়াছেন। অতএব সুশীল ব্যক্তি এককালে ক্রোধ পরিত্যাগ করিবে। যদি স্বধর্ম্ম পরিত্যাগ হয়, তাহাও করিবে, তথাপি কোনক্রমে ক্রোধাবিষ্ট হইবে না। হে পাঞ্চালি! হীনমতি মূঢ় ব্যক্তিই ক্ষমার্জ্জবাদি গুণ সকল লঙ্ঘন করিয়া থাকে; কিন্তু মাদৃশ ধীমান্ লোকের ঐরূপ গুণগ্রাম অতিক্রম করা কোনক্রমেই উচিত নহে। যদি মনুষ্যমধ্যে কোন ব্যক্তি সর্ব্বংসহা পৃথিবীর ন্যায় ক্ষমাশীল না হইত, তাহা হইলে সন্ধি স্থাপনের কথা দূরে থাকুক, কেবল ক্রোধমূলক যুদ্ধই উপস্থিত হইত। তাপিত হইলেই তাপ প্রদান করিবে, ও গুরু কর্ত্তৃক হত হইলেই তাঁহাকে আঘাত করিবে, কেহ আক্রোশ করিলে তাহার উপর আক্রোশ প্রকাশ করিবে, হিংসা করিলেই হিংসা করিবে, এইরূপ রীতিপদ্ধতির অনুসরণ করিলে সমুদয় জগৎ বিনষ্ট ও অধর্ম্ম পরিবর্দ্ধিত হইত,। হে পাঞ্চালি! এইরূপে লোকসকল কোপাবিষ্ট হইলে পিতা পুত্রদিগকে ও পুত্রেরা] পিতাকে, ভর্ত্তা ভার্য্যাকে ও ভার্য্যা ভর্ত্তাকে বিনষ্ট করিত, তাহা হইলে একবারে সৃষ্টির লোপ হইয়া যাইত। সর্ব্বপ্রকার আপদেই ক্ষমা করা বিধেয়; কারণ, ক্ষমাশীল ব্যক্তিই ভূতসৃষ্টির প্রধান কারণ। যে ব্যক্তি আক্রুষ্ট, তাড়িত ও ক্রুদ্ধ হইয়াও বলিষ্ঠের প্রতি ক্ষমা প্রদর্শন করিয়া থাকে এবং যে ব্যক্তি প্রভাবসম্পন্ন হইয়াও ক্রোধকে জয় করত ক্ষমাশালী হয়, সেই ব্যক্তিই বিদ্বান্ ও শ্রেষ্ঠ; তাহারই সনাতন লোক লাভ হইয়া থাকে। কিন্তু অল্প-বিজ্ঞানসম্পন্ন রোষপর ব্যক্তির ইহকাল ও পরকাল, উভয়ই বিনষ্ট হয়। মহাত্মা কাশ্যপ ক্ষমাশীল ব্যক্তির এক গাথা উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা শ্রবণ কর। ক্ষমা ধর্ম্ম, ক্ষমা যজ্ঞ, ক্ষমা বেদ ও ক্ষমাই শাস্ত্র, যিনি ইহা সম্যক্ অবগত আছেন, তিনি সকলকে ক্ষমা করিতে পারেন। ক্ষমা ব্রহ্ম ও সত্য, ক্ষমা ভূত ও ভবিষ্যৎ, ক্ষমা তপঃ ও শৌচ

এবং ক্ষমাই এই পৃথিবীকে ধারণ করিয়া রহিয়াছে। ক্ষমাশীল ব্যক্তি যজ্ঞবেত্তা, বেদবেত্তা ও তপস্বীদিগের লোক অপেক্ষা উপরিতন লোক প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। যজুর্ব্বেদবিহিত কর্ম্মকারী ও অন্যান্য কর্ম্মশীল ব্যক্তিদিগের লোক সমস্ত ভিন্ন ভিন্ন করিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, কিন্তু ক্ষমাপর ব্যক্তিদিগের লোক ব্রহ্মলোকেই প্রতিষ্ঠিত ও পূজিত হইয়া রহিয়াছে। ক্ষমা তেজস্বীদিগের তেজঃস্বরূপ ও তপস্বীগণের ব্রহ্মস্বরূপ। সত্যপরায়ণ ব্যক্তিদিগের ক্ষমাই সত্য, ক্ষমাই যজ্ঞ ও ক্ষমাই শান্তি। অতএব মদ্বিধ লোক এক্ষণে কিরূপে ক্ষমা পরিত্যাগ করিতে পারে? হে কৃষ্ণে! ক্ষমাতেই সত্য, ব্রহ্ম, যজ্ঞ ও লোক সমুদয় প্রতিষ্ঠিত আছে। জ্ঞানসম্পন্ন সৎপুরুষেরা সতত ক্ষমা প্রদর্শন করেন বলিয়া তাঁহাদের শাশ্বত ব্রহ্মলোক-প্রাপ্তি হয়। ক্ষমাপর ব্যক্তিদিগের উভয় লোকই হস্তগত; তাঁহারা ইহকালে সম্মান ও পরকালে শ্রেয়সী গতি প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। যাঁহাদিগের ক্রোধ ক্ষমাপ্রভাবে পরাহত হয়, তাঁহাদিগের পরম পবিত্র লোক লাভ হইয়া থাকে, সুতরাং ক্ষমাই শ্রেষ্ঠ পদার্থ। হে দ্রৌপদি! মহর্ষি কাশ্যপ ক্ষমাশীল ব্যক্তিদিগের উদ্দেশে সতত এই গাথা গান করিয়া থাকেন। এক্ষণে তুমি ক্ষমাবিষয়ক গাথা শ্রবণ করিয়া ক্রোধ সম্বরণপূর্ব্বক সন্তোষ অবলম্বন কর। পিতামহ ভীষ্ম ও দেবকীনন্দন কৃষ্ণ, ইঁহারা শান্তিকে পূজ্য বলিয়া স্বীকার করিবেন। আচার্য্য কৃপ, বিদুর, সঞ্জয়, সোমদত্ত, যুযুৎসু, দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামা, আমাদিগের পিতমহ ব্যাস, ইঁহারাও প্রতিনিয়ত শান্তির কথা উত্থাপন করিয়া প্রশংসা করেন। এক্ষণে আমার বোধ হইতেছে, এই সকল ব্যক্তি দ্বারা মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র বা তাঁহার পুত্র শান্তিপথে প্রেরিত হইলে আমাদিগকে রাজ্য প্রদান করিতে পারেন, কিন্তু লোভপরতন্ত্র হইলে অবশ্যই বিনাশ ঘটিবে, সন্দেহ নাই। হে দ্রৌপদি! ভরতবংশীয়দিগের বিনাশের নিমিত্ত এই নিদারুণ কাল উপস্থিত হইয়াছে। বলিতে কি, আমি পূর্ব্বেই ইহা অবধারিত করিয়া রাখিয়াছি, সুযোধন রাজকার্য্যে নিতান্ত অযোগ্য, এই নিমিত্ত সে কদাচ ক্ষমাবলম্বন করিবে না, কিন্তু আমি তাহাদিগের মধ্যে যোগ্যপাত্র, এইজন্য ক্ষমা আমাকেই আশ্রয় করিয়াছে। ক্ষমা ও অনৃশংসতা, মহাত্মাদিগের চরিত্রস্বরূপ ও সনাতন ধর্ম্ম; অতএব আমি এক্ষণে প্রকৃতরূপে ক্ষমা অবলম্বন করিব, তাহার সন্দেহ নাই।

দ্রৌপদী কহিলেন, হে নাথ! যাঁহারা মোহ উৎপাদন করিয়া বলপূর্ব্বক রাজ্যাক্রমণরূপ পিতৃ-পরম্পরাগত কর্ত্তব্য কর্ম্মে তোমার বুদ্ধিভ্রম জন্মাইতেছেন, সেই ধাতা ও বিধাতা, উভয়কেই আমার নমস্কার। কর্ম্মই উত্তম মধ্যম প্রভৃতি পৃথক্ পৃথক্ লোকপ্রাপ্তির সাধন ও কর্ম্মের ফল অপরিহার্য্য। লোক মোহবশতঃ মোক্ষলাভের অভিলাষ করিয়া থাকে। কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া ধর্ম্ম, দয়া, ক্ষমা সরলতা ও লোকাপবাদ-ভীরুতা অবলম্বন পূর্ব্বক কেহ কখন ইহলোকে উন্নতি লাভ করিতে পারে না। হে মহারাজ! তুমি ও তোমার ভ্রাতৃগণ নিতান্ত সুখোচিত হইয়াও ঈদৃশ দুঃসহ দুরবস্থায় নিপতিত হইয়াছ, ইহাই তাহার প্রমাণ। কি রাজ্য-শাসনকালে, কি বিবাসনসময়ে, কখনই তোমরা ধর্ম্ম অপেক্ষা আর কিছুই প্রিয়তর বলিয়া জানিতে না, বরং জীবন অপেক্ষাও ধর্ম্মকে সমধিক প্রিয়তর বোধ করিয়া থাক। তোমার রাজ্য ও জীবন কেবল ধর্ম্মের নিমিত্ত; ইহা ব্রাহ্মণ, গুরু ও দেবতারা জানেন। আমি বিলক্ষণ জানি; তুমি, ভীম, অর্জ্জুন, নকুল, সহদেব ও আমাকে পরিত্যাগ করিবে, তথাপি ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিবে না। আমি আর্য্যগণের সমীপে শ্রবণ করিয়াছি, যে রাজা ধর্ম্ম রক্ষা করেন, ধর্ম্ম তাঁহাকে রক্ষা করিয়া থাকেন, কিন্তু দেখিতেছি, ধর্ম্ম আপনাকে রক্ষা করিতেছেন না। যেমন স্বকীয় ছায়া মানবের অনুগামিনী হয়, তদ্রূপ তোমার অসাধারণ বুদ্ধি নিয়ত ধর্ম্মেরই অনুবর্ত্তিনী হইতেছে। হে নাথ! তুমি সসাগরা ধরার একাধিপত্য লাভ করিয়াও কি সমকক্ষ, কি কনিষ্ঠ, কি শ্রেষ্ঠ, কাহারও অবমাননা কর নাই ও কখন তোমার অভিমান বা দর্পও দৃষ্ট হয় নাই। হে রাজন্! তুমি ঋজুতা, মৃদুতা, বদান্যতা, লজ্জাশীলতা ও সত্যবাদিতার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছ, তথাপি দ্যূতব্যসনজনিত বিপরীত বুদ্ধি কি প্রকারে উপস্থিত হইল, আমি কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। এক্ষণে তোমার ঈদৃশ দুঃখ ও অপ্রতীকার্য্য আপদ অবলোকন করিয়া নিতান্ত মোহপাশে বদ্ধ হইতেছি, আর শোকাবেগ সম্বরণ করিতে পারি না। হে রাজন্! ধাতা ভূতগণের প্রতি পিতামাতার ন্যায় স্নেহপর নহেন, তিনি রোষাবিষ্ট হইয়া ইতর জনের ন্যায় ব্যবহার করিয়া থাকেন। সুশীল, লজ্জাশালী আর্য্যগণ কষ্টসৃষ্টে জীবন যাপন করেন, আর পাপাত্মারা বিষয়বাসনায় বিহ্বল

হইয়া সুখস্বচ্ছন্দে বাস করিতেছে; ইহাই কি পরমেশ্বরের অপক্ষপাতিতা! হে মহারাজ! আপনার বিপদ এবং দুর্য্যোধনের সম্পদ অবলোকন করিয়া সেই বিষমদর্শী বিধাতাকে তিরস্কার করি। তিনি, আর্য্যশাস্ত্রলঙ্ঘী, ক্রূর, লোভপরবশ, অধার্ম্মিক দুর্য্যোধনকে রাজ্যধন প্রদান করিয়া কি ফল ভোগ করিতেছেন? যদি অনুষ্ঠিত কর্ম্মের ফল কেবল কর্ত্তাকেই ভোগ করিতে হয়, তাহা হইলে নিয়োগকর্ত্তা ঈশ্বরও তজ্জন্য পাপে লিপ্ত হন, সন্দেহ নাই। যদ্যপি ঈশ্বর প্রয়োজনকর্ত্তা হইয়াও কর্ম্মজনিত পাপ ভোগ না করেন, বলই তাহার কারণ বলিতে হইবে; অতএব হে মহারাজ! দুর্ব্বল জনেরাই একান্ত অধীন ও নিতান্ত শোচনীয়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে যাজ্ঞসেনি! তুমি যাহা কহিলে, তাহা সুকুমার ও সুবিন্যস্ত বটে, কিন্তু নাস্তিক মতানুমত। আমি ফলাকাঙ্ক্ষী হইয়া কর্ম্মানুষ্ঠান করি না; কিন্তু দাতব্য বলিয়া দান করি, যষ্টব্য বলিয়া যজ্ঞ করিয়া থাকি। ফল থাকুক্, আর নাই থাকুক্, গৃহস্থাশ্রমে থাকিয়া যে সকল কর্ম্ম করা কর্ত্তব্য, আমি তাহা যথাশক্তি অনুষ্ঠান করি। আমি সাধুজনাচরিত ব্যবহার দৃষ্টে ও শাস্ত্রানুসারে ধর্ম্মাচরণ করি; কোন প্রকার ফল প্রত্যাশা করি না; আমার মন স্বভাবতই কেবল ধর্ম্মানুরাগী। হে কৃষ্ণে! যে ব্যক্তি স্বর্গাদিফললাভ-লোভে ধর্ম্মাচরণ করে, সে ব্যক্তি ধর্ম্মবণিক্, সুতরাং সে ধার্ম্মিক-সমাজে জঘন্যরূপে পরিগণিত; সে কদাচ প্রকৃত ধর্ম্মফল ভোগ করিতে সমর্থ হয় না। যে পাপমতি নাস্তিকতাপ্রযুক্ত ধর্ম্মের প্রতি সন্দিহান হয়, তাহারও ধর্ম্মজনিত ফল লাভের প্রত্যাশা থাকে না। আমি বেদনির্দ্দিষ্ট প্রমাণানুসারে কহিতেছি, কদাচ ধর্ম্মের প্রতি সন্দেহ করিবে না, যেহেতু ধর্ম্মাভিশঙ্কী ব্যক্তি তির্য্যগ্‌গতি প্রাপ্ত হয় এবং যে বিবেকহীনমতি ধর্ম্মে অবিশ্বাস বা আর্য্যমতে অশ্রদ্ধা প্রদর্শন করে, সে ব্যক্তি অজর ও অমরলোক হইতে অপসারিত হয়। হে পাঞ্চালি! যে ব্যক্তি ভদ্রকুলে জন্ম গ্রহণ করিয়া ধর্ম্মপরায়ণ ও বেদাধ্যায়ী হয়, ধর্ম্মচারীরা সেই রাজর্ষিকে স্থবিরমধ্যে পরিগণিত করেন।

৺ কালীপ্রসন্ন সিংহ।

বাঙ্গালার কলঙ্ক।

যাহা ভারতের কলঙ্ক, বাঙ্গালারও সেই কলঙ্ক। এ কলঙ্ক আরও গাঢ়। এখানে আরও দুর্ভেদ্য অন্ধকার। কদাচিৎ অন্যান্য ভারতবাসীর বাহুবলের প্রশংসা শুনা যায়, কিন্তু বাঙ্গালীর বাহুবলের প্রশংসা কেহ কখন শুনে নাই। সকলেরই বিশ্বাস, বাঙ্গালী চিরকাল দুর্ব্বল, চিরকাল ভীরু, চিরকাল স্ত্রীস্বভাব, চিরকাল ঘুসি দেখিলেই পলাইয়া যায়। মেকলে বাঙ্গালীর চরিত্রসম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন, এরূপ জাতীয় নিন্দা কখন কোন লেখক কোন জাতি সম্বন্ধে কলমবন্দ করেন নাই। ভিন্নদেশীয় মাত্রেরই বিশ্বাস যে, সে সকল কথা অক্ষরে অক্ষরে সত্য। ভিন্নজাতীয়ের কথা দূরে থাকুক, অধিকাংশ বাঙ্গালীরও এইরূপ বিশ্বাস। ঊনবিংশ শতাব্দীর বাঙ্গালীর চরিত্র সমালোচনা করিলে, কথাটা কতকটা যদি সত্য বোধ হয়, তবে বলা যাইতে পারে, বাঙ্গালীর এখন এ দুর্দ্দশা হইবার অনেক কারণ আছে। মানুষকে মারিয়া ফেলিয়া তাহাকে মরা বলিলে মিথ্যা কথা বলা হয় না। কিন্তু যে বলে যে, বাঙ্গালীর চিরকাল এই চরিত্র, চিরকাল দুর্ব্বল, চিরকাল ভীরু, স্ত্রীস্বভাব, তাহার মাথায় বজ্রাঘাত হউক, তাহার কথা মিথ্যা।

এ নিন্দার কোন মূল, ইতিহাসে কোথাও পাই না। সত্য বটে, বাঙ্গালী মুসলমানকর্ত্তৃক পরাজিত হইয়াছিল, কিন্তু পৃথিবীতে কোন্ জাতি পরজাতি কর্ত্তৃক পরাজিত হয় নাই? ইংরেজ নর্ম্মানের অধীন হইয়াছিল, জর্ম্মনেরা প্রথম নেপোলিয়নের অধীন হইয়াছিল। ইতিহাসে দেখি, ষোড়শ শতাব্দীর স্পেনীয়দিগের মত তেজস্বী জাতি, রোমকদিগের পর আর কেহ জন্মগ্রহণ করে নাই। যখন সেই স্পেনীয়েরা আট শত বৎসর মুসলমানের অধীন ছিল, তখন বাঙ্গালী পাঁচ শত বৎসর মুসলমানের অধীন ছিল বলিয়া, সে জাতিকে চিরকাল অসার বলা যাইতে পারে না। ইংরেজ ইতিহাস-লেখক উপহাস করিয়া বলেন, সপ্তদশ মুসলমান অশ্বারোহী আসিয়া বাঙ্গালা জয় করিয়াছিল।* সে কথার কোন মূল নাই; সে কথা বালক-মনোরঞ্জনের যোগ্য উপন্যাস মাত্র। সুতরাং আমরা আর সে কথার কিছু প্রতিবাদ করিলাম না।

* বঙ্গদর্শনে পূর্ব্বে দেখান হইয়াছে।

বাঙ্গালীর চিরদুর্ব্বলতা এবং চিরভীরুতার আমরা কোন ঐতিহাসিক প্রমাণ পাই নাই। কিন্তু বাঙ্গালী যে পূর্ব্বকালে বাহুবলশালী, তেজস্বী, বিজয়ী ছিল, তাহার অনেক প্রমাণ পাই। অধিক নয়, আমরা এক শত বৎসর পূর্ব্বের বাঙ্গালী পহলয়ানের, বাঙ্গালী লাঠী শড়কীওয়ালার যে সকল বলবীর্য্যের কথা বিশ্বস্তসূত্রে শুনিয়াছি, তাহা শুনিয়া মনে সন্দেহ হয় যে, সে কি এই বাঙ্গালী জাতি? কিন্তু সে সকল অনৈতিহাসিক কথা, তাহা আমরা ছাড়িয়া দিই। আমরা দুই একটা ঐতিহাসিক প্রমাণ দিতেছি।

পণ্ডিতবর ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র পালবংশীয় এবং সেনবংশীয় রাজাদিগের সম্বন্ধে যে সকল ঐতিহাসিক তত্ত্ব আবিষ্কৃত করিয়াছেন, আমাদের মতে তাহা অখণ্ডনীয়। কোন ইউরোপীয় বা এতদ্দেশীয় পণ্ডিত এ বিষয়ে এতটা মনোযোগী হন নাই। কেহই তাঁহার মতের সৎপ্রতিবাদ করিতে পারেন নাই। আমরা জানি যে, তাঁহার মত সকলের গ্রাহ্য হয় নাই; কিন্তু যাঁহারা তাঁহার প্রতিবাদী, তাঁহারা এমন কোন কারণই নির্দ্দিষ্ট করিতে পারেন নাই, যাহাতে সত্যানুসন্ধিৎসু ব্যক্তি ডাক্তার রজেন্দ্রলাল মিত্রের মত অগ্রাহ্য করিতে সম্মত হইতে পারেন। গথ কর্ত্তৃক রোম ধ্বংস হইয়াছিল, বজাজেত ও দ্বিতীয় মহম্মদ গ্রীক সাম্রাজ্য বিজিত করিয়াছিল, এ সকল কথা যেমন নিশ্চিত ঐতিহাসিক, বাবু রাজেন্দ্রলাল মিত্র কর্ত্তৃক আবিষ্কৃত সেন-পালসংবাদ আমরা তেমনি নিশ্চিত ঐতিহাসিক মনে করি সে কথাগুলি এই :—

ঐতিহাসিকদিগের বিশ্বাস যে, আগে পালবংশীয়েরা বাঙ্গালার রাজা ছিলেন। তার পর সেনবংশীয়েরা বাঙ্গালার রাজা হন। ঠিক তাহা নহে। এককালে এক সময়েই পাল এবং সেনবংশায়েরা রাজত্ব করিতেন, কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে। তার পর সেনবংশীয়েরা পালবংশীয়দিগের রাজ্যে আসিয়া তাঁহাদিগকে রাজ্যচ্যুত করিলেন, উভয় রাজ্যের একেশ্বর হইলেন। সেনবংশীয়েরা পূর্ব্ববাঙ্গালায় সুবর্ণগ্রামে রাজা ছিলেন। আর পালবংশীয়েরা মুদ্গাগিরিতে অর্থাৎ আধুনিক মুঙ্গেরে রাজা ছিলেন। এখনকার বাঙ্গালীরা গবর্ণমেণ্টের সিপাহি পল্টনে প্রবেশ করিতে পায় না, কিন্তু বেহারীদিগের পক্ষে অবারিত দ্বার, এবং বেহারীরা এখানকার উৎকৃষ্ট

সিপাহি মধ্যে গণ্য। অথচ আমরা রাজেন্দ্র বাবুর আবিষ্কৃত ঐতিহাসিক তত্ত্বে দেখিতে পাইতেছি, পূর্ব্বাঞ্চলবাসী বাঙ্গালীরা আসিয়া বেহার জয় করিয়াছিল। সেনবংশীয়েরা বাঙ্গালী রাজা হইয়াও বেহারের অধিকাংশের রাজা ছিলেন, ইহা ঐতিহাসিক কথা। সেনগণের অধিকার যে, বারাণসী পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল, ইহারও ঐতিহাসিক প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। যে গুপ্তবংশীয়দিগের মগধরাজ্য, ভারতীয় সকল সাম্রাজ্য অপেক্ষা প্রতাপান্বিত ছিল, সেই মগধরাজ্য বাঙ্গালীকর্ত্তৃকই বিজিত এবং অধিকৃত হইয়াছিল, বোধ হয়। কিন্তু সে আন্দাজি কথা না হয় ছাড়িয়া দিই।

মগধের অধীশ্বর চন্দ্রগুপ্তের রাজসভায় বিখ্যাত গ্রীক ইতিহাসবেত্তা মেগাস্থিনিস, গ্যাঙ্গ্যারিডি নামে এক জনপদ বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। ঐ জনপদের স্থাননির্ণয় তিনি এইরূপ লিখিয়াছেন যে, যেখানে গঙ্গা উত্তর হইতে দক্ষিণবাহিনী, সেই থানে গঙ্গা ঐ জনপদের পূর্ব্ব সীমা। তাহা হইলেই এক্ষণে যে প্রদেশকে রাঢ়দেশ বলা যায়, বাঙ্গালার সেই দেশ ইহা দ্বারা বুঝাইতেছে। বাস্তবিক অনুধাবন করিয়া দেখিলে বুঝা যাইবে যে, মেগাস্থিনিসের ঐ গ্যাঙ্গ্যারিডি শব্দ গঙ্গারাঢ়ী শব্দের অপভ্রংশ মাত্র। গঙ্গার উপকূলবর্ত্তী রাষ্ট্রকে লোকের গঙ্গারাষ্ট্র বলাই সম্ভব। সুরাষ্ট্র (সুরাট), মধ্যরাষ্ট্র (মেবাড়), গুর্জ্জররাষ্ট্র (গুজরাট) প্রভৃতি দেশের ন্যায় যেরূপ রাষ্ট্র শব্দ সংযোগে নিষ্পন্ন হইয়াছে, ইহাও সেইরূপ দেখা যাইতেছে। গঙ্গারাষ্ট্র শব্দের অপভ্রংশে ক্রমে গঙ্গারাট্ বা গঙ্গারাঢ় হইবে। ক্রমে সংক্ষেপার্থ গঙ্গা শব্দ পরিত্যক্ত হইয়া রাট্ শব্দ বা রাঢ় শব্দ প্রচলিত থাকিবে। সংক্ষেপার্থে গঙ্গা শব্দ এরূপ পরিত্যক্ত হইয়া থাকে। উদাহরণ "গঙ্গাতীরস্থ" শব্দের পরিবর্ত্তে অনেকে "তীরস্থ" বলে। ত্রিহুতের প্রাচীন সংস্কৃত নাম "তীরভুক্তি"। এস্থলেও গঙ্গা শব্দ পরিত্যাগ হইয়া কেবল "তীর" শব্দ আছে। গঙ্গারাঢ়ও সেই জন্য এখন "রাঢ়" শব্দে দাঁড়াইয়াছে। মেগাস্থিনিসের কথায় আমরা ইহাই বুঝিতে পারি যে, তৎকালে এই রাঢ়দেশ একটি পৃথক্ রাজ্য ছিল। মেগাস্থিনিস বলেন যে, এই রাজ্য এরূপ প্রতাপান্বিত ছিল যে, ইহা কখন কোন শত্রু কর্ত্তৃক পরাজিত হয় নাই এবং অন্যান্য রাজগণ গঙ্গারাঢ়ীদিগের হস্তি-সৈন্যের ভয়ে তাহাদিগকে আক্রমণ করিতেন না। তিনি ইহাও

লিখিয়াছেন যে, স্বয়ং সর্ব্বজয়ী আলেগ্‌জাণ্ডার গঙ্গাতীরে উপনীত হইয়া, গঙ্গারাঢ়ীদিগের প্রতাপ শুনিয়া, সেইখান হইতে প্রস্থান করিলেন। বাঙ্গালীর বলবীর্য্যের ভয়ে আলেগ্‌জাণ্ডার যুদ্ধে ক্ষান্ত হইয়াছিলেন, এ কথা কেহ বিশ্বাস করুন বা না করুন, ইহার সাক্ষী স্বয়ং মেগাস্থিনিস্। আমরা নূতন সাক্ষী শিখাইয়া আনিতেছি না।

অনেকে বলিবেন যে কৈ, প্রবলপ্রতাপান্বিত গঙ্গারাঢ়ীদিগের নাম তখন আমরা কেহ পূর্ব্বে শুনি নাই। যখন মার্স্‌ম্যান প্রভৃতি ইংরাজ ইতিহাস-বেত্তাদিগের কাছে আমরা স্বদেশের ইতিহাস শিখি, তখন গঙ্গারাঢ়ীর নাম আমাদের শুনিবার সম্ভাবনা কি? কিন্তু গঙ্গারাঢ়ী নাম আমরা নূতন গড়িলাম না। তাহার ঐতিহাসিক প্রমাণ দিতেছি। যেখানে দেখিতেছি যে, যে প্রদেশবাসীদিগকে মেগাস্থিনিস্ গ্যাঙ্গ্যারিডি বলেন, সেই প্রদেশকেই লোকে এখন রাঢ়ী বলে; আমাদের বিবেচনায় গঙ্গারাঢ়ী নামের ঐতিহাসিক সম্বন্ধে ইহাই যথেষ্ট প্রমাণ। কিন্তু আমরা কেবল সে প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া এ নাম ব্যবহার করিতেছি না। অনেকে অবগত আছেন, ম্যাকেঞ্জির সংগ্রহ নামে কতকগুলি দুর্লভ ভারতবর্ষীয় পুস্তকের সংগ্রহ আছে। সেগুলি মুদ্রাঙ্কিত হইয়া প্রচার হইবার সম্ভাবনা নাই এবং সকলের প্রাপ্যও নহে। অথচ তাহাতে মধ্যে মধ্যে বিচিত্র নূতন ঐতিহাসিক তত্ত্ব প্রাপ্ত হওয়া যায়। সেই সকল গ্রন্থের একটি তালিকা উইল্‌সন সাহেব প্রচারিত করিয়াছেন, এবং তৎসঙ্গে উহা হইতে কতকগুলি ঐতিহাসিক তত্ত্ব সংগ্রহ করিয়া প্রকাশিত করিয়াছেন। ঐ গ্রন্থের ৮২ পৃষ্ঠায় দেখিবেন, লিখিত আছে যে, গঙ্গারাঢ়ীর অধীশ্বর অনন্তবর্ম্মা বা কোলাহল কলিঙ্গ জয় করিয়াছিলেন। এ কথা প্রস্তর-শাসনে লিখিত আছে, আমরা গঙ্গারাঢ়ী নাম নূতন গড়ি নাই। তবে অনভিজ্ঞ ইংরাজেরা বাঙ্গালার ইতিহাস লিখিতে প্রবৃত্ত হওয়ায় আর সেই সকল গ্রন্থ প্রচলিত হওয়ায়, বাঙ্গালার পূর্ব্বগৌরব প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে।

এই যে অনন্তবর্ম্মা বা কোলাহল রাজার উল্লেখ করিলাম, ইনিও বাঙ্গালীর পূর্ব্বগৌরবের এক চিরস্মরণীয় প্রমাণ। উড়িষ্যার বিখ্যাত গঙ্গাবংশ নামে যে রাজবংশ—ইনিই তাহার আদিপুরুষ। কেহ কেহ বলেন যে, গঙ্গা-

বংশীয়েরা দক্ষিণ দেশ হইতে উড়িষ্যায় আসিয়াছিল এবং চোরঙ্গা বা চোর-গঙ্গা নামে এক জন দাক্ষিণাত্য রাজা এই বংশ সংস্থাপন করেন। এ কথাটি মিথ্যা। এই প্রবল প্রতাপশালী মহামহিমাময় রাজবংশীয়েরা যে বাঙ্গালী ছিলেন, * এই কথা যাঁহারা বিশ্বাস করিতে অনিচ্ছুক, তাঁহারাই সে পক্ষ সমর্থন করেন। উইলসন্ সাহেবের কথিত গ্রন্থের কথিত পৃষ্ঠাতেই যে একখানি শাসনের উল্লেখ আছে, তাহাতে লিখিত আছে, রাঢ়ী কোলাহলই উড়িষ্যা-বিজেতা এবং গঙ্গাবংশের আদিপুরুষ। তাম্রফলক বা প্রস্তর এ বিষয়ে মিথ্যা কথা বলিবে না।

ঐতিহাসিক ভারতবর্ষে যে সকল রাজবংশের আবির্ভাব হইয়াছিল, এই বাঙ্গালী গঙ্গাবংশীয়দিগের প্রতাপ ও মহিমা কাহারও অপেক্ষা ন্যূন ছিল না। পুরীর মন্দির ও কোনার্কের আশ্চর্য্য প্রাসাদাবলী তাঁহাদিগেরই গঠিত। বাঙ্গালার পাঠানেরা যত বার তাঁহাদিগের সঙ্গে যুদ্ধে উদ্যত হইয়াছিল, তত বার পরাভূত, তাড়িত এবং অপমানিত হইয়াছিল। বরং গঙ্গাবংশীয়েরা তাহাদিগকে প্রহার করিতে করিতে পশ্চাদ্ধাবিত হইয়া তাড়াইয়া লইয়া যাইত। একদা লাঙ্গলীয় নরসিংহ নামে এক জন গঙ্গাবংশীয় রাজা বাঙ্গালার মুসলমান স্থলতানের ঐরূপ পশ্চাদ্ধাবিত হইয়া, পাঠানদিগের রাজধানী গৌড় নগর আক্রমণ করিয়া লুঠপাট করিয়া পাঠানের সর্ব্বস্ব লইয়া ঘরে ফিরিয়া যান। উদ্ধত মুসলমানদিগকে গঙ্গাবংশীয়েরা তিন শত বৎসর ধরিয়া যেরূপ শাসিত রাখিয়াছিলেন, সেরূপ চিতোরের রাজবংশ ভিন্ন আর কোন হিন্দুরাজবংশ পারেন নাই। তাঁহারা যেমন বাঙ্গালায় মুসলমান-দিগকে শাসনে রাখিয়াছিলেন, দাক্ষিণাত্যের হিন্দুরাজাদিগকেও তেমনি শাসিত রাখিয়াছিলেন।

এই সকল কথার পর্য্যালোচনা করিয়া, হণ্টর সাহেব সেকালের উড়িয়া-সৈন্যের অনেক প্রশংসা করিয়াছেন। সে প্রশংসা উড়িয়া-সেনার প্রাপ্য নহে, গঙ্গাবংশীয়দিগের স্বদেশী রাঢ়ী সৈন্যের প্রাপ্য। সকলেই জানেন

* "বর্ম্মা" শব্দে বুঝাইতেছে যে, উহাঁরা ক্ষত্রিয় ছিলেন। ক্ষত্রিয় হইলে বাঙ্গালী হইল না, ভরসা করি, এ আপত্তি কেহ করিবেন না। বাঙ্গালার ক্ষত্রিয়কে বাঙ্গালী বলিব না, তবে বাঙ্গালার ব্রাহ্মণকেই বা বাঙ্গালী বলিব কেন?

যে, উড়িষ্যায় গঙ্গাবংশীয়দিগের সাম্রাজ্য গোদাবরী হইতে সরস্বতী পর্য্যন্ত অর্থাৎ বাঙ্গালায় ত্রিবেণী পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। এক্ষণে যাহা মেদিনীপুর জেলা এবং হাবড়া জেলা, তাহার সমুদয় এবং যাহা বর্দ্ধমান ও হুগলী জেলার অন্তর্গত, তাহার কিয়দংশ ঐ সাম্রাজ্যভুক্ত ছিল। ইহাই গঙ্গাবংশীয়দিগের পৈতৃক রাজ্য। যেমন নর্ম্ম্যান্ উইলিয়ম্ ইংলণ্ড জয় করিয়া নর্ম্মাণ্ডির রাজধানী পরিত্যাগপূর্ব্বক ইংলণ্ডের রাজধানীতে গিয়া বাস করিতে লাগিলেন, তেমনি গঙ্গাবংশীয়েরা উড়িষ্যা জয় করিয়া, আপনাদিগের প্রাচীন রাজধানী পরিত্যাগ পূর্ব্বক উড়িষ্যায় বাস করিতে লাগিলেন বটে, কিন্তু তাঁহারা পৈতৃক রাজ্য ছাড়েন নাই। উহাও তাঁহাদিগের রাজ্যভুক্ত রহিল, ইহাই সম্ভব। সেই জন্যই ত্রিবেণী পর্য্যন্ত উড়িষ্যার অধিকার ছিল। বাঙ্গালার মুসলমানেরা গঙ্গাবংশীয়দিগকে আক্রমণ করিলে, কাজেই প্রথমে এই রাঢ়দেশ আক্রমণ করিত, এবং এই রাঢ়ীগণ কর্ত্তৃকই পুনঃ পুনঃ পরাভূত হইত।

এক্ষণে অনেকে জিজ্ঞাসা করিতে পারেন যে, রাঢ়ীবাঙ্গালিরা যদি এত বলবিক্রমযুক্ত ছিল, তবে অন্যান্য বাঙ্গালিরা এত হীনবীর্য্য কেন? আমাদিগের উত্তর যে, অন্য বাঙ্গালিরা রাঢ়ীদিগের অপেক্ষা হীনবীর্য্য ছিল, এমন বিবেচনা করিবার কোন কারণ নাই। বরং এই রাঢ়ীরাও অন্য বাঙ্গালিদিগের দ্বারা পরাভূত হইয়াছিল, ইহাও বিবেচনা করিবার কারণ আছে। রাঢ়দেশের কিয়দংশ সেনরাজাদিগের রাজ্যভুক্ত ছিল, * এবং সেনরাজারা যে, উহা গঙ্গাবংশীয়দিগের নিকট কাড়িয়া লইয়াছিলেন, এমন বিবেচনা করা অসঙ্গত হয় না। অন্য বাঙ্গালিদিগকে অপেক্ষাকৃত হীনবীর্য্য মনে করিবার একমাত্র কারণ এই যে, মুসলমানেরা অতি সহজে বাঙ্গালা জয় করিয়াছিল। বস্তুতঃ মুসলমানেরা সহজে বাঙ্গালা জয় করে নাই—কেবল লক্ষ্মণাবতীই সহজে জয় করিয়াছিল। তাহারা তিন শত বৎসরেও সমস্ত বাঙ্গালা জয় করিতে পারে নাই। মুসলমানেরা স্পেন্ হইতে ব্রহ্মপুত্র পর্য্যন্ত কালে সমস্ত অধিকার করিয়াছিল বটে, কিন্তু ভারতবর্ষ জয় করা তাহাদিগের পক্ষে যেরূপ দুরূহ হইয়াছিল, এমন আর কোন দেশেই হয় নাই। ভারতবর্ষের মধ্যে

* এই জন্যই কায়স্থ প্রভৃতি জাতির মধ্যে উত্তররাঢ়ী ও দক্ষিণরাঢ়ী বলিয়া প্রভেদ আছে। রাজ্য পৃথক্ হওয়াতে সমাজও পৃথক্ হইয়াছে।

আবার পাঁচটি জনপদে তাহারা বড় ঠেকিয়াছিল, এমন আর কোথাও না। ঐ পাঁচটি প্রদেশ (১) পঞ্জাব, (২) সিন্ধুসৌবীর, (৩) রাজস্থান, (৪) দাক্ষিণাত্য, (৫) বাঙ্গালা।

শ্রীযুক্ত বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

নন্দিনীর বরপ্রদান।

রজনী প্রভাত হইলে নরপতি শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিয়া প্রাতঃকৃত্যাদি সমাপন করিলেন। পরে সুদক্ষিণা গন্ধমাল্যাদি দ্বারা নন্দিনীর পূজা করিলে, রাজা বৎসের স্তন্যপানানন্তর তাহাকে পুনর্ব্বার রজ্জুবদ্ধ করিয়া নন্দিনীকে ছাড়িয়া দিলেন। নন্দিনী অগ্রে অগ্রে চলিলেন, রাজা ও রাজমহিষী উভয়েই পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন। তপোবনপ্রান্ত পর্য্যন্ত গমন করিয়া রাজা কোমলাঙ্গী সুদক্ষিণাকে আশ্রমে ফিরিয়া যাইতে আদেশ করিলেন এবং আত্মরক্ষার নিমিত্ত পরাপেক্ষার আবশ্যকতা নাই, এই বিবেচনায় অনুযাত্রিকদিগকেও সঙ্গে আসিতে নিষেধ করিয়া, একাকী ধেনুর পশ্চাৎ পশ্চাৎ অরণ্যপথে গমন করিতে লাগিলেন। মহারাজ দিলীপ, কথন সুস্বাদ নবীন তৃণ দান করিয়া, কথন গাত্রকণ্ডূয়ন করিয়া, কথন বা দংশমশকাদি নিবারণ করিয়া নন্দিনীর আরাধনায় প্রবৃত্ত হইলেন। নন্দিনী চলিলে চলেন, বসিলে বসেন, দাঁড়াইলে দাঁড়ান এবং জলপানে প্রবৃত্ত হইলে জলপান করেন। এইরূপে ছায়ার ন্যায় তাঁহার অনুবর্ত্তী হইলেন।

রাজার কেশপাশ লতাপাশে বদ্ধ, হস্তে ধনুর্ব্বাণ, সঙ্গে অনুচর নাই এবং মণিমুকুটাদি রাজচিহ্ন কিছুমাত্র নাই, তথাপি অনির্ব্বচনীয় তেজঃপ্রভাবে রাজশ্রী স্পষ্টই লক্ষিত হইতে লাগিল। ইতস্ততঃ বনস্থ বিহঙ্গমগণ কলরব করিয়া বন্দিবৃন্দের ন্যায় স্তুতিপাঠ করিতে লাগিল। প্রফুল্ল বনলতা সকল বায়ুভরে আন্দোলিত হইয়া তদ্গাত্রে পুষ্পবৃষ্টি করিতে লাগিল। রাজার সুকুমার কলেবর মধ্যাহ্নকালে আতপতাপিত হওয়াতে তিনি গিরিনির্ঝরিণীর নিকটস্থ তরুতলে উপবেশন পূর্ব্বক সুশীতল বনবায়ুর স্পর্শসুখ অনুভব করিতে লাগিলেন। তাঁহার বিশাল স্কন্ধদেশে বৃহৎ কোদণ্ড লম্বমান

রহিয়াছে, তথাপি হরিণগণ তদীয় কৃপামধুর আকৃতি দেখিয়া নিঃশঙ্কমনে সরলনয়নে তাঁহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া রহিল।

এইরূপে দিলীপ রাজা বশিষ্ঠধেনুর অনুবর্ত্তী হইয়া নানা বন ভ্রমণ করিতে করিতে দিবাবসান হইল। ভগবান্ সহস্ররশ্মি অস্তাচলশিখরাবলম্বী হইলেন; আকাশমণ্ডল রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল; বরাহগণ পল্বলপঙ্ক হইতে উঠিয়া বিচরণ করিতে লাগিল; ময়ূর ময়ূরীগণ স্ব স্ব আবাসবৃক্ষে উপবেশন করিতে লাগিল; মৃগকদম্বক তৃণাচ্ছন্ন ভূতলে শয়ন করিতে আরম্ভ করিল; বিহঙ্গমেরা কলরব করিতে করিতে নিজ নিজ নীড়াভিমুখে ধাবমান হইল এবং বনভূমি অনতিনিবিড় অন্ধকারে অল্প অল্প আবৃত হইতে লাগিল।

নন্দিনী সায়ংকাল উপস্থিত দেখিয়া আশ্রমাভিমুখে প্রত্যাগমন করিতে আরম্ভ করিলেন। রাজাও পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিতে লাগিলেন। ক্রমে আশ্রমের প্রত্যাসন্ন হইলেন। এ দিকে সুদক্ষিণা নন্দিনীর প্রত্যুদ্গমনার্থ তপোবনপ্রান্তে দণ্ডায়মান ছিলেন। তিনি দূর হইতে ধেনুসহচারী প্রিয়তমকে দেখিতে পাইয়া এমত অভিনিবেশ পূর্ব্বক নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন, বোধ হয় যে, তাঁহার নেত্রদ্বয় সমস্ত দিনের উপবাসে অতিমাত্র সতৃষ্ণ হইয়া রাজাকে পান করিতে লাগিল। নন্দিনী ক্রমে ক্রমে নিকটবর্ত্তিনী হইলে সুদক্ষিণা অর্ঘ্যপাত্র হস্তে প্রদক্ষিণপূর্ব্বক অর্থসিদ্ধির দ্বারস্বরূপ তাঁহার শৃঙ্গদ্বয়ের মধ্যভাগে পুষ্পাদি বিন্যাস করিয়া অর্চ্চনা করিলেন; বশিষ্ঠধেনু বৎসের নিমিত্ত নিতান্ত উৎসুক হইয়াও স্থিরভাবে সপর্য্যা গ্রহণ করিলেন। রাজা ও রাজ্ঞী তাঁহার সেই ভাব অবলোকন করিয়া ইষ্টসিদ্ধির শুভ চিহ্ন বিবেচনায় মনে মনে সাতিশয় হৃষ্ট হইলেন। অনন্তর ধেনু, বৎসসন্নিধানে গমন করিলে রাজা, গুরু ও গুরুপত্নীর চরণগ্রহণ করিয়া সায়ংসন্ধ্যাদি সম্পন্ন করিলেন। পরে রজনীযোগে দোহনানন্তর নন্দিনীর নিকটে একটি প্রদীপ এবং পূজোপকরণ রাখিয়া সস্ত্রীক তাঁহার আরাধনায় পুনর্ব্বার নিযুক্ত হইলেন। পরদিবস প্রভাতেও গাত্রোত্থান করিয়া পূর্ব্ববৎ নন্দিনীর পরিচর্য্যা করিলেন। এইরূপে ক্রমে ক্রমে একবিংশতি দিবস অতিবাহিত হইল।

অনন্তর দ্বাবিংশ দিবসে রাজা ধেনুর সমভিব্যাহারে আশ্রম হইতে বহির্গত হইয়া ক্রমে ক্রমে নানা বন উত্তীর্ণ হইলেন। নন্দিনী রাজার ভক্তিপরী-

ক্ষার মানসে হিমালয় পর্ব্বতের সন্নিহিত হইয়া একপ্রকার মায়া বিস্তার করিবার অভিলাষ করিলেন। হিমগিরির যে প্রদেশে গঙ্গাপ্রপাত, তাহার চতুষ্পার্শ্বে অতিমনোহর নবীন দূর্ব্বাঙ্কুর সকল জন্মিয়াছিল। নন্দিনী চরিতে চরিতে ঐ অপূর্ব্ব দূর্ব্বা ভক্ষণচ্ছলে তাহার নিকটবর্ত্তিনী হইয়া গুহাভ্যন্তরে অর্দ্ধপ্রবিষ্ট হইলেন। রাজা মনে জানেন, নন্দিনী সামান্য ধেনু নহে, কোন দুষ্ট সত্বর ইঁহার অনিষ্ট করিতে পারিবেক না। এই বিবেচনায় তৎকালে তিনি হিমালয়ের অলৌকিক শোভার প্রতি একদৃষ্টে নয়নার্পণ করিয়াছিলেন। ইত্যবসরে এক প্রকাণ্ড সিংহ নৃসিংহের অজ্ঞাতসারে নন্দিনীকে আক্রমণ করিল। নন্দিনী তৎক্ষণাৎ আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিলেন। সেই আর্ত্তনাদ রাজার গিরিনিহিত দৃষ্টিকে যেন শৃঙ্খলাকৃষ্ট করিয়াই প্রত্যাবর্ত্তন করিল। রাজা অকস্মাৎ নন্দিনীপৃষ্ঠে প্রকাণ্ড সিংহ সন্দর্শন করিয়া একবারে বিস্ময়াপন্ন হইলেন। তখন আর কি করেন, সিংহের বিনাশবাসনায় সত্বর হইয়া বাণ উদ্ধরণার্থে যেমন আস্তে ব্যস্তে তূণীরমুখে হস্তার্পণ করিয়াছেন, অমনি হস্ত রুদ্ধ হইয়া রহিল। হস্ত উত্তোলন করিতে অনেক চেষ্টা করিলেন, কোন মতেই কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না। তাঁহার দক্ষিণ হস্তটি চিত্রার্পিতের ন্যায় নিশ্চল হইয়া রহিল। দিলীপ পুরোবর্ত্তী রিপুর প্রতিবিধান করিতে অসমর্থ হইয়া মন্ত্রবলে হতবীর্য্য বিষধরের ন্যায় কেবল মনে মনেই সাতিশয় দগ্ধ হইতে লাগিলেন।

তখন পশুরাজ মনুষ্য-বাক্যে নররাজের বিস্ময় বিধান পূর্ব্বক কহিল, মহারাজ! বৃথা কেন আয়াস পাইতেছ, আমার প্রতি শস্ত্রনিক্ষেপ করিলেই বা কি হইতে পারে? বেগবান্ বায়ু, বৃক্ষাদি উৎপাটন করিতেই সমর্থ হয়, কিন্তু কখন পর্ব্বতকে চঞ্চল করিতে পারে না। আমি নিকুম্ভের মিত্র, আমার নাম কুম্ভোদর, আমি ভগবান্ ভূতভাবন ভবানীপতির কিঙ্কর। তিনি আমার পৃষ্ঠে পদার্পণ করিয়া অত্যুচ্চ বৃষভ-পৃষ্ঠে আরোহণ করেন। এই যে দেবদারু বৃক্ষ দেখিতেছ, এটি পার্ব্বতীনাথের কৃত্রিম পুত্র। স্কন্দজননী স্বয়ং সুবর্ণকলস দ্বারা পয়োদান করিয়া ইহাকে পরিবর্দ্ধিত করিয়াছেন। একদা এক বন্য হস্তী আসিয়া এই বৃক্ষে গাত্রঘর্ষণ করাতে ইহার ত্বগ্‌ভেদ হইয়াছিল। হরপার্ব্বতী তাহা দেখিয়া স্বপুত্র কার্ত্তিকেয়ের অঙ্গে অসুরাস্ত্র বিদ্ধ হইলে যাদৃশ

ব্যথিত হন, সেইরূপ ব্যথিত হইলেন। তদবধি বনগজদিগের ত্রাসার্থে আমাকে সিংহরূপী করিয়া এই গুহায় থাকিতে আদেশ দিয়াছেন, এবং কহিয়াছেন, তোমার নিকট যে কোন জন্তু আসিবে তাহাকেই ভক্ষণ করিয়া ক্ষুধা নিবারণ করিবে। সেই অবধি ভগবান্ ত্রিলোচনের আদেশানুসারে আমি এই গিরিগহ্বরে বাস করি। সকল দিন আহারসঙ্গতি হয় না। অদ্য ভাগ্যক্রমে পারণা স্বয়ং উপস্থিত হইয়াছে। ইহাকে ভোজন করিলে আমার পর্য্যাপ্তরূপে তৃপ্তি হইতে পারে; অতএব তুমি লজ্জা পরিত্যাগ পূর্ব্বক নিবৃত্ত হও। যথোচিত গুরুভক্তি প্রদর্শন করিতে তোমার কিছুমাত্র ক্রটি হয় নাই। রক্ষণীয় বস্তু শস্ত্রের অসাধ্য হইলে রক্ষক শস্ত্রধারী পুরুষের যশের হানি হয় না। সিংহ এইরূপে আত্মপরিচয় প্রদান করিয়া মৌনভাবে রহিল।

রাজা মৃগেন্দ্রের এইরূপ প্রগল্‌ভ-বাক্য শ্রবণ করিয়া এবং দৈবী শক্তি অতিক্রম করা নরলোকের অসাধ্য বিবেচনা করিয়া লজ্জা পরিত্যাগ পূর্ব্বক বিনীতভাবে সিংহকে নিবেদন করিতে লাগিলেন, হে মৃগেন্দ্র! আমি একটি কথা বলিতে ইচ্ছা করি, ইহা অন্যের নিকট বলিলে উপহাসাস্পদ হইতে পারে সন্দেহ নাই, কিন্তু তুমি শিবকিঙ্কর, তুমি দৈবশক্তিপ্রভাবে সকলের হৃদয়গত ভাব বুঝিতে পার, অতএব তোমার নিকট উপহাসযোগ্য হইবে না, এই বলিয়াই বলিতেছি। সেই সৃষ্টিকর্ত্তা প্রলয়কর্ত্তা মহাদেব তোমাকে অঙ্কাগত সত্ত্ব ভক্ষণ করিতে আদেশ করিয়াছেন; সে আদেশ আমার শিরোধার্য্য বটে, কিন্তু এই ধেনুটি মহর্ষি বশিষ্ঠের ধেনু, আমি তাঁহার শিষ্য, আমি ইঁহার রক্ষার্থে আদিষ্ট হইয়াছি, সম্মুখে গুরুধন নষ্ট হইবে, ইহা আমার উপেক্ষা করা উচিত নহে। আহা! ইহার বালক বৎসটি, যত দিবাবসান হইতেছে, ততই শুষ্ককণ্ঠ হইয়া মাতৃসন্দর্শনার্থ উৎকণ্ঠিত হইতেছে, অতএব অনুগ্রহ করিয়া ধেনুর পরিবর্ত্তে আমাকে ভক্ষণ কর।

মৃগেন্দ্র নরেন্দ্রের এই কথা শুনিয়া ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিল, মহারাজ! তুমি এরূপ অদূরদর্শীর মত কথা বার্ত্তা কহিতেছ কেন? কি আশ্চর্য্য! সমস্ত ভূমণ্ডলের একাধিপতি হইয়া সামান্য ধেনুর নিমিত্ত দুর্লভ জীবন পরিত্যাগ করিতে উদ্যত হইতেছ! এই একাধিপত্য, এই মনোহর রূপ, এই নব যৌবন, অল্পের নিমিত্ত এই সমুদয়ের অপচয় স্বীকার করা অতি নির্ব্বোধের

কর্ম্ম। ধেনুর পরিবর্ত্তে আপন দেহ প্রদান করিলে, এক ব্যক্তির উপকার করা হইল, সন্দেহ নাই, কিন্তু আপনি স্বয়ং জীবিত থাকিলে, রক্ষণাবেক্ষণ এবং হিতসাধন করিয়া প্রজাপুঞ্জের কতই উপকার করিতে পারিবে, আর, এক ধেনুর পরিবর্ত্তে সহস্র সহস্র পয়স্বিনী দান করিয়া অগ্নিকল্প মহর্ষিকেও সন্তুষ্ট করিতে পারিবে; অতএব এই অসৎ অধ্যবসায় পরিত্যাগ কর। এই বলিয়া কেশরী বিরত হইল।

নররাজ ও মৃগরাজ উভয়ের এইরূপ কথোপকথন চলিতেছে, এ দিকে নন্দিনী অতিকাতরভাবে রাজার প্রতি পুনঃ পুনঃ দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন। দেখিয়া, রাজা যৎপরোনাস্তি দুঃখিত হইলেন এবং পুনর্ব্বার বলিলেন, বিপদ্ হইতে উদ্ধার করাই ক্ষত্রিয়দিগের প্রধান ধর্ম্ম; বিশেষতঃ যশোধনদিগের যশোরক্ষা করাই সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। যদি আমি ইহাঁকে বিপদ্ হইতে পরিত্রাণ করিতে না পারি, তবে আমার অধর্ম্মে ও অযশে এই জগন্মণ্ডল পরিপূর্ণ হইবে। কলঙ্কিত ও বিগর্হিত ব্যক্তির জীবনধারণ-প্রয়াস কেবল বিড়ম্বনা মাত্র, অতএব ইঁহার পরিবর্ত্তে স্বদেহ সমর্পণ করিতেছি। তুমি আমাকে ভক্ষণ করিলে তোমার পারণাও বিফল হইবে না এবং আমার গুরু-ধনও নষ্ট হইবে না, সকল দিক্ই রক্ষা পাইবে। দেখ মৃগেন্দ্র! তুমিও ত পরাধীন, এই রক্ষণীয় দেবদারুতরুটির প্রতি কত প্রযত্ন করিতেছ। আমারও নন্দিনীর প্রতি এইরূপ যত্ন। রক্ষণীয় বস্তু নষ্ট করিয়া স্বয়ং অক্ষতশরীরে কিরূপে মহর্ষিসম্মুখে উপস্থিত হইব, এবং তিনিই বা কি মনে করিবেন? নন্দিনী সামান্য ধেনু নহেন, ইনি দেবগবী সুরভির তুল্য, তুমি শৈবশক্তি-প্রভাবেই ইঁহাকে আক্রমণ করিতে পারিয়াছ। এই সামান্য ধেনুর পরিবর্ত্তে লক্ষ লক্ষ পয়স্বিনী দান করিলেও মহর্ষির কোপশান্তি হইবে না। হে মৃগেন্দ্র! ভদ্র লোকদিগের ক্ষণকাল পরস্পর সম্ভাষণ হইলেই বন্ধুতা জন্মিয়া থাকে, সে অনুসারে আমার সহিত তোমার বন্ধুতা হইয়াছে। অতএব বন্ধুর এই প্রার্থনাতে তোমাকে সম্মত হইতে হইবে।

মৃগাধিপ নরাধিপের বিনয়বচনে সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহার প্রার্থনায় সম্মত হইলেন। রাজাও তৎক্ষণাৎ অবরোধ হইতে বিমুক্তবাহু হইয়া অস্ত্রশস্ত্র পরিত্যাগ পূর্ব্বক সিংহসম্মুখে অধোমুখে আমিষপিণ্ডের ন্যায় আত্মদেহ সমর্পণ করিলেন,

কিন্তু প্রচণ্ড সিংহ-নিপাত মনে করিয়া তির্য্যগ্‌ভাবে এক এক বার ঊর্দ্ধে দৃষ্টি-নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। এমত সময়ে স্বর্গ হইতে রাজার মস্তকোপরি বিদ্যাধর-হস্তমুক্ত পুষ্পবৃষ্টি হইতে লাগিল। সুরভিতনয়া নন্দিনী তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, বৎস! গাত্রোত্থান কর।

রাজা এই অমৃতায়মান বচন শ্রবণমাত্র গাত্রোত্থান করিয়া, নিজ জননীর ন্যায় নন্দিনীকে সন্দর্শন করিলেন, সিংহকে আর দেখিতে পাইলেন না। তখন নন্দিনী বিস্ময়-বিমূঢ় ভূপালকে কহিতে লাগিলেন, বৎস! আমি মায়া উদ্ভা-বন পূর্ব্বক তোমার ভক্তি পরীক্ষা করিয়া দেখিলাম, আমার পৃষ্ঠে যে সিংহ দেখিয়াছিলে, সে কৃত্রিম সিংহ। মহর্ষির প্রভাবে যমও আমার অনিষ্টাচরণ করিতে পারেন না। সিংহ ব্যাঘ্র প্রভৃতি সামান্য হিংস্র জন্তুর কথা কি কহিব। তোমার এই প্রগাঢ় গুরুভক্তি এবং আমার প্রতি অনুপম অনুকম্পা দেখিয়া আমি যৎপরোনাস্তি প্রীত হইলাম, সম্প্রতি বরপ্রার্থনা কর, তুমি আমাকে কেবল দুগ্ধদাত্রী মনে করিও না, আমি প্রসন্ন হইলে সর্ব্বকাম প্রদান করিতে পারি। রাজা অপরিসীম আনন্দসাগরে মগ্ন হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে নন্দিনীর নিকট, বংশপ্রবর্ত্তয়িতা অনন্তকীর্ত্তি সন্তান প্রার্থনা করিলেন। নন্দিনী তথাস্তু বলিয়া রাজাকে আদেশ করিলেন, "বৎস! পত্রপুটে মদীয় দুগ্ধ দোহন করিয়া পান কর।" নৃপতি বিনীত ভাবে নিবেদন করিলেন, "মাতঃ! আমি ঋষির অনুজ্ঞা লইয়া বৎসের পীতাবশিষ্ট এবং হোমার্থ দুগ্ধের অবশিষ্ট পান করিতে ইচ্ছা করি, কি অনুমতি হয়?" নন্দিনী এই কথায় পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর সন্তুষ্ট হইলেন।

অনন্তর নন্দিনী বন হইতে আশ্রমাভিমুখে চলিলেন। রাজাও পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন। ক্রমে ক্রমে আশ্রমে উত্তীর্ণ হইয়া রাজর্ষি পরমাহ্লাদিত মনে মহর্ষির নিকট আদ্যোপান্ত সমস্ত বৃত্তান্ত পরিচয় দিলেন। মুনি শুনিয়া নিরতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন। সুদক্ষিণা রাজার মুখপ্রসাদ অবলোকনেই অভীষ্ট-সিদ্ধির অনুমান করিয়াছিলেন, রাজা তথাপি প্রিয়তমাকে পুনরুক্তের ন্যায় অবগত করাইলেন। পরে সায়ংকালীন সন্ধ্যাবন্দনাদি সমাপন করিয়া, দিলীপ, মহর্ষির আজ্ঞানুসারে নন্দিনীর স্তন্য পান করিলেন। পরদিবস পূর্ব্বাহ্লে মহর্ষি বশিষ্ঠ, আচরিত গোচরব্রতের পারণা করাইয়া, প্রাস্থানিক আশীর্ব্বাদ

প্রয়োগ পূর্ব্বক রাজা রাজ্ঞীকে স্বীয় রাজধানীপ্রস্থানে আদেশ করিলেন। দিলীপ ও সুদক্ষিণা আগমনকালে গুরু ও গুরুপত্নীর চরণযুগলে প্রণিপাত করিয়া এবং হোমাগ্নি ও সবৎসা নন্দিনীকে প্রদক্ষিণ করিয়া বিচিত্র রথারোহণ পূর্ব্বক স্বীয় নগরীতে প্রত্যাগমন করিলেন। দর্শনোৎসুক প্রজাগণ বহু দিনের পর রাজদর্শন পাইয়া অনিমিষনয়নে তাঁহাকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। নৃপবর পুরপ্রবেশানন্তর পৌরজনকর্ত্তৃক অভিনন্দিত হইয়া পুনর্ব্বার রাজ্যভার গ্রহণ পূর্ব্বক পরম সুখে রাজকার্য্য পর্য্যালোচনা করিতে লাগিলেন।

রঘুর তনুত্যাগ।

মহারাজ রঘু পুত্রের বিবাহানন্তর তদীয় হস্তে সমস্ত সাম্রাজ্যের ভারার্পণ করিলেন। মহর্ষি বশিষ্ঠ স্বয়ং মন্ত্রপূত সলিল দ্বারা অজের অভিষেক-ক্রিয়া সম্পাদন করিলেন। রাজপুত্র অভিষিক্ত হইয়া কেবল পিতার রাজ্যাধিকার মাত্র প্রাপ্ত হইলেন এমত নহে, পৈতৃক গুণেরও উত্তরাধিকারী হইলেন। তিনি বিনয়নম্র ব্যবহারে পৈতৃক রাজসিংহাসন এবং স্বীয় নবযৌবন,উভয়কেই অলঙ্কৃত করিলেন। প্রজাগণ তাঁহাকে রঘু হইতে কিছুমাত্র বিভিন্ন ভাবিত না; রঘুর প্রতি যাদৃশ ভক্তি ও যাদৃশ অনুরাগ করিত, তাঁহার প্রতিও সেইরূপ করিতে লাগিল। অজ, কি নীচ, কি মহৎ, কাহাকেও অনাদর করিতেন না। প্রজারা সকলেই পরস্পর মনে করিত, রাজা সর্ব্বাপেক্ষা আমাকেই অধিকতর অনুগ্রহ করিয়া থাকেন। তিনি অতিশয় উগ্রও ছিলেন না অতিশয় মৃদুও ছিলেন না; যেমন অনতিপ্রখর প্রভঞ্জন তরুগণকে উন্মূলিত না করিয়া কেবল অবনত করে, অজ রাজাও মধ্যম ভাব অবলম্বন পূর্ব্বক সেইরূপে দুর্দ্দান্ত সামন্তগণকে ক্রমে ক্রমে আত্মবশে আনিলেন।

নরবর রঘু পুত্রকে প্রকৃতিগণের নিতান্ত অনুরাগভাজন দেখিয়া অকিঞ্চিৎকর বিনশ্বর বিষয়বাসনায় জলাঞ্জলি প্রদানপূর্ব্বক কুলোচিত শান্তিপথ অবলম্বন করিতে কৃতনিশ্চয় হইলেন। অজ পিতাকে তপোবনগমনে উন্মুখ দেখিয়া তদীয় চরণে প্রণিপাত পূর্ব্বক সজল নয়নে তাঁহার গৃহে বাস ভিক্ষা করিলেন। পুত্রবৎসল রঘু অজকে বাষ্পাকুল দেখিয়া অরণ্যগমনে বিরত হইলেন, কিন্তু

সর্প যেমন পরিত্যক্ত নির্মোক পুনর্ব্বার গ্রহণ করে না, তদ্রূপ তিনি পরিত্যক্ত রাজশ্রী আর পুনঃস্বীকার করিলেন না। তিনি বানপ্রস্থ ধর্ম্ম অবলম্বনপূর্ব্বক নগরের প্রান্তভাগেই থাকিয়া যোগসাধন করিতে আরম্ভ করিলেন।

অজ উদয়মার্গ, ও রঘু অপবর্গ আশ্রয় করিলে, পিতা পুত্রের ব্যবহার পরস্পর বিসদৃশ হইয়া উঠিল। প্রাচীন ভূপতি যতিচিহ্ন ধারণ করিলেন; নবীন ভূপতি রাজচিহ্ন ধারণ করিলেন। অজ রাজা অনধিকৃত রাজ্যলাভার্থ রাজনীতিবিশারদ মন্ত্রিবর্গের সহিত মিলিত হইলেন; রঘু রাজা পরম-পদার্থমুক্তিলাভার্থ প্রামাণিক যোগিবৃন্দের সহিত মিলিত হইলেন। অজ, প্রজাগণের ব্যবহার দর্শনার্থ যথাকালে রাজসিংহাসনে উপবেশন করিতেন; রঘু অনুধ্যানপরিচয়ার্থ পবিত্র কুশাসনে উপবেশন করিতেন। অজ প্রভু-শক্তি দ্বারা স্বরাজ্যের প্রান্তরবর্ত্তী নৃপগণকে আত্মবশে আনিলেন; রঘু প্রণি-ধান শিক্ষা দ্বারা শরীরস্থ প্রাণাদি পঞ্চবায়ু আত্মবশে আনিলেন। অভিনব ভূপাল শত্রুদিগের গূঢ় দুশ্চেষ্টিত সকল ভস্মসাৎ করিতে লাগিলেন; প্রাচীন ভূপাল জ্ঞানাগ্নি দ্বারা সংসারবন্ধনের নিদানভূত স্বকীয় কর্ম্মসন্তানের ভস্মীকরণার্থ যত্ন করিতে লাগিলেন। অজ ফলাফল বিবেচনা করিয়া সন্ধি-বিগ্রহাদি প্রয়োগ করিতে লাগিলেন; রঘু লোষ্ট্রকাঞ্চনে সমদর্শী হইয়া সত্ত্বাদি গুণত্রয় জয় করিতে লাগিলেন। নব ভূপতি অবিচলিত অধ্যবসায় সহকারে ফলোদয় পর্য্যন্ত আরব্ধ কর্ম্ম হইতে বিরত হইতেন না, প্রাচীন ভূপতি অবি-চলিত বুদ্ধি সহকারে পরমাত্মাদর্শন পর্য্যন্ত যোগানুষ্ঠান হইতে বিরত হইতেন না। পরিশেষে রঘু ও তৎপুত্র অজ উভয়েই এইরূপ সতর্কতা দ্বারা দুর্জ্জয় ইন্দ্রিয়বর্গ ও শত্রুবর্গ জয় করিয়া চরিতার্থ হইলেন। রঘু তথাপি অজের অচল ভক্তির অপেক্ষায় কতিপয় বৎসর শরীর ধারণ করিলেন। পরে যোগ-মার্গে তনুত্যাগ করিয়া চরমে পরম পদ প্রাপ্ত হইলেন।

৺ চন্দ্রকান্ত তর্কভূষণ।

ভারতে বৈষম্যের অন্তরে সাম্য।

ভারতবর্ষ একটি স্বতন্ত্র রাজ্য, তাহা চিরদিনই প্রসিদ্ধ, উপভাষার বাহুল্যে অথবা উপচ্ছদের বিভিন্নতায় ভারতের একতার হানি হয় নাই। ঈদৃশ বিস্তীর্ণ সাম্রাজ্যে যে উপভাষার বিভিন্নতা হইবে, তাহা আশ্চর্য্য নহে; কিন্তু প্রাচীন আর্য্যগণ যে এই সুবিস্তৃত সাম্রাজ্য মধ্যে একটি মাত্র রাজনৈতিক ভাষা প্রচলিত করিতে পারিয়াছিলেন, ইহাই আশ্চর্য্য। সর্ব্বত্রই রাজসভায় সংস্কৃত ভাষা প্রচলিত ছিল, রাজকার্য্য সংস্কৃত ভাষাতে হইত; এক রাজা অন্য রাজার সমীপে সংস্কৃত ভাষায় লিপি লিখিয়া সাহায্য প্রার্থনা করিতেন। কোন ব্যবহারগত বিবাদের মীমাংসা করিতে হইলে, সংস্কৃত ভাষাতেই তাহার আলোচনা হইত। পরিচ্ছদের নানা বিভিন্নতা থাকিলেও রাজসভায় সর্ব্বত্রই সকলে একরূপ বসন ব্যবহার করিতেন। পাদুকা, ধুতি, অঙ্গচ্ছদ, উত্তরীয়, উষ্ণীষ। অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, মথুরা, দ্রাবিড়, সর্ব্বত্রই সমান। সুতরাং উপভাষা বা উপচ্ছদের ভিন্নতায় ভারতবর্ষের একতার হানি হয় নাই।

আমার দেহচর্ম্ম—বিস্তৃত ও শ্যামবর্ণ; নখররাজি—শুভ্র অথচ ক্ষুদ্র; কেশকলাপ—সূত্রবৎ এবং ঘোর নিবিড় কৃষ্ণ; ওষ্ঠাধর—মাংসল, আরক্ত; অতএব এ সকল মধ্যে আকারে প্রকারে যখন এত বিভেদ, তখন সমস্ত শরীরকে এক দেহ বলা বাতুলতা মাত্র হইয়া পড়ে। কিন্তু এরূপ যুক্তি সঙ্গত নহে; কেন না যখন অঙ্গুলির অগ্রভাগে কণ্টক বিদ্ধ হইলে, মস্তকে পীড়া জন্মে, যখন ওষ্ঠে ব্রণ হইলে সর্ব্বশরীর অবসন্ন হয়, তখন আমার দেহের অবয়ব সমস্ত আকৃতি প্রকৃতিতে বিভিন্ন হইলেও একই দেহের অবয়ব। সকল অবয়বের মধ্যে একটী এক-প্রাণতা আছে।

এক-প্রাণতা থাকিলে সমস্ত বিশ্বমণ্ডলকে একটী দেশ বলিব, আর এক-প্রাণতা না থাকিলে একটী নরদম্পতিও দুইটী স্বতন্ত্র রাজ্যের অস্বাভাবিক সমষ্টি বলি। ভারতে কি এক-প্রাণতা ছিল না? ছিল; এখনও আছে। তবে কখনও বেশী; কখনও কম। ভারতের প্রাণ এক, হৃদয় এক; তবে যখন জীবনে জীবনী থাকে, হৃদয়ে প্রচুর শোণিত থাকে, তখনই এক-প্রাণতা সহজে বুঝিতে পারা যায়; আর যখন হৃদয়ে বল নাই, দেহে রক্ত নাই, তখন

এক-প্রাণ বটে, কিন্তু নির্জীব। যে রোগীর দেহে রক্ত নাই, তাহার অঙ্গুলিতে আঘাত করিলে হৃদয়ে ব্যথা লাগে না। ভারতেও ঠিক সেইরূপ হইয়াছে, দেহে একটু বল হইলেই দেখিবে, ভারত আবার এক-প্রাণে নাচিয়া উঠিবে।

সমগ্র ভারতবর্ষে যে একপ্রাণতা ছিল, এবং এখনও আছে, তাহার জাজ্বল্যমান প্রমাণ পাওয়া যায়। একপ্রাণতা হইবারও প্রচুর কারণ আছে। সমগ্র ভারতবাসী, একই পৌরাণিক বীরবৃন্দের নামে মস্তক অবনত করিয়া থাকে, আর তাহাদিগকে আপনাদের স্বজাতীয় বলিয়া তাঁহাদের সুখে সুখী, দুঃখে দুঃখী হয়। রামায়ণে, মহাভারতে, ভাগবতে ভারতের সকল প্রদেশের ছোট বড় সকলের সমান আস্থা এবং অধিকার আছে। সীতা কেবল ইতিহাসের হইলে, মৈথিল বা অযোধ্যাবাসীর স্পর্দ্ধার সামগ্রী হইতেন; কিন্তু সীতা আমাদের পৌরাণিকী দেবী, সুতরাং ভারতবাসী মাত্রেরই আরাধ্যা বস্তু, সকলেরই কলত্র কন্যার আদর্শস্থানীয়া। লুক্রিশিয়ার সহিত আমাদের সে সম্বন্ধ নাই। লুক্রিশিয়া আমাদের কেহ নহেন; সীতা, আমাদের রামায়ণের—আমাদের সীতা। সেইরূপ ভীম, অর্জ্জুন, যুধিষ্ঠির ও রামচন্দ্র, সাবিত্রী ও দময়ন্তী আমাদের। ইহাতেই ভারতের একপ্রাণতা আছে, বলি।

ভারতে কেবল কাব্য পুরাণ এক নহে। একই ধর্ম্মশাস্ত্র সর্ব্বত্র প্রচলিত। দেব, গুরু, দরিদ্রে দান, অতিথির সেবা, পিতৃপুরুষের তর্পণ, অনার্ত্তবা কন্যাকে সৎপাত্রে সম্প্রদান, ইত্যাদি সমস্ত ক্রিয়া ধর্ম্মশাস্ত্রের আদিষ্ট বলিয়া কোথায় গণ্য নহে? কোথায় মহাত্মা মনুর সম্মান নাই?

পুরাণ এক, কাব্য এক, ধর্ম্মশাস্ত্র এক, ন্যায় দর্শনও এক। যিনি, সহস্র বৎসর মধ্যে কখন বোম্বাইবাসী ও বাঙ্গালি মধ্যে আলাপ হয় নাই, এই কথা শপথ করিয়া বলিতে প্রস্তুত, ইহা নিশ্চয় যে, তিনি কখন নবদ্বীপের চতুষ্পাঠীর কথা শুনেন নাই। ত্রৈলঙ্গ, মারহাট্টা, কাশ্মীর, বিক্রমপুর—দিগ্দেশের ছাত্র এক চতুষ্পাঠীতে ক্রমাগত দশ বৎসর কাল থাকিয়া এক অধ্যাপকের কাছে এক শাস্ত্র অধ্যয়ন করে, বঙ্গীয় পণ্ডিত-কুলশিরোমণি শিরোমণির বুদ্ধির কাছে মস্তক নত করে; তাহাতে যে এক-প্রাণতা জন্মে, তাহা সভ্যতম আমেরিকাবাসীরও আদরের সামগ্রী। এই এক-প্রাণতা ছিল বলিয়াই চৈতন্য-

দেব লীলাচল হইতে ব্রজমণ্ডল পর্য্যন্ত সমস্ত আর্য্যাবর্ত্তে তরঙ্গ তুলিতে পারিয়াছিলেন; এখনও এক-প্রাণতা আছে বলিয়াই দয়ানন্দ সরস্বতী ভারতের সর্ব্বত্র ঋষিতুল্য সমাদর প্রাপ্ত হন।

এক-প্রাণতা ভারতে চিরদিনই আছে, তবে পূর্ব্বের মত সজীবতা নাই।

শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র সরকার।

রামের অরণ্যযাত্রা।

দশরথ, দূর হইতে রামকে কৃতাঞ্জলিপুটে আগমন করিতে দেখিয়া, দুঃখিতমনে শীঘ্র আসন পরিত্যাগ পূর্ব্বক তাঁহাকে আলিঙ্গন করিবার নিমিত্ত ধাবমান হইলেন, এবং তাঁহার সন্নিহিত না হইতেই ভূতলে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। তিনি মূর্চ্ছিত হইলে রাম ও লক্ষ্মণ তাঁহাকে ধারণ করিবার নিমিত্ত ধাবমান হইলেন। সভাস্থলে সহসা বহুসংখ্য স্ত্রীলোক "হা রাম" বলিয়া ক্রন্দন করিয়া উঠিলেন। মস্তকে ও বক্ষঃস্থলে অনবরত করাঘাত করিতে লাগিলেন; ভূষণের শব্দ হইতে লাগিল। তখন রাম, লক্ষ্মণ ও সীতা বাষ্পাকুল লোচনে বিচেতন রাজাকে গ্রহণ পূর্ব্বক পর্য্যঙ্কে উপবেশন করিলেন।

অনন্তর দশরথ ক্ষণকাল পরে সংজ্ঞা লাভ করিলে রাম কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, নরনাথ! আমি এক্ষণে দণ্ডকারণ্যে গমন করিব; আপনি আমাদিগের সকলেরই অধীশ্বর, আমি আপনাকে সম্ভাষণ করিতেছি, আপনি সৌম্য দৃষ্টিতে দর্শন করুন। আমি, লক্ষ্মণ ও সীতাকে প্রকৃত হেতু প্রদর্শন পূর্ব্বক নিবারণ করিয়াছি, ইঁহারা বারণ না শুনিয়া আমার অনুসরণে অভিলাষ করিয়াছেন। অতএব এক্ষণে, প্রজাপতি ব্রহ্মা যেমন পুত্রগণকে তপশ্চরণার্থ আদেশ করিয়াছিলেন, আপনি বীতশোক হইয়া সেইরূপে আমাদের সকলকেই বনগমনে আদেশ করুন।

রাজা দশরথ রামের এই প্রকার বাক্য শ্রবণ এবং তাঁহাকে নিরীক্ষণ পূর্ব্বক কহিলেন, বৎস! আমি কৈকেয়ীকে বরদান করিয়া যারপরনাই মুগ্ধ হইয়াছি, অতএব অদ্য তুমি আমাকে বন্ধন করিয়া স্বয়ংই অযোধ্যারাজ্য গ্রহণ কর। ধার্ম্মিক রাম পিতার এই কথা শুনিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, পিতঃ! আপনি অতঃপর সহস্র বৎসর আয়ু লাভ করিয়া পৃথিবী শাসন করুন।

রাজ্যে আমার কিছুমাত্র স্পৃহা নাই, আমি চতুর্দ্দশ বৎসর অরণ্য পর্য্যটন এবং আপনারই প্রতিজ্ঞা পূরণ পূর্ব্বক পশ্চাৎ আসিয়া আপনাকে অভিবাদন করিব।

ইত্যবসরে কৈকেয়ী রামের এই বাক্যে অনুমোদন করিবার নিমিত্ত অন্তরাল হইলে রাজা দশরথকে সঙ্কেত করিতেছিলেন। তদ্দর্শনে দশরথ জলধারাকুললোচনে কাতরবচনে কহিলেন, বৎস! তুমি ইহলোক ও পরলোকে অভ্যুদয় কামনায় নির্ভাবনায় গমন কর, তোমার সুখ ও শান্তি লাভ হউক। চতুর্দ্দশ বৎসর পূর্ণ হইলেই পুনরায় প্রত্যাগমন করিও। বৎস! তুমি সত্যপরায়ণ ও ধর্ম্মনিষ্ঠ; তোমার মত-বৈপরীত্য সম্পাদন আমার সাধ্যায়ত্ত নহে। এক্ষণে অনুরোধ করি, তুমি আমার ও তোমার জননীর মুখাপেক্ষা করিয়া, আজিকার এই রজনী এই স্থানে অবস্থান কর। আমি আজ তোমাকে নয়নে নয়নে রক্ষা করিয়া তোমার সহিত পানাহার করিব। তুমি সকল প্রকার ভোগ্য পদার্থে তৃপ্তিলাভ করিয়া, কল্য প্রভাতে যাত্রা করিবে। বলিতে কি, তুমি অতি দুষ্কর কার্য্য সাধনে প্রবৃত্ত হইয়াছ, এবং আমারই লোকান্তরসুখের নিমিত্ত অরণ্যযাত্রা স্বীকার করিতেছ। কিন্তু বৎস! আমি শপথ করিয়া কহিতেছি, তোমার বনবাসে আমার কিছুমাত্র অভিলাষ নাই। যে কৈকেয়ী ভস্মাবগুণ্ঠিত অনলের ন্যায় প্রচ্ছন্ন, যাহার অভিপ্রায় অতিশয় ক্রূর ও গূঢ়, সেই তোমার অভিষেক-বাসনা হইতে আমায় বিরত করিয়াছে। আমি ঐ কুলধর্ম্মনাশিনীর অনুরোধে যে বঞ্চনাজালে পতিত হইয়াছি, তুমি তাহারই ফল ভোগ করিতে চলিলে। বৎস! পুত্রগণের মধ্যে তুমি সর্ব্বাংশে শ্রেষ্ঠ; তুমি যে পিতার সত্যবাদিতা রক্ষার্থ যত্ন করিবে, ইহা নিতান্ত বিস্ময়ের বিষয় নহে।

রাম শোকার্ত্ত রাজা দশরথের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া, দীনভাবে কহিলেন, পিতঃ! আজ আমি যেরূপ রাজভোগ প্রাপ্ত হইব, কল্য তাহা আমাকে কে প্রদান করিবে? সুতরাং এক্ষণে সর্ব্বাপেক্ষা নিষ্ক্রমণই আমার প্রার্থনীয় হইতেছে। আমি এই ধনধান্যপূর্ণ লোকসঙ্কুল রাজ্যবহুল বসুমতীকে ত্যাগ করিতেছি, আপনি ভরতকেই ইহা প্রদান করুন। অদ্য বনবাসের যে সংকল্প করিয়াছি, তাহা কিছুতেই বিচলিত হইবে না। অতঃপর আপনি, সুরাসুর-

সংগ্রামকালে দেবী কৈকেয়ীর নিকট যাহা অঙ্গীকার করিয়াছিলেন, তাহা রক্ষা করিয়া সত্যবাদী হউন। আর, আমি, আপনার আজ্ঞাপালনার্থ চতুর্দ্দশ বৎসর অরণ্যে থাকিয়া, তাপসগণের সহিত কালযাপন করি। পিতঃ! আপনি আমার বাক্যে কিছুমাত্র সংশয় করিবেন না; স্বচ্ছন্দে ভরতকে রাজ্যদান করুন। আমি নিজের বা আত্মীয় স্বজনের সুখাভিলাষে রাজ্যলাভে লোলুপ নহি। আপনি যেরূপ আজ্ঞা করিবেন, তাহা সাধন করাই আমার উদ্দেশ্য। এক্ষণে আপনার দুঃখ দূর হউক, আর রোদন করিবেন না; সুগম্ভীর সমুদ্র কখনই নিজের সীমা অতিক্রম করে না। পিতঃ! আমি এই সমস্ত ভোগ্য বস্তু, স্বর্গ ও জীবনকে নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর জ্ঞান করি; আমি আপনার সমক্ষে সত্য ও সুকৃতির উল্লেখ করিয়া শপথ করিতেছি, আপনি যে, কথার অন্যথা করিবেন, ইহা আমার বাঞ্ছনীয় নহে। এই জন্য এক্ষণে আমি এই পুরমধ্যে ক্ষণকালও থাকিতে সমর্থ হইতেছি না। দেবী কৈকেয়ী আমার অরণ্যবাস প্রার্থনা করাতে আমি কহিয়াছিলাম "চলিলাম"। এখন সেই সত্য পালন করা আমার আবশ্যক; বিপরীত আচরণ কোনমতেই হইবে না। এক্ষণে আপনি আমার বিয়োগ শোক সংবরণ করুন, আর উৎকণ্ঠিত হইবেন না। যথায় হরিণেরা প্রশান্ত-ভাবে সঞ্চরণ এবং বিহঙ্গেরা কলকণ্ঠে কূজন করিতেছে, আমরা সেই কানন-মধ্যে পরম সুখে পর্য্যটন করিব। শাস্ত্রে কহে যে, পিতা দেবগণের ও দেবতা; দেবতা বলিয়াই আমি পিতৃবাক্যপালনে তৎপর হইতেছি। পিতঃ! চতু-র্দ্দশ বৎসর অতীত হইলেই আবার প্রত্যাগমন করিব, তবে কেন আপনি অকারণ সন্তপ্ত হইতেছেন? দেখুন, আমার নিমিত্ত সকলেই ক্রন্দন করিতে-ছেন, ইঁহাদিগকে শান্ত রাখা আপনার কর্ত্তব্য, কিন্তু নিজেই যদি অধীর হন, তবে এই উদ্দেশ্য কিরূপে সিদ্ধ হইবে? মহারাজ! আমি এক্ষণে সাম্রাজ্য পরিত্যাগ করিতেছি, আপনি ইহা ভরতকে প্রদান করুন। ভরত নিরাপদ প্রদেশে অবস্থান করিয়া এই শৈলকাননশোভিত গ্রামনগরপূর্ণ পৃথিবীকে শাসন করুন। আপনি কৈকেয়ীর নিকট যাহা অঙ্গীকার করিয়াছেন, তাহা সফল হউক। উদার রাজভোগে আমার অভিলাষ নাই, প্রীতিকর কোন পদার্থেরই স্পৃহা করি না; আপনকার শিষ্টানুমোদিত আদেশই আমার

শিরোধার্য্য। আপনি আমার জন্য আর পরিতাপ করিবেন না। আমি আপনাকে মিথ্যাবাদিতা-দোষে লিপ্ত করিয়া আজ বিপুল রাজ্য, অতুল ভোগ ও প্রিয়তমা মৈথিলীকেও চাহি না। অধিক কি, আপনি যে আমার নিমিত্ত এত চিন্তিত হইয়াছেন; আপনারও মুখাপেক্ষা করিতে পারি না। পিতঃ! আপনার সংকল্প সত্য হউক। আমি গহন কাননে প্রবেশ করিয়া ফলমূল ভক্ষণ এবং সরিৎ, সরোবর ও শৈল দর্শন করিয়াই সুখী হইব, আপনি নির্ব্বিঘ্নে থাকুন।

শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

ভারতে আর্য্য-বসতি।

আর্য্যগণ আফগানিস্তানের পার্ব্বত্য ভূমি পরিত্যাগ করিয়া প্রথমে পঞ্জাবে আসিয়া বাস করেন। আফগানিস্তানে অনেকগুলি চারণ-ভূমি ছিল। গবাদি জীব প্রসন্নভাবে ঐ সকল ভূমিতে চরিয়া বেড়াইত। আর্য্যেরা কিয়দংশে আপনাদের অবস্থার উৎকর্ষ সাধন করিয়াছিলেন। এজন্য কোন স্থানে উঠিয়া যাইতে, ইঁহাদের প্রথমে প্রবৃত্তি ছিল না। কিন্তু ঘটনাক্রমে ইঁহারা আপনাদের অদৃষ্টের নিকট মস্তক অবনত করিলেন। দুর্নিবার আত্মবিগ্রহ ইঁহাদিগকে অস্থির করিয়া তুলিল। ইঁহারা অবশেষে আপনাদের প্রিয়তম আবাস-ভূমির মমতা পরিত্যাগ করিলেন। যেরূপ আগ্রহে ইঁহাদের স্বদেশীয়-গণ ভিন্ন ভিন্ন সময়ে পশ্চিমোত্তর প্রদেশে উপনিবেশ স্থাপন করিবার জন্য দলে দলে মধ্য এশিয়ার ভূখণ্ড পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, যেরূপ সাহসিকতায় তাঁহারা আদিম জাতিকে পরাস্ত করিয়া গ্রীশে, ইতালীতে, রুশিয়ায় ও জর্ম্মণিতে উপনিবিষ্ট হইয়াছিলেন, এক্ষণে পশুপালক আর্য্যগণও ভারতবর্ষে উপনিবেশ স্থাপন করিতে সেইরূপ আগ্রহ ও সেইরূপ সাহসিকতা দেখাইতে প্রবৃত্ত হইলেন। কেহই আর আফগানিস্তানে রহিল না, সকলেই দল বাঁধিয়া হিমালয়ের পরপারে যাইতে প্রস্তুত হইল। আর্য্যেরা গিরি-সঙ্কট পার হইয়া প্রথমে পেশাবরের নিকট উপনীত হন। সুদূর-বিস্তৃত হিমগিরি অনেক স্থলে ইঁহাদের আসিবার পথে বাধা দিয়াছিল। কিন্তু ইঁহারা কিছুতেই কুণ্ঠিত

বা ভগ্নোদ্যম হন নাই। ইঁহাদের সাহস উৎসাহ ও একাগ্রতা তখন বাড়িয়া উঠিয়াছিল। ইঁহারা দলবলের সহিত অমিতবিক্রমে দুর্গম পার্ব্বত্য পথ অতিক্রম করেন। যেখানে বেগবতী তরঙ্গিণী তরঙ্গ-রঙ্গ বিস্তার করিয়া ইঁহাদের গমনের অন্তরায় হয়, সেখানে ইঁহারা নৌকা সংগ্রহ করিয়া অপর পারে উত্তীর্ণ হন। ইঁহাদের উৎসাহ বা উদ্যম কোনও স্থানে পর্য্যুদস্ত হয় নাই। বীর্য্যবন্ত আর্য্যপুরুষেরা বিপুল উৎসাহসহকারে গিরিপথ অতিক্রম পূর্ব্বক পঞ্জাবের শ্যামল ক্ষেত্রে উপনিবেশ স্থাপন করেন। ভারতবর্ষে আসিয়া আর্য্যেরা প্রতিদ্বন্দ্বী-শূন্য হইলেন না। যে শান্তি লাভের আশায় ইঁহারা আফগানিস্তানের পার্ব্বত্য প্রদেশ ছাড়িয়াছিলেন, এবং আপনাদের স্নেহ-পালিত গোধনের চরণ-ভূমির মমতা পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, ইঁহাদের অদৃষ্টে প্রথমেই সে শান্তি-সুখ ঘটিয়া উঠিল না। ইঁহারা স্বদেশীয় শত্রুর হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া বিদেশীয় শত্রুর হাতে পড়িলেন। এই বিদেশীয়গণ আর্য্যদিগকে সহজে স্থান দিল না। ইহারা আপনাদের আবাস-ভূমির স্বাধীনতা রক্ষার জন্য আর্য্যদিগের সহিত ঘোরতর সমরে প্রবৃত্ত হইল। এদিকে আর্য্যেরা অশেষ কষ্ট স্বীকার করিয়া দলবলের সহিত ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন, তাঁহারা অমনি ফিরিলেন না; ভারতবর্ষবাসী অনার্য্যদিগের যুদ্ধের উদ্‌যোগ দেখিয়া তাঁহারাও সমর-সজ্জার আয়োজন করিলেন। যে কাণ্ড আফগানিস্তানে ঘটিয়াছিল, ভারতবর্ষে তাহারই অভিনয় আরম্ভ হইল। প্রথমে সরস্বতী ও দৃষদ্বতী নদীর মধ্যবর্ত্তী ভূখণ্ডে নরশোণিত-স্রোত বহিল। আর্য্যদিগের এই প্রতিদ্বন্দ্বীগণ ভারতবর্ষের আদিম জাতি। বেদে ইহারা দস্যু অথবা দাস নামে উক্ত হইয়াছে। আর্য্যেরা সকলে সম্মিলিত হইয়া আপনাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধির ভাল প্রণালী অবধারণ করিতে পারিতেন, দস্যুরা এরূপ এক উদ্দেশ্যে একসূত্রে সম্বদ্ধ হইতে জানিত না। আর্য্যদিগের মধ্যে সমাজ-তন্ত্র ছিল, সকলে উৎকৃষ্টতর সামাজিক নিয়ম প্রতিষ্ঠিত করিয়া আপনাদের অবস্থার উৎকর্ষ সাধন করিতে পারিতেন, দস্যুগণের মধ্যে এরূপ সমাজ-তন্ত্র ছিল না, সমাজের উন্নতির জন্য ভাল ব্যবস্থাও প্রণীত হইত না। আর্য্যেরা যুদ্ধের নিয়ম জানিতেন, উৎকৃষ্ট অস্ত্র শস্ত্রের প্রয়োগেও দক্ষ ছিলেন। দস্যুরা সামরিক রীতি কিছুই জানিত না, তাহাদের ভাল রকম অস্ত্র শস্ত্রও ছিল না। কোন বিষয়ে

একবার অকৃতকার্য্য হইলে আর্য্যেরা আপনাদের বুদ্ধিবলে কৃতকার্য্য হইবার ভাল উপায় অবধারণ করিতেন,এবং অধ্যবসায়ের সহিত সেই উপায় অবলম্বন করিয়া সিদ্ধকাম হইতেন, দস্যুদিগের এরূপ বুদ্ধি-বল ছিল না, সুতরাং তাহারা সকল সময়ে সকল বিষয়ে কৃতকার্য্য হইতে পরিত না। আর্য্যেরা যুদ্ধে জয় লাভের জন্য দেবতাদিগের সহায়তা প্রার্থনা করিতেন, এবং জয়লাভ হইলে দেবতাদের প্রসাদে বিজয়শ্রী অধিকৃত হইয়াছে ভাবিয়া, ভক্তি-ভাবে তাঁহাদের আরাধনায় নিবিষ্ট হইতেন, দস্যুদিগের এরূপ ঈশ্বরনিষ্ঠা ছিল না, তাহারা কেবল আপনাদের বাহুবলেরই গৌরব করিত। আর্য্যেরা সময়ে সময়ে প্রকাশ্য সমিতিতে সকলে একত্র হইতেন, এই সকল সমিতিতে সাহসী ও প্রতিভাশালী, সুযোদ্ধা ও সুকবিগণ সাধারণের নিকট প্রশংসা ও সম্মান পাইতেন, দস্যুদিগের এরূপ সমিতির সম্বন্ধে কোনও ধারণা ছিল না। আর্য্যেরা অরাতিদিগকে সম্মুখ-যুদ্ধে আহ্বান করিতেন, সম্মুখ-যুদ্ধ ব্যতীত ইঁহারা আর কোন রূপে শত্রুর অনিষ্ট করিতেন না, দস্যুরা সকল সময়ে সম্মুখ-যুদ্ধে অগ্রসর হইত না, তাহারা অনেক সময়ে লুকাইয়া থাকিয়া, সুযোগক্রমে শত্রুপক্ষের খাদ্যসামগ্রা বা সম্পত্তি হরণ করিয়া বিঘ্ন জন্মাইত। আর্য্যেরা সুগঠিত, সুশ্রী, সুদীর্ঘ ও বলিষ্ঠ ছিলেন। দস্যুরা খর্ব্বকায়, কদাকার ও নয়নের অপ্রীতিকর ছিল; সংক্ষেপে সভ্যতার অনতিস্ফুট আলোক আর্য্যদিগকে ক্রমে উদ্ভাসিত করিতেছিল, অসভ্যতার ঘোর অন্ধকার দস্যু-দিগকে একবারে ঢাকিয়া রাখিয়াছিল।

দস্যুরা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কুটীরে বাস করিত। লৌহ অস্ত্র ইহাদের অদ্বিতীয় সম্বল ছিল। ইহারা কটিদেশে একখান ছোট ধুতি জড়াইয়া রাখিত। কোন কোন দস্যু অপেক্ষাকৃত উন্নত ছিল। ইহাদের সুরক্ষিত দুর্গ ও অনুচর থাকিত। ইহাদের সহিত যুদ্ধের সময় হিন্দু আর্য্যেরা আপনাদের আরাধ্য দেবগণের নিকট শক্তি ও সাহস প্রার্থনা করিতেন।

আর্য্যেরা পঞ্জাব, সিন্ধু প্রভৃতি যে যে দেশে উপনিবেশ স্থাপন করিতে লাগিলেন, সেই সেই দেশেই দস্যুরা তাঁহাদের বিপক্ষে দাঁড়াইল। ইহারা অভিনব আক্রমণকারীদের নিকট সহজে মস্তক অবনত করিল না। সকলেই আপনাদের দেশের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য বদ্ধপরিকর হইল। আর্য্যেরা এই

অসভ্যদিগের সাহস ও স্বদেশ-ভক্তি দেখিয়া চমৎকৃত হইলেন। তাঁহারা আপনাদের অধ্যুষিত স্থান নিরাপদ রাখিবার জন্য ইহাদের সহিত যুদ্ধ করিতে পরাঙ্মুখ হইলেন না। তাঁহাদের সৈন্যগণ প্রধানতঃ পদাতিক ও অশ্বারোহী, এই দুই ভাগে বিভক্ত ছিল। এই পদাতিক ও অশ্বারোহী সৈন্য লইয়া অনেকগুলি দল সংগঠিত হইল। প্রতি দলের এক এক জন সেনাপতি নিযুক্ত হইলেন। ইঁহারা অশ্ব-চালিত যুদ্ধ-রথে আরোহণ করিয়া শঙ্খ-ধ্বনি পূর্ব্বক সমর-দেবতার স্তুতি-গীতি গাইতে গাইতে আপন আপন সৈন্য চালনা করিলেন। ভিন্ন ভিন্ন পতাকা সকল ভিন্ন ভিন্ন সৈনিক-দলে শোভা পাইতে লাগিল। সৈন্যগণের কেহ ধনু ও তীর, কেহ বড়শা বা তরবারি লইয়া যুদ্ধ আরম্ভ করিল। সেনাপতিগণ আপনাদের সৈন্যদল সমভিব্যাহারে ভিন্ন ভিন্ন দিকে যাইয়া দস্যুদিগকে আক্রমণ করিতে লাগি-লেন। দস্যুরা ইঁহাদের পরাক্রম সহিতে পারিল না, আপনাদের শস্য-পূর্ণ গ্রাম বা নগর ছাড়িয়া চারিদিকে পলাইতে লাগিল। অনেকে তরবারির মুখে সমর্পিত হইল। অনেকে পরাজয় স্বীকার পূর্ব্বক নানাবিধ উপহার দিয়া বিজেতাদিগকে পরিতুষ্ট করিল। দস্যুদিগের যে সকল জনপদ অধি-কৃত হইল, আর্য্যেরা তথায় উপনিবিষ্ট হইলেন। এইরূপে অসভ্য দস্যু-জন-পদে আর্য্য রীতি নীতি প্রবর্ত্তিত হইল এবং আর্য্য-দেবগণ স্তুত হইতে লাগি-লেন। প্রত্যেক সেনাপতি আপনাদের অধিকৃত এক একটি ক্ষুদ্র রাজ্যের অধিপতি হইয়া উঠিলেন। এই যুদ্ধ এক দিনে শেষ হইয়া যায় নাই। এক দিনে সমস্ত দস্যু-জনপদ আর্য্যদিগের অধিকৃত হয় নাই। এ যুদ্ধ বহু শতাব্দী ব্যাপিয়া চলিয়াছিল, বহু শতাব্দী ব্যাপিয়া ভারতের এই আদিম অসভ্য জাতি প্রবল-পরাক্রান্ত, সহায়-সম্পন্ন বিদেশীয় আক্রমণকারীদিগের বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছিল। শেষে যখন ইহাদের জয়লাভের আশা নির্ম্মূল হইল, তখনও সকলে আর্য্যদিগের পদানত হইল না; কেহ আত্মীয়গণের সহিত দুর্গম পার্ব্বত্য প্রদেশে যাইয়া আপনাদের স্বাধীনতা রক্ষা করিল, কেহ বা বিজন অরণ্যে যাইয়া বাস করিতে লাগিল। হিন্দু আর্য্যদিগের ইতিহাসের কোনও সময়ে এই জাতি একবারে পরাজিত হয় নাই। এখন ভারতবর্ষে খস, গারো, পুলিন্দ, ভীল, সাঁওতাল প্রভৃতি যে সকল অসভ্য বা অর্দ্ধসভ্য জাতি দেখা

যায়, সেই সকল জাতির লোক আদিম দস্যুদিগের সন্তান। এই দস্যুসন্তান-গণ সাহসী, যুদ্ধকুশল ও কর্ত্তব্য-পরায়ণ। ইহাদের সহিত সদ্ব্যবহার করিলে ইহারা সদ্ব্যবহারকারীর বিশেষ অনুরক্ত হইয়া থাকে। লর্ড ক্লাইব প্রধানতঃ ইহাদের সাহস ও ইহাদের পরাক্রমের উপর নির্ভর করিয়াই দক্ষিণাপথের যুদ্ধে জয়ী হন, এবং পলাসীর রণক্ষেত্রে বিজয়-শ্রী অধিকার পূর্ব্বক বাঙ্গালা, বিহার ও উড়িষ্যা ব্রিটিশ কোম্পানির পদানত করেন।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, আর্য্যগণ পঞ্জাবে আসিয়া বাস করেন। কিন্তু প্রথমেই একবারে সমস্ত পঞ্জাব বা উহার বহিঃস্থ ভূভাগ তাঁহাদের অধিষ্ঠান-ভূমির মধ্যে পরিগণিত হয় নাই। আর্য্য সেনাপতিগণ ভিন্ন ভিন্ন দস্যু-জন-পদের অধিকারী হইলেও প্রথমে উত্তর ভারতের একটি বিশেষ ভূখণ্ডে সকলে বাস করিতেন। এই ভূখণ্ড ব্রহ্মাবর্ত্ত নামে পরিচিত। ইহা সরস্বতী ও দৃষদ্বতী নদীর মধ্যবর্ত্তী এবং দিল্লীর প্রায় এক শত মাইল উত্তরপশ্চিমে অব-স্থিত। সরস্বতী বিনশন নামক স্থানে বালুকা-গর্ভে বিলীন হইয়াছে। দৃষ-দ্বতী বর্ত্তমান সময়ে কাগার নাম ধারণ করিয়াছে। ব্রহ্মাবর্ত্তের দৈর্ঘ্য ৬৫ মাইল এবং বিস্তার ২০ হইতে ৪০ মাইল।

আর্য্যদিগের বংশ যখন ক্রমে বৃদ্ধি পাইতে লাগিল, ব্রহ্মাবর্ত্তে যখন তাঁহা-দের সমাবেশ হইল না, তখন তাঁহারা দক্ষিণাভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগি-লেন। ব্রহ্মাবর্ত্তের পর তাঁহারা যে জনপদে আসিয়া বাস করেন, তাহার নাম ব্রহ্মর্ষি। উত্তর বিহার লইয়া গঙ্গা ও যমুনার উত্তরবর্ত্তী স্থান ব্রহ্মর্ষি প্রদেশের মধ্যে পরিগণিত। এই প্রদেশ চারি ভাগে বিভক্ত, কুরুক্ষেত্র, মৎস্য, পঞ্চাল ও শূরসেন। কুরুক্ষেত্র সরস্বতী নদীর তীরবর্ত্তী থানেশ্বরের নিকট, মৎস্যদেশ এই কুরুক্ষেত্রের দক্ষিণে এবং মথুরার ৮৩ মাইল পশ্চিমে; কেহ কেহ কহেন, বর্ত্তমান জয়পুর রাজ্যের কোন কোন অংশ মৎস্যদেশের অন্ত-র্গত। পঞ্চালের বর্ত্তমান নাম কান্যকুব্জ বা কনৌজ, শূরসেন বর্ত্তমান মথুরা। ইহাতে দেখা যাইতেছে, বংশবৃদ্ধির সহিত গঙ্গা ও যমুনার মধ্যবর্ত্তী প্রায় সমস্ত ভূভাগে আর্য্যদিগের বসতি বিস্তৃত হয়।

ব্রহ্মর্ষির পর আর্য্যেরা যে স্থানে আসিয়া বাস করেন, তাহার নাম মধ্য-দেশ। মনুসংহিতার মতানুসারে মধ্যদেশ হিমালয় ও বিন্ধ্যাচলের মধ্যবর্ত্তী।

মধ্যদেশের পর আবার উপনিবেশের সীমা বৃদ্ধি পাইল। আর্য্যদিগের বংশ যখন এত বাড়িয়া উঠিল যে, মধ্যদেশেও সকলের সমাবেশ হইল না, তখন তাঁহারা আপনাদের আবাসের জন্য চতুর্থ স্থান নির্দ্দিষ্ট করিলেন। এই চতুর্থ স্থান আর্য্যাবর্ত্ত নামে প্রসিদ্ধ হইল। আর্য্যাবর্ত্তের উত্তর সীমা হিমালয় পর্ব্বত, পূর্ব্ব সীমা কালকবন বা বর্ত্তমান রাজমহল পাহাড়, দক্ষিণ সীমা পারিযাত্র বা বিন্ধ্য পর্ব্বত এবং পশ্চিম সীমা আদর্শাবলী বা আরাবলী পর্ব্বত। ক্রমে আর্য্যাবর্ত্তের সীমা সম্প্রসারিত হয়। মনুসংহিতার মতে আর্য্যাবর্ত্তের উত্তরে হিমালয় পর্ব্বত, পূর্ব্বে পূর্ব্ব সাগর, দক্ষিণে বিন্ধ্যগিরি এবং পশ্চিমে পশ্চিম সাগর।

হিন্দু আর্য্যেরা যে, কেবল এই চারি স্থানেই আপনাদের উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন, তাহা নহে। ক্রমে দক্ষিণাপথেও তাঁহাদের বসতি বিস্তৃত হয়। এই সকল উপনিবেশ-স্থাপন ক্রমে ক্রমে হইয়াছিল। আর্য্যদিগের বংশবৃদ্ধির সহিত তাঁহাদের আবাস-স্থানের সংখ্যাও বৃদ্ধি পাইতে থাকে। এইরূপ সংখ্যাবৃদ্ধি অল্প সময়ের মধ্যে হয় নাই। সমস্ত আর্য্যাবর্ত্ত ও দক্ষিণাপথে বসতি স্থাপন করিতে বহু বৎসর লাগিয়াছিল। হিন্দু আর্য্যগণ ভারতবর্ষে প্রবেশ করিয়াই একসময়ে সমুদয় স্থানে আধিপত্য স্থাপন করেন নাই।

কুরুক্ষেত্র।

কুরুক্ষেত্র কি রমণীয় স্থান! চতুর্দ্দিকে যত দূর দৃষ্টিগোচর হয়, আরক্ত বালুকাময় মরুভূমি ধূধূ করিতেছে। স্থানে স্থানে পলাশ বৃক্ষের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বন সমস্ত দৃষ্ট হইতেছে। মধ্যভাগে সুগভীর বারিপূর্ণ তড়াগে হংসগণ জলকেলি করতঃ পদ্মবন আন্দোলিত, তড়াগবারি আলোড়িত এবং সুমধুর কলস্বরে বায়ুপ্রবাহ স্বনিত করিতেছে।

কুরুক্ষেত্র কি ভয়ানক স্থান! ইহার সমুদয় মৃত্তিকা শোণিতবিলিপ্ত, পুষ্পিত পলাশ বৃক্ষ সমস্ত রুধিরপরিষিক্ত, হ্রদগুলি ভৃগুবংশ-সন্তর্পণ ক্ষত্রিয় হৃদয়লোহিত দ্বারা প্রপূরিত। এই স্থানে কুরুবংশ বিধ্বস্ত, পৃথুরাও নিহত, মহারাষ্ট্র-সেনা বিনষ্ট, এবং হিন্দু জাতির উদয়োন্মুখ আশা বহুকালের নিমিত্ত অস্তমিত।

কুরুক্ষেত্র কি শান্তরসাস্পদ স্থান! এখানে কুরুপাণ্ডব, হিন্দু মুসলমান, শত্রু মিত্র, সকলেই এক শয্যায় শয়ান হইয়া সুখে নিদ্রা যাইতেছে। কোন বিবাদ বিসংবাদ বা বৈরিতার নাম গন্ধও নাই। ভয় বিদ্বেষ ঈর্ষ্যাদি ভাব একবারে বিসর্জ্জিত হইয়া গিয়াছে। ইহা সাক্ষাৎ শান্তি-নিকেতন। ঐ যে অরবিন্দনিচয় একই দিবাকরের করস্পর্শে হাস্য করিতেছে, উহারা পুরাতন বীরপুরুষদিগের হৃদয় পদ্ম; ঐ যে কলহংসমণ্ডলী, উহারা প্রাচীন কবিকুল—একতানস্বরে বীরগণের গুণগরিমা গান করিতেছে।

কুরুক্ষেত্রের মধ্যভাগে সরস্বতীনদীকূলে একটি সুপ্রশস্ত বটবৃক্ষতলে মহামুনি মার্কণ্ডেয়ের আশ্রম। মুনিবর সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া পশ্চাদ্ভাগে দৃষ্টিপাত করিলে ভগবান্ বেদব্যাস তাঁহার পার্শ্ববর্ত্তী হইলেন।

মুনিরাজ সম্মুখবর্ত্তিনী নির্ঝরিণীর প্রতি অঙ্গুলি নির্দ্দেশপূর্ব্বক গদ্গদস্বরে কহিলেন:—"ঐ যে জীর্ণা সঙ্কীর্ণা তটিনী তোমার পাদমূলে পতিতা রহিয়াছে দেখিতেছ, আমি স্বচক্ষে ইহার বাল্য, কৈশোর, যৌবন ও জরা দর্শন করিলাম। কোন সময়ে এই সমস্ত প্রদেশ ইহারই গর্ভস্থ ছিল। অনন্তর সত্যযুগে কুরুক্ষেত্র ভূমির উৎপত্তি হইল এবং সরস্বতী-সন্তান ব্রহ্মর্ষিগণ এই ভূমিতে আবাসপ্রাপ্ত হইলেন। এই ক্ষীণা মলিনা স্রোতস্বতী তৎকালে অতীব প্রবলা ছিলেন, তখন সরিৎপতি ইঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া দূরে গমন করেন নাই। তখন সমুদ্র সমুদয় প্রাচ্যভূমি অতিক্রম করিয়া প্রৌঢ়া সরস্বতীর পাণি-গ্রহণার্থে আপনার কর প্রসারিত করিয়াছিলেন। আহা! সে দিন যেন কল্য মাত্র হইয়া গিয়াছে! এই স্রোতস্বতী কি আবার বেগবতী হইবে? ইহার উভয় কূল কি আবার ব্রহ্মগুণগানে প্রতিধ্বনিত হইবে?

এই সকল কথা শ্রবণ করিতে করিতে ভগবান ব্যাসদেবের অক্ষিদ্বয় হইতে অশ্রুধারা বিনির্গত হইতে লাগিল, এবং তাহার দুই এক বিন্দু সরস্বতী-জলে নিপতিত হইল। অমনি নদী-জল যেন প্রবল বাত্যাঘাতে অথবা ভয়ঙ্কর ভূকম্পপ্রভাবে বিলোড়িত হইয়া উঠিল; দেখিতে দেখিতে জলোচ্ছ্বাস বৃদ্ধি পাইতে লাগিল; উভয় কূল ভগ্ন করিয়া মূর্ত্তিমতী সরস্বতী ক্রমশঃ আয়ত হইতে লাগিলেন: বায়ুতে হোমাগ্নি-সম্ভূত ধূমগন্ধ বহিতে আরম্ভ হইল; ব্রহ্মর্ষি-কণ্ঠ-বিনিঃসৃত বেদধ্বনি শুনা যাইতে লাগিল; এবং জলস্থল ব্যোম

সমুদয়ই জীবময় লক্ষিত হইল। অনন্তর ব্রহ্মর্ষি, মহর্ষি, অতিরথ, মহারথ, রাজর্ষি, অর্দ্ধরথ, কবি, ভট্ট, বৈতালিক প্রভৃতির বিভূতি দ্বারা সর্ব্বস্থান পূর্ণ হইয়া উঠিল এবং তাঁহারা সকলেই আপন আপন প্রকৃতিসুলভ স্বরে ব্যাসদেবের কর্ণকুহরে কহিলেন—"মাভৈঃ—মাভৈঃ—আমরা কেহই যাই নাই—সকলেই বিদ্যমান আছি।"

ভগবান বেদব্যাস চিত্রপুত্তলিকার ন্যায় বা ভাস্করীয় প্রতিমূর্ত্তির ন্যায় হইয়া একান্ত স্তম্ভিতভাবে এই সমস্ত ব্যাপার অবলোকন করিতেছিলেন; এমন সময়ে মুনিবর মার্কণ্ডেয় তাঁহার শিরোদেশ স্পর্শপূর্ব্বক কহিলেন—"সাধু বেদ-ব্যাস সাধু! তুমি ভগবতী সরস্বতী এবং তীর্থরাজ কুরুক্ষেত্রের কলিযুগোচিত অবস্থা দর্শন করিতেছিলে, কিন্তু তোমার হৃদয়কন্দরোত্থিত নয়নবারির এমনি মাহাত্ম্য যে, তৎকর্তৃক যুগধর্ম্মের বিপর্য্যয় হইয়া ক্ষণমাত্রে সত্যযুগ পুনঃ প্রত্যানীত হইল। যেথানে এরূপ মন সেখানে সত্যযুগ চিরকালই বিরাজ-মান। সাধুদিগের নয়নবারিই কলিকল্মষপ্রক্ষালনের অমোঘ উপায়; মহামনাদিগের অশ্রুবারিই প্রকৃত সরস্বতীজল। যত দিন তপঃসিদ্ধ মহাত্মা-দিগের হৃদয়কন্দর হইতে ঐ জল নির্গত হইবে, তত দিন সরস্বতী জীবিতা এবং বলবতী থাকিবেন। এক্ষণে চল, কিন্তু আর এ বেশে নয়, কলিযুগ প্রবর্ত্তমান হইয়াছে, দেখিলে ত। এক্ষণে কালোচিত রূপ ধারণ কর। আমি অলক্ষিতে তোমার সমভিব্যাহারে থাকিব।"

শ্রীযুক্ত ভূদেব মুখোপাধ্যায়।

রণজিৎ সিংহ।

অষ্টাদশ শতাব্দী হইতে পরাক্রান্ত মোগল সাম্রাজ্যের অধোগতির সূত্রপাত হয়। সম্রাটের পর সম্রাট্ দিল্লীর সিংহাসনে অধিরূঢ়, পদচ্যুত ও নিহত হইতে থাকেন, জনপদের পর জনপদ দিল্লীর অধীনতা-পাশ উচ্ছেদ করিয়া স্বপ্রধান হইতে থাকে, শাসন-কর্ত্তার পর শাসন-কর্ত্তা সম্রাটের আদেশে ঔদাসীন্য দেখা-ইয়া আপনার ইচ্ছানুসারে শাসন-দণ্ডের পরিচালনায় প্রবৃত্ত হন। পরাক্রান্ত নাদির শাহের আক্রমণে মোগল সম্রাটের প্রিয় নিকেতন সুশোভন দিল্লী

মহাশ্মশানের আকারে পরিণত হয়। ইহার পর দোর্‌রাণী ভূপতি অহম্মদ শাহ আপনার সাহসী আফগান সৈন্যের সহিত ভারতবর্ষে সমাগত হন। ইঁহার পরাক্রমে পানিপথের প্রসিদ্ধ যুদ্ধে মহাবল মর্‌হাট্টাদের ক্ষমতা পর্য্যুদস্ত হয়। দিল্লীর সম্রাট্ রাজ্যভ্রষ্ট হইয়া হীনভাবে বিহার প্রদেশে উপনীত হন। এই বিশৃঙ্খলার সময়ে—বিলুণ্ঠন, বিপ্লব ও বিধ্বংসের ভয়াবহ রাজ্যে শিখগণ আপনাদের জাতীয় তেজস্বিতা অক্ষত রাখিয়াছিল। গুরু গোবিন্দ তাহাদিগকে যে মন্ত্রে দীক্ষিত করিয়াছিলেন, তাহারা সে মন্ত্র হইতে কখনও বিচ্যুত হয় নাই, তাহাদের মধ্যে সাহসী সেনাপতি ও সুদক্ষ শাসন-কর্ত্তার আবির্ভাব হইতেছিল। তাহারা এই সাহসী সেনাপতি ও সুদক্ষ শাসন-কর্ত্তার অধীনে সজ্জিত হইয়া আপনাদের অধিকার সুরক্ষিত করিতেছিল। যাহারা অস্ত্রচালনায় তৎপর ও অশ্বারোহণে নিপুণ না হইত, খালসাদিগের মধ্যে তাহাদের সম্মান বা প্রাধান্য থাকিত না। সুতরাং প্রত্যেক খালসাকেই অস্ত্রসঞ্চালনে ও অশ্বারোহণে আপনার ক্ষমতার পরিচয় দিতে হইত। ক্রমে খালসারা অনেক দলে বিভক্ত হয়। প্রত্যেক দলের এক এক জন সর্দ্দার এক একটি নির্দ্দিষ্ট ভূখণ্ডে স্বাধীনতা অবলম্বন করেন। এইরূপে সমস্ত শিখজনপদ অনেকগুলি খণ্ড রাজ্যে বিভক্ত হইয়া উঠে। এই সকল খণ্ড "মিসিল" নামে অভিহিত হয়। প্রত্যেক মিসিলের অধিপতি সর্ব্বাংশে স্বাধীনভাবে কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হন। খালসারা এইরূপ বহু মিসিলে বিভক্ত হইলেও পবিত্র ভ্রাতৃভাব হইতে বিচ্ছিন্ন হয় নাই। ইহাদের সকলেই পরস্পর দুশ্ছেদ্য জাতীয় বন্ধনে আবদ্ধ থাকিত এবং সকলেই প্রতিবৎসর অমৃতসরের পবিত্র মন্দিরে সমাগত হইয়া আপনাদের উন্নতি সাধনের উপায় নির্দ্ধারণ করিত।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে যখন ইঙ্গরেজ বণিকেরা দক্ষিণাপথে ফরাসীদিগের প্রাধান্য বিলুপ্ত করিবার চেষ্টা পাইতেছিলেন, এক জন বর্ষীয়ান্ দরিদ্র মুসলমান সৈনিক পুরুষ * মহীশূরের সিংহাসন অধিকার পূর্ব্বক যখন সকলের হৃদয়ে বিস্ময় ও আতঙ্কের গভীর রেখাপাত করিতেছিলেন, তখন শিখদিগের খণ্ড রাজ্যে এক জন ক্ষমতাশালী ও কার্য্যকুশল বীরপুরুষের আবির্ভাব হয়। এই বীরপুরুষের আবির্ভাবে শিখেরা মহাবলে বলীয়ান্ হইয়া উঠে।

* হায়দর আলি।

ইঁহার ক্ষমতায়—ইঁহার প্রাধান্যে একটি বহুবিস্তৃত পরাক্রান্ত স্বাধীন রাজ্যের প্রতিষ্ঠা হয়। অসাধারণ বীরত্বমহিমায় ইনি বীরেন্দ্রসমাজের বরণীয় হন। এই মহাবীরের নাম রণজিৎ সিংহ।

সমগ্র পৃথিবীতে যত ক্ষমতাপন্ন মহৎ ব্যক্তি আবির্ভূত হইয়াছেন, মহারাজ রণজিৎ সিংহ তাঁহাদের অন্যতম। রণজিৎ সিংহের পিতা মহাসিংহ একটি মিসিলে কর্ত্তৃত্ব করিতেন। রণজিৎ সিংহ ১৭৮০ অব্দের ২রা নবেম্বর-গুজরণবালায় জন্মগ্রহণ করেন। মহাসিংহ অতিশয় সাহসী ও রণপণ্ডিত ছিলেন। রণজিৎ সর্ব্বাংশে পিতার এই সাহস ও রণপাণ্ডিত্য অধিকার করেন। বাল্যকালে বসন্তরোগে তাঁহার একটি চক্ষু নষ্ট হয়, এজন্য তিনি সাধারণের মধ্যে "কাণা রণজিৎ" নামে প্রসিদ্ধ হন। রণজিৎ সিংহের বয়স আট বৎসর, এমন সময়ে মহাসিংহের পরলোক-প্রাপ্তি হয়। রণজিৎ এই সময় তাঁহার মাতা এবং পিতার দেওয়ান লক্ষ্মীপৎ সিংহের রক্ষাধীন হন। তাঁহার বুদ্ধি, সাহস ও পরাক্রম অসাধারণ ছিল। তিনি এই বুদ্ধি, সাহস ও পরাক্রমের উপর নির্ভর করিয়া আপনার প্রাধান্যস্থাপনে উদ্যত হন। এই সময়ে পঞ্জাবে দোর্‌রাণী ভূপতির আধিপত্য ছিল। ইঙ্গরেজেরা ক্রমে প্রবল হইয়া আপনাদের অধিকার প্রসারিত করিতেছিলেন। সিন্ধিয়া ও হোলকার বল সংগ্রহ পূর্ব্বক ক্রমে ইঙ্গরেজদিগের ক্ষমতা-স্পর্দ্ধী হইয়া উঠিতে-ছিলেন। রণজিৎ সিংহ ইহাঁদের মধ্যে আপনার আধিপত্য বদ্ধমূল করেন। অহম্মদ শাহ দোর্‌রাণীর পৌত্র জেমান শাহ একদা প্রবল বর্ষার সময় আপনার কামান বিতস্তা নদীর অপর পারে লইয়া যাইতে অসমর্থ হন। রণজিৎ সিংহের ক্ষমতায় এই সকল কামান নদীর অপর তটে উত্তীর্ণ হয়। জেমান শাহ এজন্য সন্তুষ্ট হইয়া রণজিৎ সিংহকে লাহোরের আধিপত্য দেন। এই সময়ে রণজিতের বয়স উনিশ বৎসর। রণজিৎ এই তরুণ বয়সে স্বীয় ক্ষমতাবলে লাহোরের অধিপতি হইলেন। ক্রমে শিখদিগের মণ্ডলে তাঁহার ক্ষমতা বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। ক্রমে সমস্ত মণ্ডল তাঁহার আয়ত্ত হইয়া উঠিল।

এই সময়ে মুলতান, পেশাবর প্রভৃতি স্থানে আফগানদিগের আধিপত্য ছিল। রণজিৎ সিংহ ঐ সকল স্থানে আপনার ক্ষমতা বদ্ধমূল করিতে যথা-শক্তি প্রয়াস পাইয়াছিলেন। তাঁহার প্রয়াস বিফল হয় নাই। তিনি

প্রথমে আফগানদিগকে দূরীভূত করিয়া, মুলতান অধিকার করেন, পরে ভারতের নন্দনকানন কাশ্মীরে জয়পতাকা উড়াইয়া দেন। কাশ্মীর অধিকার-কালে মহারাজ রণজিৎ সিংহের পুত্র খড়্গসিংহ সৈন্যদলের অগ্রভাগে ছিলেন। রণজিতের সাহসী অশ্বারোহিগণ পদাতিক সৈন্যের সহিত সম্মিলিত হইয়া পদব্রজে দুরারোহ পর্ব্বত অতিক্রম পূর্ব্বক কাশ্মীরে উপস্থিত হয়। শিখদিগের বিক্রমে আফগান সেনাপতি জব্বর খাঁ পরাজয় স্বীকার করেন। বহু দিনের পর হিন্দু ভূপতির বিজয়-পতাকায় কাশ্মীর আবার শোভিত হইয়া উঠে।

ইহার পর রণজিৎ সিংহ পেশাবর অধিকার করিতে উদ্যত হন। শিখ-দিগের ইতিহাসে ইহা একটি প্রধান ঘটনা। ১৮২৩ অব্দের ১৪ই মার্চ্চ ভারতের একটি প্রাতঃস্মরণীয় পবিত্র দিন। যাহারা দৃষদ্বতী নদীর তীরে হিন্দুদিগকে পরাজিত করিয়া ভারতবর্ষে আধিপত্য স্থাপন করে, শিখেরা এই দিনে তাহাদের দেশে আপনাদের জয়-পতাকা স্থাপন করিতে অগ্রসর হয়। এক দিকে দীর্ঘকায়, ভীমমূর্ত্তি আফগান জাতি, অপর দিকে সাহসী, যুদ্ধকুশল শিখ সৈন্য। আর্য্যাবর্ত্তের হিন্দু নৃপতি এই শেষ বার সিন্ধু নদীর অপর পারে হিন্দু-বিজয়ী পাঠানের শোণিত-জলে পৃথ্বীরাজ ও সমরসিংহের আত্মার পরিতর্পণ করিতে উপস্থিত। মহারাজ রণজিৎ সিংহ এই যুদ্ধে বিজয়ী হইয়া মহোল্লাসে পঞ্চনদে প্রত্যাবৃত্ত হন। নওশেরার সংগ্রামে শিখেরা যেরূপ পরা-ক্রম প্রদর্শন করে, তাহাতে সমগ্র আফগানিস্তান বিস্মিত ও স্তম্ভিত হইয়া উঠে। এই যুদ্ধে রণজিৎ সিংহের সেনাপতি—অকালী সম্প্রদায়ের অধিনায়ক ফুলাসিংহ যেরূপ লোকাতীত বীরত্ব দেখাইয়া বিজয়-লক্ষ্মীর সম্বর্দ্ধনা করেন, এবং যেরূপ লোকাতীত সাহসের সহিত যবন-সৈন্য নির্ম্মূল করিতে করিতে শেষে সেই নওশেরার সমরস্থলে—সেই পবিত্রতাময় পরম তীর্থে অকাতরে, অম্লানভাবে অনন্ত নিদ্রায় নিদ্রিত হন, তাহা চিরকাল ইতিহাসের পত্রে স্বর্ণাক্ষরে অঙ্কিত থাকার যোগ্য। এই মহাযুদ্ধে প্রথমে শিখদিগের পরাক্রম বিচলিত হইয়াছিল, প্রথমে পাঠানেরা জয়ী হইবে বলিয়া আশা করিয়াছিল। রণজিৎ সিংহের ইউরোপীয় সেনাপতি বেণ্টুরা ও এলার্ডও প্রথমে আফগান-দিগের আক্রমণ নিরস্ত করিতে পরাঙ্মুখ হইয়াছিলেন। এই সঙ্কটাপন্ন সময়ে

রণজিৎ সিংহ বিপক্ষের গতিরোধজন্য আপনার সৈন্যদিগকে একত্র করিতে বৃথা চেষ্টা পাইয়াছিলেন, বৃথা ঈশ্বরের ও আপনাদের গুরুর পবিত্র নাম উচ্চারণ করিয়া সৈন্যদিগকে অগ্রসর হইতে অনুরোধ করিয়াছিলেন, বৃথা অশ্ব হইতে অবতরণ পূর্ব্বক নিষ্কোশিত তরবারি হস্তে করিয়া, ভৈরব রবে সৈন্যদিগকে তাঁহার পশ্চাদ্বর্ত্তী হইতে আদেশ দিয়াছিলেন। তাঁহার সেই অপূর্ব্ব বিক্রমে, অপূর্ব্ব স্থিরতায় ও অপূর্ব্ব সাহসে কোনও ফল হয় নাই। রণজিৎ সিংহ অবশেষে হতাশ হইয়া পড়িলেন, সৈন্যদিগকে যুদ্ধে প্রায় বিমুখ দেখিয়া ক্ষোভে ও রোষে একাকীই তরবারি আস্ফালন করিতে করিতে বিপক্ষের ব্যূহমধ্যে প্রবেশ করিতে উদ্যত হইলেন। এমন সময়ে "ওয়া গুরুজি কি ফতে" এই আশ্বাসবাক্য তাঁহার কর্ণগোচর হইল; এ বাক্য দূরাগত বজ্র-নির্ঘোষের ন্যায় গম্ভীর রবে তাঁহার হৃদয়ে প্রবেশ করিয়া, একবারে আশা, ভরসা ও আনন্দের তরঙ্গ তুলিয়া দিল। রণজিৎ সিংহ সবিস্ময়ে বিস্ফারিত-চক্ষে চাহিয়া দেখিলেন, ফুলাসিংহ নীলবর্ণের পতাকা উড়াইয়া পাঁচ শত মাত্র অকালীসৈন্যের সহিত "ওয়া গুরুজি কি ফতে" শব্দ করিতে করিতে সেই বহুসংখ্য পাঠান-সৈন্যের বিরুদ্ধে অগ্রসর হইতেছেন। তিনি ফুলা-সিংহকে বিপক্ষের গুলির আঘাতে অশ্ব হইতে ভূপতিত হইতে দেখিয়া-ছিলেন। এই আঘাতে ফুলাসিংহের হাঁটু ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল। লোকে তাঁহাকে ধরিয়া যে, স্থানান্তরিত করিয়াছিল, রণজিৎ সিংহ তাহাও দেখিতে পাইয়াছিলেন। এ বার তিনি দেখিলেন, ফুলাসিংহ হস্তীতে আরোহণ করিয়া বিপুল উৎসাহের সহিত আপনার সৈন্য চালনা করিতেছেন। গুলির আঘাতে তাঁহার দেহ ক্ষত বিক্ষত হইয়াছে, তাহাতে ভ্রূক্ষেপ নাই, প্রশস্ত ললাটে ভীতি-ব্যঞ্জক রেখার আবির্ভাব নাই, বিস্তৃত লোচন-দ্বয়ে দুশ্চিন্তা বা নিরাশা-সূচক কালিমার আবেশ নাই। ফুলাসিংহ হস্তীর উপর হইতে নির্ভয়ে জলদগম্ভীর স্বরে কহিতেছেন, "ওয়া গুরুজি কি ফতে।" তাঁহার সৈন্যগণ গুরু গোবিন্দ-সিংহের মন্ত্রপূত—এই প্রাতঃস্মরণীয় বাক্যে উৎসাহিত হইয়া পাঠান সৈন্য নির্ম্মূল করিতে অগ্রসর হইতেছে। ফুলাসিংহের এই তেজস্বিতা দেখিয়া পঞ্চনদের অধীশ্বর প্রীত, চমৎকৃত ও আশ্বাসযুক্ত হইলেন। কে বলে গুরু গোবিন্দসিংহের মৃত্যু হইয়াছে? কে বলে গুরু গোবিন্দসিংহের মহাপ্রাণতা

তাঁহার দেহের সহিত চিরদিনের জন্য বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে? খ্রীঃ উনবিংশ শতাব্দীতে—নওশেরার এই পবিত্র যুদ্ধক্ষেত্রেও গোবিন্দসিংহ বর্ত্তমান রহিয়াছেন, তদীয় জীবন্ত উৎসাহপূর্ণ বাক্য এ সমরভূমিতেও তাঁহার প্রতিষ্ঠিত সম্প্রদায়কে মাতাইয়া তুলিয়াছে। ফুলাসিংহ আজ গুরু গোবিন্দের মহাপ্রাণতায় মহিমান্বিত হইয়া তাঁহার মন্ত্রপূত শোণিত অকলঙ্কিত রাখিতে উদ্যত হইয়াছেন। এ বিনশ্বর জগতে শিখ-গুরুর এ মহিমার বিলয় হইবে না। মহারাজ রণজিৎ সিংহ ফুলাসিংহকে পাঠানের ব্যূহভেদে অগ্রসর দেখিয়া অসামান্য বিক্রমে যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন। এ বার ফুলাসিংহের পরাক্রম পাঠানেরা সহিতে পারিল না। অকালীরা মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে যবনসৈন্য নির্ম্মূল করিতে লাগিল। ক্রমে রণজিৎ সিংহের অপরাপর সৈন্য আসিয়া অকালীদিগের সহিত সম্মিলিত হইল। ফুলাসিংহ যে হস্তীতে ছিলেন, তাহার মাহুতের শরীরে একে একে তিনটি গুলি প্রবেশ করিয়াছিল। ফুলাসিংহ নিজেও একটি গুলিতে আহত হইয়াছিলেন। তথাপি তিনি দৃঢ়তার সহিত শত্রুর মধ্যে হাতী চালাইতে মাহুতকে আদেশ দিলেন। আহত মাহুত এ বার আদেশ পালনে অসম্মত হইল। ফুলাসিংহের পুনঃ পুনঃ আদেশেও মাহুত যখন অগ্রসর হইল না, তখন ফুলাসিংহ সক্রোধে মাহুতের মস্তক লক্ষ্য করিয়া পিস্তল ছুড়িলেন, মাহুত পড়িয়া গেল। ফুলাসিংহ হস্তস্থিত তরবারির অগ্রভাগ দ্বারা হস্তী চালনা করিয়া, শত্রুর মধ্যে উপস্থিত হইয়া, সৈন্যদিগকে উৎসাহিত করিতে লাগিলেন। এই সময়ে শত্রুপক্ষের একটি গুলি আসিয়া তাঁহার ললাটে প্রবিষ্ট হইল। বীর-কেশরী এ আঘাত হইতে পরিত্রাণ পাইলেন না। তাঁর প্রাণশূন্য দেহ হাওদার মধ্যে পড়িয়া গেল। অধিনায়কের মৃত্যুতে অকালীগণ ছত্রভঙ্গ হইল না। তাহারা পূর্ব্বাপেক্ষা সহসসহকারে বিপক্ষদিগকে আক্রমণ করিল। আফগান সৈন্য এ আক্রমণে স্থির থাকিতে না পারিয়া রণক্ষেত্র হইতে পলায়ন করিল। নওশেরার সমরক্ষেত্রে ফুলাসিংহের লোকাতীত পরাক্রমে বিজয়-লক্ষ্মী পঞ্জাব-কেশরীর অঙ্কশায়িনী হইলেন।

পাঠানেরা যারপরনাই বিস্ময়ের সহিত ফুলাসিংহের এই লোকাতীত বীরত্বের প্রশংসা করিয়াছিল। যে স্থলে ফুলাসিংহের মৃত্যু হয়, সে স্থলে একটি স্তম্ভ নির্ম্মিত হইয়াছিল। এই স্থান হিন্দু ও মুসলমান, উভয়েরই

পরম পবিত্র তীর্থের মধ্যে পরিগণিত হয়। হিন্দু ও মুসলমান, উভয় সম্প্রদায়ই এই পবিত্র তীর্থে সমাগত হইতেন এবং উভয় সম্প্রদায়ই ভক্তিরসার্দ্রহৃদয়ে ফুলাসিংহের উদ্দেশে স্তুতিবাদ করিতেন। যত দিন একচক্ষু বৃদ্ধ শিখ-ভূপতি জীবিত ছিলেন, তত দিন যখন নওশেরার যুদ্ধের প্রসঙ্গে ফুলাসিংহের কথা উঠিত, তখনই তাঁহার উজ্জ্বল চক্ষুটি উজ্জ্বলতর হইত, এবং তাহা হইতে অবিরল-ধারায় মুক্তাফল বাহির হইয়া গণ্ডদেশে পড়িত। বীর-ভক্ত বীর-কেশরী এইরূপ পবিত্র শোকাশ্রুতে ফুলাসিংহের পরলোকগত পবিত্র আত্মা সন্তৃপ্ত করিতেন।

রণজিৎ সিংহ জাতি-প্রতিষ্ঠার বলে এইরূপ দুর্জ্জেয় হইয়া পঞ্জাব শাসন করেন। তাঁহার অধিকার তদীয় রাজধানী লাহোর হইতে উত্তরে কাশ্মীর, পশ্চিমে পেশাবর, দক্ষিণে মুলতান এবং পূর্ব্বে শতদ্রু পর্য্যন্ত প্রসারিত হয়, আর তাঁহার যুদ্ধ-কুশল সৈন্যগণ ইউরোপীয় প্রণালী অনুসারে শিক্ষা পাইয়া বীরেন্দ্র-সমাজের বরণীয় হইয়া উঠে। রণজিৎ সিংহ ইঙ্গরেজদিগের সহিত সন্ধি-সূত্রে আবদ্ধ ছিলেন। তিনি মহাবলপরাক্রান্ত হইলেও ইঙ্গরেজ-দিগের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিয়া পবিত্র মিত্রতা কলঙ্কিত করেন নাই।

রণজিতের জীবনীলেখক বলিয়াছেন, 'রণজিৎ সিংহ যথার্থ সিংহের মত ছিলেন, এবং সিংহের মতই ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছেন।' এই সিংহ-বিক্রম মহাবীরের সমস্ত কথা এ স্থলে আনুপূর্ব্বিক বিবৃত করা সম্ভাবিত নহে। যাঁহারা যথানিয়মে সুশিক্ষা পাইয়া জগতের সমক্ষে আপনাদের অসাধারণ প্রভাব বিস্তার করিয়াছেন, তাঁহাদের সহিত এই মহাপুরুষের তুলনা করাও উচিত নহে। রণজিৎ সিংহের সাহস, ক্ষমতা ও বুদ্ধি অন্যের প্রদত্ত শিক্ষায় পরিস্ফুট হয় নাই। এগুলি আপনা হইতেই বিকাশ পাইয়াছিল। রণজিৎ সিংহ আপনার এই স্বভাবসিদ্ধ প্রতিভা ও দক্ষতার গুণে জগতের মধ্যে মহৎ লোকের সম্মানিত পদে অধিরূঢ় হইয়াছিলেন। আপনার সৈন্যদিগকে সুশিক্ষিত ও রণ-পারদর্শী করা তাঁহার সর্ব্বপ্রধান কর্ত্তব্য কার্য্য ছিল। তিনি এই কর্ত্তব্য কার্য্যে কখনও ঔদাসীন্য দেখান নাই। ফরিদখাঁ সুর একাকী ব্যাঘ্র বধ করিয়া "শের" নাম্ ধারণ পূর্ব্বক দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন। অস্তাজিলো এক সময়ে এই-

রূপ সাহস দেখাইয়া, "শের আফগান" নাম পরিগ্রহ পূর্ব্বক অতুল লাবণ্যবতী নুরজাহানের সহিত পরিণয়-সূত্রে আবদ্ধ হইয়াছিলেন। ইতিহাস এই দুই বীরের, এই সাহসের কথায় আজ পর্য্যন্ত সকলের বিস্ময় জন্মাইতেছে। কিন্তু রণজিতের সাহসী শিখ সৈন্য মৃগয়ার সময়ে একাকী পশুরাজ সিংহের সহিত যুদ্ধ করিয়া, তাহার ক্ষমতা পর্য্যুদস্ত করিতেও কাতর হয় নাই। তাহারা ইহা অপেক্ষাও অধিকতর সাহস ও ক্ষমতা দেখাইয়াছে; তাহারা অশ্বারোহণে, অস্ত্রসঞ্চালনে এবং শত্রুপক্ষের ব্যূহ-ভেদে, পৃথিবীর যে কোন যুদ্ধবীরের তুল্য যোগ্যতা প্রদর্শন করিয়াছে।

বস্তুতঃ রণজিৎ সিংহ বীর-লীলাস্থল ভারতের যথার্থ বীরপুরুষ। খ্রীঃ অষ্টাদশ শতাব্দীতে ভারতবর্ষে তাঁহার ন্যায় বীরপুরুষের আবির্ভাব হয় নাই। হিন্দুরাজ-চক্রবর্ত্তী পৃথ্বীরাজ যখন তিরৌরীর পবিত্র ক্ষেত্রে পাঠানদিগকে পরাজিত ও দূরীভূত করিয়াছিলেন, এবং শেষে যখন পুণ্যসলিলা দৃষদ্বতীর তটে গরীয়সী জন্মভূমির জন্য চিরনিদ্রায় অভিভূত হইয়াছিলেন, তখন তাঁহার বীরত্বে শত্রুর হৃদয়েও বিস্ময়ের আবির্ভাব হইয়াছিল, অদীন-পরাক্রম প্রতাপসিংহ যখন ভারতের থর্ম্মাপলী পুণ্যপুঞ্জময় মহাতীর্থ হল্‌দিঘাটে স্বদেশীয়গণের শোণিত-তরঙ্গিণীর তরঙ্গোচ্ছ্বাস দেখিয়াও ধীরগম্ভীরস্বরে কহিয়াছিলেন, "এই ভাবে দেহবিসর্জ্জনের জন্যই রাজপুতগণ জন্মগ্রহণ করিয়াছে", তখন তাঁহার লোকাতীত মহাপ্রাণতা ও স্বদেশের জন্য তাঁহার অনির্ব্বচনীয় আত্মত্যাগ দেখিয়া বিধর্ম্মী শত্রুও শতমুখে তদীয় প্রশংসা-গীতি গাহিয়াছিল, আবার মহাবিক্রম শিবজী যখন পর্ব্বত হইতে পর্ব্বতে যাইয়া, বিজয়-ভেরীর গভীর নিনাদে নিদ্রিত ভারতকে জাগাইয়াছিলেন, তখন ভারতের অদ্বিতীয় সম্রাট্‌ও তাঁহার অপূর্ব্ব দেশভক্তি ও অপূর্ব্ব বীরত্বে মোহিত হইয়াছিলেন। ভারতভূমি এক সময়ে এইরূপ বীরপুরুষগণের অনন্ত মহিমায় গৌরবান্বিত হইয়াছিল, উত্তর ও দক্ষিণ, পূর্ব্ব ও পশ্চিম, এক সময়ে এই বীরপুরুষগণের অনন্ত ও অক্ষয় কীর্ত্তির কাহিনী ঘুষিয়া বেড়াইয়াছিল। কিন্তু এই বীরত্ব-বৈভব শিবজীর সহিতই তিরোহিত হয় নাই। যে বীর্য্য-বহ্নির উজ্জ্বল স্ফুলিঙ্গে ভারতের যবনরাজগণের হৃদয় দগ্ধ হইয়াছিল, তাহা এই মহাশক্তির ভক্ত শক্তিশালী ভূপতির সঙ্গে সঙ্গেই নিবিয়া যায় নাই।

শিবজীর পর গুরু গোবিন্দসিংহের মহামন্ত্রে সঞ্জীবিত হইয়া, রণজিৎ সিংহ আবার ভারতে এই মহাশক্তির উদ্বোধন করিয়াছিলেন, আবার চারি দিকে বীরত্বমহিমা প্রসারিত করিয়া ভৈরব রবে সকলকে মাতাইয়া তুলিয়াছিলেন।

নানা স্থানে নানা যুদ্ধে ব্যাপৃত থাকাতে মহারাজ রণজিৎ সিংহ সাতিশয় কষ্ট-সহিষ্ণু হইয়া উঠিয়াছিলেন। এই সহিষ্ণুতা প্রযুক্ত তিনি প্রখর আতপ, দুরন্ত শীত, প্রবল বায়ু বা ঘোরতর বর্ষা, কিছুতেই দৃক্‌পাত করিতেন না। পঞ্জাবে প্রাধান্যস্থাপনে, আফগানিস্তানে আত্মগৌরবসংরক্ষণে, তাঁহাকে প্রতিকূল প্রকৃতির সহিতও সংগ্রাম করিতে হইয়াছিল। এইরূপ নানা অমিতাচারে ১৮৩৪ অব্দে তাঁহার রোগের সঞ্চার হয়। তিনি এই রোগে কিছু কাল অচৈতন্য অবস্থায় থাকেন। শেষে রোগের শান্তি হইল বটে, কিন্তু উহার প্রভাবে তাঁহার পক্ষাঘাত জন্মিল। তিনি অচল হইয়া পড়িলেন। তাঁহার বাক্‌শক্তিরোধ হইল। তিনি কেবল অঙ্গুলি-সঙ্কেত দ্বারা আপনার অভাব ও আপনার অভিপ্রায় জানাইতেন। কিন্তু এ অবস্থাতেও তাঁহার তেজস্বিতা অন্তর্হিত হয় নাই, সাহস ও উদ্যম পর্য্যুদস্ত হইয়া যায় নাই। এ অবস্থাতেও তিনি আপনার অসাধারণ মানসিক ক্ষমতা, অবিচলিত তেজস্বিতা এবং অপরিমেয় সাহস ও উদ্যম দেখাইয়া সকলকে বিস্মিত করিয়া তুলিয়াছিলেন। কিছু কাল পরে রণজিৎ হস্ত পদ চালনা করিতে সমর্থ হইলেন বটে,কিন্তু বাক্‌শক্তি লাভ করিতে পারিলেন না। দুরন্ত রোগের কঠোর পীড়নে তাঁহার দেহ এইরূপ শিথিল হইয়াছিল, তথাপি তিনি অশ্বারোহণে মৃগয়ার আমোদে পরিতৃপ্ত হইতেন। ফিরোজপুরে একদা তিনি অপরের সাহায্যে অশ্বে আরোহণ করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার হস্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছিল, সুতরাং তিনি চির-ব্যবহৃত তরবারি বা চিরাভ্যস্ত বন্দুক ধরিতে পারিলেন না। রোগের এইরূপ কঠোর আক্রমণে, জীবনী-শক্তির এইরূপ অন্তর্ধানেও তিনি একাগ্রতা ও অটলতা হইতে স্খলিত হইলেন না। তাঁহার উজ্জ্বল চক্ষুটি উজ্জ্বলতর হইল। তিনি অস্ত্র পরিগ্রহ না করিয়াও, অশ্বারোহণে আপনার লোকাতীত মানসিক শক্তির পরিচয় দিতে লাগিলেন। মহারাজ রণজিৎ সিংহ এইরূপ বীরপুরুষ ছিলেন। এইরূপ তেজস্বিতা ও এইরূপ দৃঢ়তা তাঁহাকে মহাবীরের সম্মানিত পদে স্থাপিত করিয়াছিল। কিন্তু মহাবীর

দুরন্ত রোগের কঠোর আক্রমণ হইতে বিমুক্ত হইলেন না। রোগ ক্রমে প্রবল হইল। ভারতের অসাধারণ বীরপুরুষ ১৮৩৯ অব্দের ৩০এ জুন ইহ-লোক হইতে অন্তর্হিত হইলেন।

মহারাজ রণজিৎ সিংহ দেখিতে খর্ব্বকায় ছিলেন। তাঁহার চক্ষুটি বৃহৎ ও উজ্জ্বল ছিল। যখন তিনি উত্তেজিত হইয়া উঠিতেন, তখন এই চক্ষু হইতে যেন অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বাহির হইত। সে অপূর্ব্ব জ্বালাময়ী দৃষ্টি যাহার উপর পতিত হইত, সেই কম্পিত হইয়া উঠিত। এই উজ্জ্বল চক্ষুই তাঁহার একাগ্রতা ও তাঁহার তেজস্বিতার অদ্বিতীয় পরিচয়-স্থল ছিল। তিনি যখন আমোদ করিতেন, তখন দর্শকগণ তাঁহার প্রশান্ত মূর্ত্তি দেখিয়া পরিতৃপ্ত হইত। তাঁহার সহাস্যমুখ প্রীতিকর ও তাঁহার বাক্‌চাতুরী হৃদয়গ্রাহিণী ছিল। তিনি অনর্গল বক্তৃতা করিতে পারিতেন। তাঁহার কথনও কোন কথার অভাব লক্ষিত হইত না। অশ্বারোহণে, সামরিক কার্য্যানুষ্ঠানে তাঁহার বিশেষ আগ্রহ ছিল। সমরে তিনি সকলের অগ্রে থাকিতেন, এবং পশ্চাদ্‌গমন-সময়ে সকলের পশ্চাতে থাকিয়া অভয় দিতেন। তাঁহার সমগ্র জীবন কেবল যুদ্ধ-কার্য্যেই অতিবাহিত হইয়াছিল। তিনি এই যুদ্ধময় জীবনে কখনও কোনরূপ ভয়ের পরিচয় দেন নাই। উৎসব ব্যতীত তিনি সমৃদ্ধ বেশে সজ্জিত হইতেন না। উৎসবসময়ে তাঁহার বহুমূল্য পরিচ্ছদে জগদ্‌বিখ্যাত কোহিনূর শোভা বিকাশ করিত। তিনি প্রত্যূষে শয্যা হইতে উঠিতেন, এবং অশ্বারোহণে দুই এক ঘণ্টা ভ্রমণ করিয়া, রাজকার্য্যে মনোনিবেশ করিতেন। বেলা আটটার সময় তাঁহার আহার হইত। দুই প্রহর পর্য্যন্ত তিনি শাসন-সংক্রান্ত কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিতেন। প্রাতঃকালীন ভোজনের সময়ের দিকে রণজিৎ সিংহের বিশেষ দৃষ্টি ছিল। তিনি কখনও ঐ সময় অতিক্রম করিয়া আহার করিতেন না। একদা মহারাজ রণজিৎ সিংহ গবর্ণর জেনে-রল লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্কের পার্শ্বে বসিয়া সৈন্য পরিদর্শন করিতেছিলেন, ইহার মধ্যে ভোজন-সময় উপস্থিত হওয়াতে তিনি আসন হইতে উঠিয়া গেলেন এবং যথাসময়ে ভোজন সমাপ্ত করিয়া, আবার গবর্ণর জেনেরলের পার্শ্বে বসিয়া সৈন্য পরিদর্শন করিতে লাগিলেন।

সর্ব্বদা যুদ্ধে ব্যাপৃত থাকাতে রণজিৎ সিংহ শাস্ত্রালোচনার অবসর পাই-

তেন না। কিন্তু তিনি বিদ্যার সমাদর করিতেন। শিখগুরুগণ বেশভূষায় সজ্জিত হইয়া তাঁহাকে পবিত্র গ্রন্থ পাঠ করিয়া শুনাইতেন। রণজিৎ সিংহ মৃগয়াপ্রিয় ছিলেন। মৃগয়ার আমোদে তাঁহার অনেক সময় অতিবাহিত হইত। তিনি সুকুমারমতি বালকদিগের ক্রীড়াকৌতুক দেখিতে ভাল বাসিতেন। তাঁহার সর্দ্দারদিগের অনেক সন্তান তাঁহার সমক্ষে শিক্ষিত হইত। অশ্বারোহণে, অস্ত্র-সঞ্চালনে তিনি ইহাদিগকে সুনিপুণ করিয়া তুলিতেন। কেহ কোনরূপ অলৌকিক ঘটনা বা দক্ষতা দেখাইলে রণজিৎ সিংহ তাহাকে সমুচিত পারিতোষিক দিতে উদাসীন থাকিতেন না। হরিদাস সাধু নামক এক জন যোগী চল্লিশ দিন একটি বাক্সে নিরুদ্ধ হইয়া মৃত্তিকার নীচে থাকেন। মহারাজ রণজিৎ সিংহ এই অসাধারণ যোগীকে যথোচিত পুরস্কৃত করিয়াছিলেন।

রণজিৎ সিংহ স্বরাজ্যের সকলের অভাব মোচনেই যত্নশীল ছিলেন। সকলের প্রার্থনা যাহাতে তাঁহার গোচর হয়, এই জন্য তিনি একটি গৃহে বাক্স রাখিয়াছিলেন। সকলেরই ঐ গৃহে যাইবার অধিকার ছিল। মহারাজের নিকটে যাহাদের কোন প্রার্থনা থাকিত, তাহারা আবেদন-পত্র লিখিয়া ঐ বাক্সে ফেলিয়া দিত। বাক্সের চাবি রণজিৎ সিংহ আপনার নিকটে রাখিতেন। তিনি ঐ সকল আবেদন পড়িয়া আবেদনকারীদিগের অভাব মোচন করিতেন।

রচনামালা।

পদ্যাংশ।

রামলক্ষ্মণকর্ত্তৃক সীতার অন্বেষণ।

হস্তে ধনুর্ব্বাণ রাম আইলেন ঘরে,
পথে অমঙ্গল যত দেখেন গোচরে।
বামে সর্প দেখিলেন শৃগাল দক্ষিণে,
তোলাপাড়া করেন শ্রীরাম কত মনে।
বিপরীত ধ্বনি করিলেক নিশাচর,
লক্ষ্মণ আইসে পাছে শূন্য রাখি ঘর।
মারীচের আহ্বানে কি লক্ষ্মণ ভুলিবে?
সীতারে রাখিয়া একা অন্যত্র যাইবে?
দুঃখের উপরে দুঃখ দিলেন বিধাতা,
যা ছিল কপালে তাহা দিলেন বিমাতা।
বলেন শ্রীরাম শুন সকল দেবতা,
আজিকার দিন মম রক্ষা কর সীতা।
যেমন চিন্তেন রাম ঘটিল তেমন,
আসিতে দেখেন পথে সম্মুখে লক্ষ্মণ।
লক্ষ্মণেরে দেখিয়া বিস্ময় মনে মানি,
ব্যস্ত হয়ে জিজ্ঞাসা করেন রঘুমণি।
কেন ভাই আসিতেছ তুমি যে একাকী?
শূন্য ঘরে জানকীরে একাকিনী রাখি।
প্রমাদ পাড়িল বুঝি রাক্ষস পাতকী,
জ্ঞান হয় ভাই হারাইলাম জানকী।
আইলাম করিয়া তোমারে সমর্পণ,
রাখিয়া আইলে কোথা মম স্থাপ্যধন?
মম বাক্য অন্যথা করিলে কেন ভাই?
আর বুঝি সীতার সাক্ষাৎ নাহি পাই।
কে লইল লক্ষ্মণ কি হইল আমারে,
যে দুঃখে দুঃখিত আমি কহিব কাহারে
শুন রে লক্ষ্মণ! সেই স্বর্ণের পুতুলী,
শূন্য ঘরে রাখিয়া কাহারে দিলে ডালি
দুরন্ত দণ্ডকারণ্য মহাভয়ঙ্কর,
হিংস্র জন্তু আছে কত শত নিশাচর।
কোন দণ্ডে কোন দুষ্ট পাড়িবে প্রমাদ,
কি জানি রাক্ষসগণে সাধিবেক বাদ।
এই বনে দুষ্ট জন রাক্ষসের থানা,
মুনিগণে সকলে করেন সদা মানা।
তোমারে কি দিব দোষ মম কর্ম্মফল,
যেমন বিধির লিপি ঘটিবে সকল।
আমার অধিক ভাই তব বুদ্ধিবল,
কর্ম্মযোগে হেন বুদ্ধি গেল রসাতল।
মায়ামৃগ-ছলে আমা লইল কাননে,
হের দেখ রাক্ষস পড়েছে মম রণে।

ভয়ঙ্কর বিকট মূষল ডানি হাতে,
দেখ ভাই, মারীচ পড়িয়া আছে পথে।
এইমত কহিতে কহিতে দুই ভাই,
বায়ুবেগে চলিলেন অন্য জ্ঞান নাই।
উপনীত হইলেন কুটীরের দ্বারে,
সীতা সীতা বলিয়া ডাকেন বারেবারে।
শূন্য ঘর দেখেন না দেখেন জানকী,
মূর্চ্ছাপন্ন অবসন্ন শ্রীরাম ধানুকী।
শ্রীরাম বলেন ভাই এ কি চমৎকার,
সীতা না দেখিলে প্রাণ না রাখিব আর।
তখনি বলিনু ভাই সীতা নাই ঘরে,
শূন্যঘর পাইয়া হরিল কোন চোরে।
প্রতি বন প্রতি স্থান প্রতি তরুমূল,
দেখেন সর্ব্বত্র রাম হইয়া ব্যাকুল।
পাতি পাতি করিয়া চাহেন দুই বীর,
উলটি পালটি যত গোদাবরী-তীর।
গিরিগুহা দেখেন মুনির তপোবন,
নানা স্থানে সীতারে করেন অন্বেষণ।
একবার যে স্থানে করেন অন্বেষণ,
পুনর্ব্বার যান তথা সীতার কারণ।
এইরূপে এক স্থানে যান শত বার,
তথাপি না পান দেখা শ্রীরাম সীতার।
কান্দিয়া বিকল রাম জলে ভাসে আঁখি,
রামের ক্রন্দনে কান্দে বন্য পশু পাখী।
রামের আশ্রমে আসি যত মুনিগণ,
রামেরে কহেন যত প্রবোধ-বচন।
উপদেশবাক্য নাহি মানেন শ্রীরাম,
সদা মনে পড়ে সে সীতার গুণগ্রাম।
সীতা সীতা বলিয়া পড়েন ভূমিতলে,
করেন লক্ষ্মণ বীর শ্রীরামেরে কোলে।
রঘুবীর নহে স্থির জানকীর শোকে,
হাকাকার বার বার করে দেবলোকে।
বিলাপ করেন রাম লক্ষ্মণের আগে,
ভুলিতে না পারি সীতা সদা মনে জাগে।
কি করিব কোথা যাব, অনুজ লক্ষ্মণ!
কোথা গেলে সীতা পাব কর নিরূপণ।
মন বুঝিবারে বুঝি আমার জানকী,
লুকাইয়া আছেন লক্ষ্মণ দেখ দেখি।
বুঝি কোন মুনি-পত্নী সহিত কোথায়,
গেলেন জানকী না জানাইয়া আমায়।
গোদাবরী-তীরে আছে কমলকানন,
তথা কি কমলমুখী করেন ভ্রমণ।
পদ্মালয়া পদ্মমুখী সীতারে পাইয়া,
রাখিলেন বুঝি পদ্মবনে লুকাইয়া।
চিরদিন পিপাসিত করিয়া প্রয়াস,
চন্দ্রকলা-ভ্রমে রাহু করিল কি গ্রাস?
রাজ্যচ্যুত আমাকে দেখিয়া চিন্তান্বিতা,
হরিলেন পৃথিবী কি আপন দুহিতা?
রাজ্যহীন যদ্যপি হয়েছি আমি বটে,
রাজলক্ষ্মী তথাপি ছিলেন সন্নিকটে।
আমার সে রাজলক্ষ্মী হারাইল বনে,
কৈকয়ীর মনোভীষ্ট সিদ্ধ এতক্ষণে।
সৌদামিনী যেমন লুকায় জলধরে,
লুকাইল তেমন জানকী বনান্তরে।
কণকলতার প্রায় জনকদুহিতা,
বনে ছিল কে করিল তারে উৎপাটিতা।

দিবাকর নিশাকর দীপ্ত তারাগণ,
দিবানিশি করিতেছে তম নিবারণ।
তারা না হরিতে পারে তিমির আমার,
এক সীতা বিহনে সকল অন্ধকার।
দশ দিক শূন্য দেখি সীতার অভাব,
সীতা বিনা অন্য নাহি হৃদয়ের ভাব।
দেখ রে লক্ষ্মণ ভাই! কর অন্বেষণ,
সীতারে আনিয়া দেহ বাঁচাও জীবন।
আমি জানি পঞ্চবটী! তুমি পুণ্যস্থান,
তেঁই সে এ স্থানে আমি করি অবস্থান।
তাহার উচিত ফল দিলে হে আমারে,
শূন্য দেখি তপোবন সীতা নাহি ঘরে।
শুন শুন মৃগ পক্ষী, শুন বৃক্ষলতা!
কে হরিল আমার সে চন্দ্রমুখী সীতা?
কান্দিয়া কান্দিয়া রাম ভ্রমেণ কানন,
দেখিলেন পথমধ্যে সীতার ভূষণ।
দেখিলেন পড়ে আছে ভগ্ন রথচাকা,
কনকরচিত আছে পতিত পতাকা।
রথচূড়া পড়িয়াছে শেল আর আঠি,
মণি মুক্তা পড়িয়াছে সুবর্ণের কাঁটি।
শ্রীরাম বলেন, দেখ ভাই রে লক্ষ্মণ!
এই স্থানে সীতারে করহ অন্বেষণ।
সম্মুখে পর্ব্বত বড় অতি উচ্চ দেখি,
লুকাইয়া পর্ব্বতে রাখিল চন্দ্রমুখী।
যমদণ্ড সম আমি ধরি ধনুর্ব্বাণ,
পর্ব্বত কাটিয়া আজি করি খান খান।
মহাযুদ্ধ হইয়াছে করি অনুমান,
লক্ষ্মণ! লক্ষণ তার দেখ বিদ্যমান।
লক্ষ্মণ বলেন ইহা নহে কোন মতে,
সীতা কেন রহিবেন এ ঘোর পর্ব্বতে।
পর্ব্বত কাটিতে প্রভু চাহ অকারণ,
সীতা লৈয়া অন্তরীক্ষে গেল কোনজন।
নানামত শ্রীরামেরে বুঝান লক্ষ্মণ,
শোকাকুল শ্রীরাম না মানেন বচন।
ধনুকে দিলেন গুণ সর্প হেন গর্জ্জে,
বলেন দহিব বিশ্ব আছে কোনকার্য্যে।
বিশ্ব পোড়াইতে রাম পূরেন সন্ধান,
দক্ষযজ্ঞ বিনাশে যেমন মহেশান।
লক্ষ্মণ চরণে ধরি করেন মিনতি,
এক কথা অবধান কর রঘুপতি!
সৃষ্টিকর্ত্তা সৃষ্টি করিলেন চরাচর,
কেন সৃষ্টি নষ্ট কর দেখ রঘুবর।
সবংশে মরিবে যে হইবে অপরাধী,
অপরাধে একের অন্যেরে নাহি বধি।
তোমার বাণেতে কারো নাহিক নিস্তার
অকারণে কেন প্রভু পোড়াও সংসার
কোথায় আছেন সীতা করহ বিচার,
দুই ভাই অন্বেষণ করিব সীতার।
গ্রাম আর তপোবন পর্ব্বতশিখর,
নদ নদী দেখি আর দীঘি সরোবর।
তবে যদি সীতার না পাই দরশন,
পশ্চাতে করিব চেষ্টা যেবা লয় মন।
শুনি অস্ত্র সম্বরিয়া রাখিলেন তূণে,
সীতার উদ্দেশে চলিলেন দুই জনে।
ক্ষণেক উঠেন রাম, বৈসেন ক্ষণেক,
যেমন উন্মত্ত, রাম বলেন অনেক।

জলে স্থলে অন্তরীক্ষে করেন উদ্দেশ,
বনে বনে ভ্রমিয়া অনেক পান ক্লেশ।
যাইতে দেখেন যাকে জিজ্ঞাসেন তাকে,
দেখিয়াছ তোমরা কি এপথে সীতাকে ?
ওহে গিরি ! এ সময়ে কর উপকার,
কহিয়া বাঁচাও জানকীর সমাচার।
হে অরণ্য তুমি ধন্য ! অন্য বৃক্ষগণ,
কহিয়া সীতার কথা রাখহ জীবন।
এইরূপে শ্রীরাম ভ্রমেণ চতুর্দ্দিকে,
রক্তে রাঙ্গা জটায়ুকে দেখেন সম্মুখে !
পক্ষীকে কহেন রাম করি অনুমান,
খাইলি সীতারে তুই, বধি তোর প্রাণ।
পক্ষিরূপে এসেছিলি তুই নিশাচর,
পাঠাইব এক বাণে তোরে যমঘর।
সন্ধান পূরেন রাম তাকে মারিবারে,
মুখে রক্ত উঠে বীর বলে ধীরে ধীরে।
অন্বেষিয়া সীতারে পাইলে বহু ক্লেশ,
এই দেশে না পাইবে সীতার উদ্দেশ।
সীতার লাগিয়া রাম আমার মরণ,
সীতারে লইয়া লঙ্কা গেল যে রাবণ।
দুই ভাই তোমা যবে নাহি ছিলে ঘরে,
শূন্য ঘর পাইয়া হরিল লঙ্কেশ্বরে।
আমি বৃদ্ধ তবু যুদ্ধে রুদ্ধ করি তায়,
রাখিয়াছিলাম রাম! তোমার আশায়।
দুই পাখা কাটিলেক পাপিষ্ঠ রাবণ,
মুখে রক্ত উঠে রাম ! যায় এ জীবন।
ইতস্ততঃ ভ্রমণে নাহিক প্রয়োজন,
চিন্তা কর রাম ! যাতেমরিবে রাবণ।
তোমার পিতার মৈত্র তোমা লাগি মরি,
আপনি মারিলে রাম কি করিতে পারি।
প্রাণ আছে তোমারে করিতে দরশন,
সম্মুখে দাঁড়াও রাম ! দেখি চন্দ্রানন।
আপনা নিন্দেন রাম জানি পরিচয়,
দুই ভাই রোদন করেন অতিশয়।
জটায়ু বলেন যত লিখিব তা কত,
রামের নয়নে বহে বারি অবিরত।
শ্রীরাম বলেন পক্ষী তুমি মম বাপ,
কহিয়া সীতার বার্ত্তা দূর কর তাপ।
রাবণের সঙ্গে মম নাহিক বৈরতা,
বিনা দোষে হরিলেক আমার বনিতা।
কোনবংশে জন্ম তার বৈসে কোন্‌পুরে ?
কোন্ দোষে হরিলেক, বল, জানকীরে।
অনেক শক্তিতে পক্ষী তুলিলেন মাথা,
কহিতে লাগিলেন রামেরে সর্ব্ব কথা।
সংহারিলে চতুর্দ্দশ সহস্র রাক্ষস,
লক্ষ্মণ কারণ সূর্পণখার অযশ।
এই কোপে রাবণ হরিল জানকীরে,
রাখিল লঙ্কায় লয়ে সমুদ্রের তীরে।
পুত্র বিশ্বশ্রবার রাবণ বড় রাজা,
বিধাতার বরেতে হইল মহাতেজা।
কোন চিন্তা না করিহ সম্বর ক্রন্দন,
জানকীরে উদ্ধারিবে মারিয়া রাবণ।
তব পাদোদক রাম দেহ মম মুখে,
সকল কলুষ নাশি যাই পরলোকে।

রামের স্বদেশে প্রত্যাগমন।

রাম আইল দেশে আনন্দ সবাকার,
শুনিয়া কৈকেয়ী রাণী শুভ সমাচার,
অভিমানে কৈকেয়ী বারিপূর্ণ আঁখি,
কথা কি কবেন রাম মা বলিয়া ডাকি;
যদি রাম পূর্ব্বমত করে সম্ভাষণ,
রাখিব এ দেহ নহে ত্যজিব জীবন।
এতেক ভাবিয়া রাণী হৈল অধোমুখ,
করেতে রাখিল এক বিষের লাড়ুক।
যদি রাম মা বলিয়া না ডাকে আমারে,
ত্যজিব এ পাপ প্রাণ বিষপান করে।
এত বলি অভিমানে রহিলেন রাণী,
অন্তরে জানিল তাহা রাম রঘুমণি।
হইল ব্যথিত প্রাণ সতায়ের তরে,
আগেতে চলিল রাম কৈকেয়ীর ঘরে।
ধূলায় বসিয়া রাণী বিরসবদন,
হেন কালে রাম গিয়া বন্দিল চরণ,
কৈকেয়ীরে শ্রীরাম কহেন যোড়করে,
দেশেতে আইনু মাতা চৌদ্দ বর্ষ পরে।
অরণ্যেতে পড়েছিলাম অনেক প্রমাদে,
উদ্ধার হয়েছি সবে তব আশীর্ব্বাদে।
লজ্জা পেয়ে কৈকেয়ী কহেন রঘুনাথে,
কোনদোষেদোষী আমিতোমার অগ্রেতে,
বনে গেলে দেবতার কার্য্যসিদ্ধি লাগি,
আমারে করিলে কেন নিমিত্তের ভাগী।
তুমি গোলোকের পতি জানে এসংসার,
অবতার হয়েছ হরিতে ক্ষিতিভার।
সংসারের সার তুমি কে চিনিতে পারে?
সূর্য্যবংশ পবিত্র তোমার অবতারে।
অরি মারি দেবতার বাঞ্ছা পূরাইলি,
আমার মাথায় দিয়ে কলঙ্কের ডালি।
বাছা রাম! বলি তোকে আর এক কথা,
এত যে দিতেছ দুঃখ জানিয়া বিমাতা,
চিরকাল ভরতে অধিক স্নেহ করি,
কুবোল বলিনু মুখে, তোমার চাতুরী।
সর্ব্বঘটে স্থায়ী তুমি সুখদুঃখদাতা,
এতেক দুর্গতি কৈলে জানিয়া বিমাতা।
লজ্জিত হইয়া রাম হেঁট কৈল মাথা,
যোড়হাত করি রাম কহিতেছে কথা।
কৈকেয়ীরে তোষে রাম বিনয়বচনে,
তব দোষ নাহি মাতা দৈব নির্ব্বন্ধনে।
কালেতে সকলি হয় বিধির নির্ব্বন্ধ,
তোমার প্রসাদে বধিলাম দশস্কন্ধ।
তোমা হৈতে পাইলাম সুগ্রীব সুমিত,
সঙ্কটেতে সুগ্রীব করিল বড় হিত।
তোমার প্রসাদে করি সাগর বন্ধন,
রাবণ মারিয়া তুষিলাম দেবগণ।
জানিলাম লক্ষ্মণের যতেক ভকতি,
জানিলাম সীতাদেবী পতিব্রতা সতী।
তোমা হৈতে ধর্ম্মাধর্ম্ম জানিলাম মাতা,
এইবাক্যে কৈকেয়ী দ্বিগুণ পাইল ব্যথা।
সকলে আনন্দ হৈল রাম দরশনে,
আনন্দে রহিলা রাম মাতুল-ভবনে।

কৃত্তিবাস।

ফুল্লরার বারমাসের দুঃখ।

পাশেতে বসিয়া রামা কহে দুঃখবাণী,
ভাঙ্গা কুঁড়িয়া, তালপাতার ছাওনী।
ভেরেণ্ডার থামা মোর আছে মধ্যঘরে,
প্রথম আষাঢ়ে ঘর নিত্য পড়ে ঝড়ে।
কহিতে দুঃখের কথা চক্ষে পড়ে জল,
বড় বড় গৃহস্থের টুটিল সম্বল।
শ্রাবণের বরিষে ঘন দিবস রজনী,
সিতাসিত দুই পক্ষ একই না জানি।
আচ্ছাদন নাহি, অঙ্গে পড়ে মাংসজল,
কত মাছি খায় অঙ্গে মোর কর্ম্মের ফল।
শুন গো শুন গো রামা দুঃখের কাহিনী,
কত শত খায় জোঁক, নাহি খায় ফণী।
ভাদ্র মাসেতে বড় দুরন্ত বাদল,
সকলে দরিদ্র, বীর সমূলে বিফল।
কিরাত নগরে বসি না মিলে উধার,
হেন বন্ধুজন নাহি যে বা সহে ভার।
দুঃখ কর অবধান দুঃখ কর অবধান,
বৃষ্টি হইলে কুঁড়ায় ভাসিয়া যায় বান।
আশ্বিনে অম্বিকা পূজা করে জগজনে,
ছাগ মহিষ মেষ দিয়া বলিদানে।
উত্তম বসনে বেশ করয়ে বনিতা,
অভাগী ফুল্লরা করে উদরের চিন্তা।
মাংস না লয় কেহ করিয়া আদরে,
দেবীর প্রসাদমাংস সবাকার ঘরে।
কার্ত্তিক মাসেতে হইল হিমের জনম,
করয়ে সকল লোক শীত নিবারণ।
নিয়োজন কৈল বিধি সবার কাপড়,
অভাগী ফুল্লরা পড়ে হরিণের ছড়।
মাস মধ্যে অগ্রহায়ণ আপনি ভগবান,
হাটে মাঠে গোঠে গৃহে সবাকার ধান।
উদর ভরিয়া ভক্ষ্য দিল বিধি যদি,
যমসম শীত তাহে নিরমিল বিধি।
দুঃখ কর অবধান দুঃখ কর অবধান,
জানু ভানু কৃশানু শীতের পরিত্রাণ।
পৌষে প্রবল শীত সুখী সর্ব্বজন,
তুলি পাড়ি পাছুড়ি শীতের নিবারণ।
তৈল তুলা তনূনপাৎ তাম্বূল তপন,
করয়ে সকল লোক শীত নিবারণ।
হরিণ বদলে পাইনু পুরাণ খোসলা।
নড়িতে সকল অঙ্গে বরিষয়ে ধূলা॥
ব্যর্থ মোর বনিতাজনম, ব্যর্থ মোর বনিতাজনম,
ধূলায় নিদ্রা নাহি হয়, শয়নে মরণ।
মাঘ মাসে অনিবার সদাই কুজ্ঝটী,
আন্ধারে লুকায় মৃগ, না পায় আখেটী।
ফুল্লরার আছয়ে কত কর্ম্মের বিপাক,
মাঘ মাসে তুলিতে নাহি অরণ্যের শাক।
সহজে শীতল ঋতু ফাল্গুন মাস,
*ভোগীর ভোগের কাল বসন্ত বাতাস।
রামা শুন মোর বাণী, রামা শুন মোর বাণী,
কোন সুখে ইছিলে হইতে ব্যাধিনী।

মধুমাসে মারুত মলয় মন্দ মন্দ,
মালতীয়ে মধুকর পীয়ে মকরন্দ।
*ভোগবিলাসেতে মগ্ন দেখ জনে জনে,
ফুল্লরার পোড়ে অঙ্গ উদরদহনে।
দুঃখ কর অবধান, দুঃখ কর অবধান,
আমানি খাবার গর্ত্ত দেখ বিদ্যমান।
অনল সমান পোড়ে বৈশাখের খরা,
চালু সেরে বান্ধা দিনু মাটিয়া পাথরা,
কারে নিবেদিব দুঃখ, কারে নিবেদিব দুঃখ,
রৌদ্রে পোড়য়ে অঙ্গ বিধাতা বিমুখ।
পাপিষ্ঠ জ্যৈষ্ঠ মাসে প্রচণ্ড তপন,
পথ পোড়ে, খরতর রবির কিরণ,
পসার এড়িয়া, জল খাইতে না পারি,
দেখিতে দেখিতে চিলে করে আধাসারি।

শ্রীমন্তের সিংহলগমনে মাতার অনুজ্ঞা।

বাছা!
যাইবে সিংহল দেশ, পাইবে বড়ই ক্লেশ,
তরণীসরণী বহু দূর।
মাস দুই তিন ব্যাজ, করিয়া রাজার কাজ,
সাধু আসিবেন নিজ পুর॥

অকারণে কর শোক, পাঠাইয়াছিলাম লোক,
কল্যাণে আছেন তোমার বাপ।
ভূপতির মনোরথে, গিয়াছেন তরণীপথে,
নিরন্তর করি মনে তাপ॥

ছিল ডিঙ্গা খান সাত, লয়ে গেল প্রাণনাথ,
এক খানি নাহি অবশেষ।
দূর সিংহলের পথ, মিথ্যা কর মনোরথ,
করিবারে পিতার উদ্দেশ॥

যদি শত কারিগর, গড়ে এক বৎসর,
তবে ডিঙ্গা হয় এক খান।

* ছাত্রদিগের উপযোগী করিবার জন্য *চিহ্নিত দুই পঙক্তি কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তিত করা হইয়াছে।

করিতে ডিঙ্গার সাজ, কেবল ধনের কাজ,
অবলার কতেক পরাণ ॥
বহু তিমি তিমিঙ্গল আছে প্রাণ-পীড়াকর
তনু যার শতেক যোজন।
কি করে টমক শিঙ্গা, পঙ্কে ছুঁয়ে লয় ডিঙ্গা,
সেই রাজ্যে সঙ্কট জীবন ॥
যাইবে সাগর বহিয়া, সে পথে না যায় নাইয়া,
পরাণসঙ্কট শোণা বায়।
শুনিতে পরাণ ফাটে, মকরে মনুষ্য কাটে,
ধিক্ যাক সিংহল উপায় ॥
জলে কুম্ভীরের ভয়, কূলে শার্দ্দূলচয়,
দুষ্ট খণ্ড শত শত পথে।
যে যায় সিংহল দেশ, সে পায় বহুত ক্লেশ,
পিতা মোর কহিয়াছে দত্তে ॥
উড়ুষ কচ্ছপগুলা, শসা হেন মশাগুলা,
জলৌকা গজের শুণ্ডাকার।
রাজা বড় পাপচিত, ছলে হরি লয় বিত,
শুনেছি দেশের দুরাচার ॥
খুল্লনা যতেক বলে, শুনি সাধু কোপে জলে,
অনুমতি না দেয় ভোজনে।
খুল্লনা সুধীরমতি, বুঝিয়া কার্য্যের গতি,
আজ্ঞা দিল সিংহলগমনে ॥

কবিকঙ্কণ মকুন্দরাম চক্রবর্ত্তী।

সাবিত্রীযম-সংবাদ।

হেন মতে সাবিত্রী সহিত সত্যবান,
অত্যন্ত কাননমাঝে করিল প্রয়াণ।
নানারূপ কৌতুক দেখিয়া দুইজন,
বহুবিধ ফল মূল কৈল আহরণ।
মুনিবাক্য মনে করি নৃপতির সুতা,
অত্যন্ত আকুলা হৈল দেখ চিন্তাযুতা।
না জানি কেমনে হবে পতির নিধন,
সত্যবান নাহি জানে এত বিবরণ।
ভ্রমণ করিয়া সুখে তুলে মূল ফল,
পাত্র পরিপূর্ণ হৈল নাহি আর স্থল।
রাখিয়া আঁকড়ি সাজি সাবিত্রীর কাছে,
কাষ্ঠ হেতু সত্যবান উঠে গিয়া গাছে।
কুঠারে কাটিল তবে বৃক্ষ সহ ডাল,
উপস্থিত হইল আসিয়া মৃত্যুকাল।
অকস্মাৎ শিরঃপীড়া হইল অস্থির,
সহস্র নাগেতে যেন দংশিলেক শির।
সত্যবান বলে শুন রাজার তনয়া,
বুঝিতে না পারি কিবা হৈল দেবমায়া।
দশ দিক অন্ধকার দেখি অকস্মাৎ,
সহস্র সহস্র শেল মারয়ে নির্ঘাত।
তনু হইতে বাহির হৈল বুঝি প্রাণ,
নিস্তার নাহিক আর হইনু অজ্ঞান।
সাবিত্রী কহিল আমি জানি পূর্ব্বকথা,
ধৈর্য্য হও এখন ঘুচিবে শিরোব্যাথা।
শয়ন করিয়া সুখে থাকহ ঠাকুর,
হইবে সকল পীড়া মুহূর্ত্তেকে দূর।
নিজ অঙ্গব-সন পাতিয়া পুণ্যবতী,
উরুতে রাখিয়া শির শোয়াইল পতি।
চেতনরহিত হৈল রাজার তনয়,
ক্রমে ক্রমে আয়ুঃশেষ হইল তথায়।
দেখিয়া নৃপতিসুতা ভাবে মনে মন,
কাল পরিপূর্ণ হৈল রাজার নন্দন।
অবশ্য আসিবে এথা কৃতান্তকিঙ্কর,
দেখিব কেমনে লয় আমার ঈশ্বর।
হেন মতে সাবিত্রী রহিল ঘোর বনে,
হেথায় ডাকিল যম যত দূতগণে।
সত্যবানে আনিতে কহিল ধর্ম্মরাজ,
আজ্ঞাতে আইল শীঘ্র দূতের সমাজ।
যথায় কাননে পড়ি নৃপতিনন্দন,
তাহার নিকটে গেল যমদূতগণ।
পরশিতে না পারিল সাবিত্রীর তেজে,
নিরস্ত হইয়া দূত কহে ধর্ম্মরাজে।
দূতমুখে ধর্ম্মরাজ পাইয়া বারতা,
আপনি আইল শীঘ্র সত্যবান্ যথা।
দেখিয়া সাবিত্রী কহে তুমি কোন জন,
ধর্ম্মরাজ বলে আমি সবার শমন।
রাজপুত্র সত্যবান এই তব স্বামী,
কাল পূর্ণ হল আজি লয়ে যাব আমি।
শুনিয়া সাবিত্রী কহে যেআজ্ঞা তোমার,
বিধাতার নির্ব্বন্ধ লঙ্ঘিতে শক্তি কার।
মায়াতে মোহিত সব কেবা কার পতি,
সবে সত্য ধর্ম্মমাত্র অখিলের গতি।

এতেক কহিয়া সতী ছাড়ে সত্যবানে,
করযোড়ে রহিল যমের বিদ্যমানে।
সত্যবান্ সমীপে আসিয়া সূর্য্যসুত,
শরীর হইতে বা'র করিল অদ্ভুত
অঙ্গুষ্ঠপ্রমাণ তনু দেখিতে সুন্দর,
বন্ধন করিয়া নিয়া চলিল সত্বর।
দেখিয়া পতির দশা হয়ে দুঃখবতী,
কিছু না কহিয়া চলে যমের সংহতি।
দেখিয়া কৃতান্ত তবে জিজ্ঞাসিল তারে,
কে তুমি, কি হেতু বল, যাবা কোথাকারে?
কালেতে হইল তব পতির মরণ,
তার জন্য বৃথা চিন্তা কর কি কারণ।
সকলের নিয়ম আছয়ে এই মত,
কালপূর্ণ হলে সবে যায় মৃত্যুপথ।
আমার বচনে ঘরে যাহ গুণবতি!
শীঘ্রগতি স্বামীর চিন্তহ ঊর্দ্ধগতি।
ধর্ম্মরাজ-মুখে শুনি এতেক উত্তর,
রাজার নন্দিনী কহে করি যোড়কর।
যে কিছু বলিছ প্রভু সব জানি আমি,
কেবা কার ভাই বন্ধু কেবা কার স্বামী।
সহজে সংসার মিথ্যা বিশেষ আমার,
মায়াপাশে কি হেতু যাইব পুনর্ব্বার।
কালপূর্ণ মরে পতি দুঃখ নাহি ভাবি,
সকলে মরিবে কেহ নহে চিরজীবী।
এইমত ব্রহ্মাণ্ডমধ্যেতে যত জন,
জনম লভিলে হয় অবশ্য মরণ।
ধর্ম্মাধর্ম্ম অনুসারে সুখদুঃখ-ভোগ,
নিজ ইচ্ছা নহে কার, বিধির সংযোগ।

আপনার স্বকর্ম্ম ভুঞ্জিবে মম পতি,
আমার কি সাধ্য করি তাঁর ঊর্দ্ধগতি।
আপনি আপন বন্ধু যদি রাখে ধর্ম্ম,
আপনি আপন শত্রু করিলে কুকর্ম্ম।
সুখ দুঃখ ধর্ম্মাধর্ম্ম সদা অনুগত,
পূর্ব্বাপর নিয়মিত আছে শাস্ত্রমত।
সে কারণে প্রাণপণে করিবেক ধর্ম্ম,
সতের সঙ্গতি হইলে করে নানা কর্ম্ম।
সংসারের সার সঙ্গ বলে মুনিগণে,
সঙ্গদোষে চোর হয় সাধু সঙ্গগুণে।
সাবিত্রীর মুখে শুনি এতেক ভারতী,
পরম সন্তুষ্ট হয়ে বলে মৃত্যুপতি।
পৃথিবীতে সাধ্বী তুমি নৃপতির সুতা,
তোমার জননী ধন্যা, ধন্য তব পিতা।
শ্রবণে শুনিনু তব বাক্য-সুধারস,
বর লহ সাবিত্রি! হইনু তব বশ।
সত্যবানে ছাড়ি তুমি মাগ অন্য বর,
যাহা ইচ্ছা মাগি লও আমার গোচর।
সাবিত্রী কহিল যদি হইলে কৃপাবান্,
অপুত্রক আছে পিতা দেহ পুত্র দান।
যম বলে তারে আমি দিনু পুত্রবর,
যাহ শীঘ্রগতি তুমি আপনার ঘর।
সাবিত্রী কহিল শুন মম নিবেদন,
তব সঙ্গ ছাড়িতে তিলেক নাহি মন।
সতের সহিত যেন কাশীর নিবাস,
আমারে করিতে চাহ ইহাতে নিরাশ।
পূর্ব্বে পিতৃপুণ্যবলে নিজ ভাগ্যবশে,
তোমা হেন গুণনিধি পাই অনায়াসে।

ইহা হইতে কর্ম্মবন্ধ না হইল ক্ষয়,
জানিনু আমারে বাম বিধাতা নিশ্চয়।
এত শুনি তুষ্ট হয়ে বলে মৃত্যুপতি,
অমৃত অধিক শুনি তোমার ভারতী।
পুনঃ পুনঃ আনন্দ জন্মাহ মম মনে,
বর মাগ বিনা সত্যবানের জীবনে।
সাবিত্রী কহিল, যদি কৃপা হৈল মোরে,
শ্বশুর আছেন অন্ধ, চক্ষু দেহ তাঁরে।
শমন কহেন চক্ষু হইবে তাঁহার,
রজনী অধিক হয়, যাও নিজাগার।
রাজার নন্দিনী কহে, সব জান তুমি,
সংসার-বাসনা কভু নাহি করি আমি।
না চাহি তনয় বন্ধু, নাহি চাহি পতি,
আজ্ঞা কর সতত ধর্ম্মেতে রহে মতি।
এত শুনি তুষ্ট হয়ে কহে দণ্ডপাণি,
পরম সুশীলা তুমি রাজার নন্দিনী।
তব বাক্যে সানন্দ হইল মম মন,
বর মাগ বিনা সত্যবানের জীবন।
সাবিত্রী কহিল, আর না করিব লোভ,
লোভেপাপ,পাপে মৃত্যু,পাছেহয় ক্ষোভ।
সে কারণ বর নিতে ভয় বাসি মনে,
শুনিয়া কৌতুকে যম কহে সেই ক্ষণে।
সত্যবান-জীবন ছাড়িয়া অন্য বর,
যাহা ইচ্ছা মাগ, তুমি আমার গোচর।
সাবিত্রী কহিল, বর মাগি যে শমন,
রাজ্যহীন আছে রাজা দেহ রাজ্যধন।
যম বলে শুন রাজ্য পাবে নৃপবর,
বিলম্বে নাহিক কার্য্য, যাহ নিজ ঘর।
সাবিত্রী কহিল, শুন মম নিবেদন,
অবশ্য হইবে যাহা বিধির সৃজন।
মায়াতে মোহিত সবে, সত্যপথ ত্যজে,
ঘর ঘোর বিপদসাগরে মাত্র মজে।
আমার আমার করি বলে সর্ব্বজন,
মিথ্যা ঘর পরিবারে মজাইয়া মন।
এ সব পালন হেতু ত্যজে নিজ ধর্ম্ম,
ভরণ পোষণ করে করিয়া কুকর্ম্ম।
পশ্চাতে অধর্ম্মভাগী হয় সেই জনা,
নিজ অঙ্গে ভোগ করে বিবিধ যন্ত্রণা।
নয়ন থাকিতে অন্ধপ্রায় যত লোক,
কর্ম্মসূত্রে বন্ধ যেন তসরের পোক।
বিধির নির্ব্বন্ধ সেই বৃক্ষপত্র খায়,
যথাকালে আপনার কর্ম্মফল পায়।
জানিয়া তথাপি তারা থাকে অনায়াসে
পাছে বিপরীত বুদ্ধি হয় কোন দোষে
সুখেতে থাকিব হেন ভাবিয়া অন্তরে
নিজসূত্রে বেষ্টিত হইয়া পাছে মরে।
সেই মত পৃথিবীতে হৈল যত লোক
মায়ামোহে মজিয়া পশ্চাতে পায় শো
সংসার অসার প্রভু সার ধর্ম্মপথ,
তাহা বিনা আমার নাহিক মনোরথ
ঘর ঘোর বন্ধনে যাইতে কদাচন,
নিশ্চয় জানিহ দেব! নাহি মম মন
আজ্ঞা কর মুহূর্ত্তেক থাকিব সংহতি
এত শুনি তুষ্ট হয়ে বলে মৃত্যুপতি,
ধন্য তব চরিত্র, আমারে চমৎকার
অগোচর নহে মম অখিল সংসার।

অল্পকালে ধর্ম্মেতে এতেক তব মতি,
তোমার তুলনা যোগ্য, নাহি দেখি, ক্ষিতি।
পৃথিবীতে তোমার হইল যত যশ,
মধুর বচনে তব হইলাম বশ।
স্বামী সত্যবানের জীবন ভিন্ন বর,
যাহা ইচ্ছা, মাগ, লহ আমার গোচর।
কন্যা বলে এই সত্যবানের ঔরসে,
হইবেক এক পুত্র পঞ্চম বরষে।
হেন মতে দেহ মোরে শতেক নন্দন,
অঙ্গীকার নিজ বাক্য করহ পালন।
কৃতান্ত কহিল, ঘরে যাও গুণবতি!
মম বরে হবে তব শতেক সন্ততি।
এত বলি শীঘ্রগতি চলিল শমন,
সাবিত্রী তাহার পাছে করিল গমন।
যম বলে, কি কারণে যাহ তুমি কোথা,
চারি বর দিলাম জঞ্জাল কর বৃথা।
সাবিত্রী কহিল, দেব! উত্তম কহিলা,
শত পুত্র জন্মিবে আপনি বর দিলা।
অলঙ্ঘ্য তোমার বাক্য কে পারে লঙ্ঘিতে,
আমার হইবে পুত্র সত্যবান হতে।
ইহার বিধান আগে কর ধর্ম্মরায়!
তোমার সংহতি মম নাহি কোন দায়।
সাবিত্রীর মুখে শুনি এতেক ভারতী,
পরম লজ্জিত হয়ে কহে মৃত্যুপতি
বিশেষ করিলা ব্রত চতুর্দ্দশী দিনে,
পাইলা এ চারি বর তাহার কারণে।
দ্বিতীয় তোমার কর্ম্ম কহনে না যায়,
নতুবা শুনেছ কোথা মলে প্রাণ পায়।
লহত তোমার পতি রাজা সত্যবান।
কৌতুকে গমন কর আপনার স্থান॥

কাশীরাম দাস।

জরতীবেশে অন্নদার ছলনা।

মায়া করি মহামায়া হইলেন বুড়ী,
ডান করে ভাঙ্গা লড়ী, বাম কক্ষে ঝুড়ী।
ঝাঁকড় মাকড় চুল নাহি আঁদি সাঁদি,
হাতদিলে ধূলা উড়ে যেন কেয়াকাঁদি।
ডঙ্গর উকুন নীকি করে ইলিবিলি,
কোটি কোটিকাণকোটারিরকিলিকিলি।
কোটরে নয়ন দুটি মিটিমিটি করে,
চিবুকে মিলিয়া নাসা ঢাকিল অধরে।
ঝর ঝর ঝরে জল, চক্ষু মুখ নাকে,
শুনিতেনা পান কাণে শত শত ডাকে।
বাতে বাঁকা সর্ব্বঅঙ্গ পিঠে কুঁজভার,
অন্নবিনা অন্নদার অস্থিচর্ম্ম সার।
শত গাটি ছেঁড়া টেনা করি পরিধান,
ব্যাসের নিকটে গিয়া হৈলা অধিষ্ঠান।
ফেলিয়া চুপড়ী লড়ী আহা উহু করে,
জানু ধরি বসিলা বিরস-মুখী হয়ে।

ভূমে ঠেকে থুথি হাঁটু কাণ ঢেকে যায়,
কুঁজ-ভরে পিঠডাঁড়া ভূমিতে লুটায়।
উকুনের কামড়েতে হইয়া আকুল,
চক্ষু মুদি দুই হাতে চুলকান চুল।
মৃদুস্বরে কথা কন অন্তরে হাসিয়া,
ওরে বাছা বেদব্যাস! কি কর বসিয়া?
তিন কাল গিয়া মোর এক কাল আছে,
পতি পুত্র ভাই বাপ কেহ নাহি কাছে।
বাঁচিতে বাসনা নাই, মরিবারে চাই,
কোথা মৈলে মোক্ষ হবে ভাবিয়া না পাই।
কাশীতে মরিলে তাহে পাপভোগ আছে'
তারক মন্ত্রেতে শিব মোক্ষ দেন পাছে।
এই ভয়ে সেখানে মরিতে সাধ নাই,
মৃত্যুমাত্র মোক্ষ হয়, কোথা হেন ঠাঁই?
তুমি না কি কাশী করিয়াছ, মহাশয়,
সত্য করি কহ, হেথা মরিলে কি হয়?
ব্যাস কন, এই পুরী কাশী হৈতে বড়,
মৃত্যুমাত্র মোক্ষ হয় এই কথা দড়।
বুদ্ধি যদি থাকে, বুড়ি! এথা বাস কর,
সদ্য মুক্ত হবি, যদি এই থানে মর।
ছলেতে অন্নদা দেবী কহেন রুষিয়া,
মরণ টাঁকিলি বেটা অনাথা দেখিয়া।
তোর মনে আমি বুড়ী এখনি মরিব,
সকলে মরিবে আমি বসিয়া দেখিব।
ঊর্দ্ধগ বিকারে মোর পড়িয়াছে দাঁত,
অন্ন বিনা অম্ল বিনা শুকায়েছে আঁত।
বায়ুতে পাকিয়া চুল হৈল শণনুড়ি,
বাতে করিয়াছে খোঁড়া, চলি গুড়িগুড়ি।
শিরঃশূলে চক্ষু গেল, কুঁজা কৈল কুঁজে,
কতটা বয়স মোর, যদি কেহ বুঝে।
কাণকোটারিতে মোর কাণ হৈল কালা,
কেটা মোরে বুড়ী বলে, এত বড় জ্বালা!
এত বলি ছলে দেবী ক্রোধভরে যান,
আর বার ব্যাসদেব আরম্ভিলা ধ্যান।
জগতে যে কিছু আছে অধীন দেবের,
শাস্ত্রে বলে সেই দেব অধীন মন্ত্রের।
ধ্যানের প্রভাবে দেবী চলিতে নারিয়া,
পুনশ্চ ব্যাসের কাছে আইলা ফিরিয়া।
বুড়ী দেখি অরে বাছা! অনুকূল হও,
এথা মৈলে কি হইবে, সত্য করি কও।
বুড়া বয়সের ধর্ম্ম অল্পে হয় রোষ,
ক্ষণে ক্ষণে ভ্রান্তি হয়, এই বড় দোষ।
মনে পড়েনা রে বাছা, কি কথা কহিলে,
পুনঃ কহ কি হইবে এথানে মরিলে?
ব্যাসদেব কন, বুড়ী বুঝিতে নারিলে,
সদ্য মোক্ষ হইবেক এথানে মরিলে।
বুড়ী বলে, হায় বিধি করিলেক কালা,
কি বল, বুঝিতে নারি, এত বড় জ্বালা।
পুনশ্চ চলিল দেবী, ছলে ক্রোধ করি,
ব্যাসদেব পুনশ্চ বসিলা ধ্যান ধরি।
ধ্যানের অধীনা দেবী চলিতে নারিলা,
পুনশ্চ ব্যাসের কাছে ফিরিয়া আইলা।
এইরূপে দেবী, বার পাঁচ ছয় সাত,
ব্যাসের নিকটে করিলেন যাতায়াত।
দৈবদোষে ব্যাসদেবে উপজিল ক্রোধ,
বিরক্ত করিল মাগী, কিছু নাহি বোধ।

একে বুড়ী আরো কালা, চক্ষে নাহি সুঝে,
বারে বারে ধ্যান ভাঙ্গে কহিলে না বুঝে।
ডাকিয়া কহিলা, ক্রোধে কাণের কুহরে,
গর্দ্দভ হইবে বুড়ী এখানে যে মরে।
বুঝিনু বুঝিনু বলি করে ঢাকি কাণ,
তথাস্তু বলিয়া দেবী কৈলা অন্তর্দ্ধান।
বুড়ী না দেখিয়া ব্যাস আন্ধার দেখিলা
হায় বিধি অন্নপূর্ণা আসিয়া ছলিলা!
নিকটে পাইয়া নিধি চিনিতে নারিনু,
হায় রে আপনা খেয়ে কি কথা কহিনু!
বিধি বিষ্ণু শিব আদি তোমার মায়ায়,
মৃণালের তন্তুমধ্যে সদা আসে যায়।
প্রকৃতিপুরুষরূপা তুমি সূক্ষ্ম স্থূল,
কে জানে তোমার তত্ত্ব, তুমি বিশ্বমূল।
বাক্যাতীত গুণ তব, বাক্যে কত কব,
শক্তিযোগে শিবসংজ্ঞা শক্তিলোপে শব।
শরীর করিনু ক্ষয় তোমারে ভাবিয়া,
কি গুণ বাড়িল তব ব্যাসেরে ছলিয়া?
ব্যাস-বারাণসী হবে ভাবিলাম বসি,
বাক্য-দোষে হইল গর্দ্দভ-বারাণসী!

অন্নদার ভবানন্দ-ভবনে যাত্রা।

অন্নপূর্ণা উত্তরিলা গাঙ্গনীর তীরে,
পার কর বলিয়া ডাকিলা পাটনীরে।
সেই ঘাটে খেয়া দেয় ঈশ্বরী পাটনী,
ত্বরায় আনিল নৌকা বামাস্বর শুনি।
ঈশ্বরীরে জিজ্ঞাসিল ঈশ্বরী পাটনী,
একা দেখি কুলবধূ, কে বট আপনি?
পরিচয় না দিলে করিতে নারি পার,
ভয় করি, কি জানি কে দিবে ফের ফার।
ঈশ্বরীরে পরিচয় কহেন ঈশ্বরী,
বুঝহ ঈশ্বরী আমি পরিচয় করি।
বিশেষণে সবিশেষ কহিবারে পারি,
জানহ স্বামীর নাম নাহি ধরে নারী।
গোত্রের প্রধান পিতা মুখবংশজাত,
পরম কুলীন স্বামী বন্দ্যবংশখ্যাত।
পিতামহ দিলা মোরে অন্নপূর্ণা নাম,
অনেকের পতি, তেঁই পতি মোর বাম।
অতি বড় বৃদ্ধ পতি সিদ্ধিতে নিপুণ,
কোন গুণ নাই তার কপালে আগুন!
কুকথায় পঞ্চ মুখ কণ্ঠভরা বিষ,
কেবল আমার সঙ্গে দ্বন্দ্ব অহর্নিশ।
গঙ্গা নামে সতা, তার তরঙ্গ এমনি,
জীবনস্বরূপা সে স্বামীর শিরোমণি।
ভূত নাচাইয়া পতি ফেরে ঘরে ঘরে,
না মরে পাষাণ বাপ দিলা হেন বরে।
অভিমানে সমুদ্রেতে ঝাঁপ দিলা ভাই,
যে মোরে আপনা ভাবে তারি ঘরে যাই।
পাটনী বলিছে আমি বুঝিনু সকল,
যেখানে কুলীন জাতি সেখানে কন্দল।

শীঘ্র আসি নায়ে চড়, দিবা কিবা বল,
দেবী কন, দিব আগে পারে লয়ে চল।
যার নামে পার করে ভবপারাবার,
ভাল ভাগ্য পাটনী তাহারে করে পার।
বসিলা নায়ের বাড়ে, নামাইয়া পদ,
কিবা শোভা নদীতে ফুটিল কোকনদ!
পাটনী বলিছে মা গো বৈস ভাল হয়ে,
পায়েধরি কি জানি কুম্ভীরে যাবে লয়ে।
ভবানী বলেন, তোর নায়ে ভরা জল,
আলতা ধুইবে, পদ কোথা থুব বল।
পাটনী বলিছে মা গো শুন নিবেদন,
সেঁউতী উপরে রাখ ও রাঙ্গা চরণ।
পাটনীর বাক্যে মাতা হাসিল অন্তরে,
রাখিলা দুখানি পদ সেঁউতী উপরে।
বিধি বিষ্ণু ইন্দ্র চন্দ্র যে পদ ধেয়ায়,
হৃদে ধরি ভূতনাথ ভূতলে লুটায়।
সে পদ রাখিলা দেবী সেঁউতী উপরে,
তার ইচ্ছা বিনা, ইথে কি তপ সঞ্চরে।
সেঁউতীতে পদ দেবী রাখিতে রাখিতে,
সেঁউতী হইল সোণা দেখিতে দেখিতে।
সোণার সেঁউতী দেখি পাটনীর ভয়,
এত মেয়ে মেয়ে নয়, দেবতা নিশ্চয়।
তটে উত্তরিল তরী, তারা উত্তরিলা,
পূর্ব্বমুখে সুখে গজগমনে চলিলা।
সেঁউতী লইয়া কক্ষে চলিল পাটনী,
পিছে দেখি তারে দেবী ফিরিলা আপনি।
সভয়ে পাটনী কহে চক্ষে বহে জল,
দিয়াছ যে পরিচয় বুঝিনু সে ছল।
হের দেখ সেঁউতীতে থুয়েছিলা পদ,
কাঠের সেঁউতী মোর হৈল অষ্টাপদ।
ইহাতে বুঝিনু তুমি দেবতা নিশ্চয়,
দয়ায় দিয়াছ দেখা, দেহ পরিচয়।
তপ জপ জানি নাহি ধ্যান জ্ঞান আর,
তবে যে দিয়াছ দেখা দয়া সে তোমার।
যে দয়া করিল মোর এ ভাগ্য উদয়,
সেই দয়া হৈতে মোরে দেহ পরিচয়।
ছাড়াইতে নারি, দেবী কহিলা হাসিয়া,
কহিয়াছি সত্য কথা, বুঝহ ভাবিয়া।
আমি দেবী অন্নপূর্ণা প্রকাশ কাশীতে,
চৈত্র মাসে মোর পূজা শুক্ল অষ্টমীতে
ভবানন্দ মজুন্দার-নিবাসে রহিব,
বর মাগ মনোনীত যাহা চাহ দিব।
প্রণমিয়া পাটনী কহিছে যোড় হাতে,
আমার সন্তান যেন থাকে দুধে ভাতে।
তথাস্তু বলিয়া দেবী দিলা বর দান,
দুধে ভাতে থাকিবেক তোমার সন্তান।

গুণাকর ভারতচন্দ্র রায়।

মাতৃভাষা।

মায়ের কোলেতে শুয়ে, উরুতে মস্তক থুয়ে,
থল থল সহাস্য বদন ;
অধরে অমৃত ক্ষরে, আধো আধো মৃদুস্বরে,
আধো আধো বচনরচন।

কহিতে অন্তরে আশা, মুখে নাহি কটু ভাষা,
ব্যাকুল হোয়েছ কত তায় ;
মা-ম্মা-মা-মা-বা-ব্বা-বা-বা, আবো, আবো, আবা, আবা,
সমুদয় দেববাণী প্রায়।

ক্রমেতে ফুটিল মুখ, উঠিল মনের সুখ,
একে একে শিখিলে সকল,
মেসো, পিসে, খুড়া, বাপ, জুজু, ভূত, ছুঁচো, সাপ,
স্থল, জল, আকাশ, অনল।

ভাল, মন্দ জানিতে না, মল মূত্র মানিতে না,
উপদেশ শিক্ষা হোলো যত ;
পঞ্চমেতে হাতে খড়ি, খাইয়া গুরুর ছড়ি,
পাঠশালে পড়িয়াছ কত।

যৌবনের আগমনে, জ্ঞানের প্রতিভা মনে,
বস্তুবোধ হইল তোমার ;
পুস্তক করিয়া পাঠ, দেখিয়া ভবের নাট,
হিতাহিত করিছ বিচার।

যে ভাষায় হোয়ে প্রীত, পরমেশ-গুণ-গীত,
বৃদ্ধকালে গান কর মুখে ;
মাতৃ-সম মাতৃভাষা, পূরালে তোমার আশা,
তুমি তার সেবা কর সুখে।

স্বদেশ।

জান না কি জীব তুমি, জননী জনম-ভূমি,
যে তোমায় হৃদয়ে রেখেছে ;
থাকিয়া মায়ের কোলে, সন্তানে জননী ভোলে,
কে কোথায় এমন দেখেছে ?
ভূমিতে করিয়া বাস, ঘুমেতে পুরাও আশ,
জাগিলে না দিবা বিভাবরী ;
কত কাল হরিয়াছ, এই ধরা ধরিয়াছ,
জননী-জঠর পরিহরি।
যার বলে বলিতেছ, যার বলে চলিতেছ,
যার বলে চালিতেছ দেহ ;
যার বলে তুমি বলী, তার বলে আমি বলি,
ভক্তিভাবে কর তারে স্নেহ।
প্রসূতি তোমার যেই, তাঁহার প্রসূতি এই,
বসুমাতা মাতা সবাকার ;
কে বুঝে ক্ষিতির রীতি, তোমার জননী ক্ষিতি,
জনকের জননী তোমার।
প্রকৃতির পূজা ধর, পুলকে প্রণাম কর,
প্রেমময়ী পৃথিবীর পদে,
বিশেষতঃ নিজ দেশে, প্রীতি রাখ সবিশেষে,
মুগ্ধ জীব যার মোহ-মদে।
ইন্দ্রের অমরাবতী, ভোগেতে না হয় মতি,
স্বর্গ-ভোগ উপসর্গ সার ;
শিবের কৈলাস ধাম, শিবপূর্ণ বটে নাম,
শিবধাম স্বদেশ তোমার।
মিছা মণি মুক্তা হেম, স্বদেশের প্রিয় প্রেম,
তার চেয়ে রত্ন নাই আর ;

সুধাকরে কত সুধা, দূর করে তৃষ্ণা ক্ষুধা,
স্বদেশের শুভ সমাচার।
ভ্রাতৃ-ভাব ভাবি মনে, দেখ দেশবাসিগণে,
প্রেমপূর্ণ নয়ন মেলিয়া;
কত রূপ স্নেহ করি, দেশের কুকুর ধরি,
বিদেশের ঠাকুর ফেলিয়া।
স্বদেশের প্রেম যত, সেই মাত্র অবগত,
বিদেশেতে অধিবাস যার,
ভাব তুলি ধ্যানে ধরে, চিত্তপটে চিত্র করে,
স্বদেশের সকল ব্যাপার।
স্বদেশের শাস্ত্রমতে, চল সত্য ধর্ম্মপথে,
সুখে কর জ্ঞান আলোচন,
বৃদ্ধি কর মাতৃভাষা, পূরাও তাহার আশা,
দেশে কর বিদ্যা বিতরণ।

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত।

বঙ্গভূমির প্রতি।

(কবির ইউরোপে গমন উপলক্ষে লিখিত)

রেখো মা, দাসেরে মনে, এ মিনতি করি পদে।
সাধিতে মনের সাধ,
ঘটে যদি পরমাদ—
মধুহীন ক'রো না গো, তব মনঃকোকনদে।
প্রবাসে দৈবের বশে,
জীবতারা যদি খসে,
এ দেহ আকাশ হতে, নাহি খেদ তাহে।
জন্মিলে মরিতে হবে,
অমর কে কোথা কবে,—

চির স্থির কবে নীর, হায় রে, জীবননদে ?
কিন্তু যদি রাখ মনে,
নাহি মা, ডরি শমনে—
মক্ষিকাও গলে না গো, পড়িলে অমৃত-হ্রদে !
সেই ধন্য নরকুলে,
লোকে যারে নাহি ভুলে,
মনের মন্দিরে নিত্য সেবে সর্ব্বজন।
কিন্তু কোন্ গুণ আছে,
যাচিব যে তব কাছে,
হেন অমরতা আমি, কহ গো শ্যামা জন্মদে!
তবে যদি দয়া কর,
ভুল দোষ, গুণধর,
অমর করিয়া বর দেহ দাসে সুবরদে !
ফুটি যেন স্মৃতিজলে,
মানসে, মা, যথা ফলে
মধুময় তামরস—কি বসন্ত, কি শরদে।

মাইকেল মধুসূদন দত্ত।

চিতোরের পতন।

নিহত নিকর শূর, পড়িল চিতোর পুর,
হিন্দু-সূর্য্য অস্তগিরিগত ;
দাসত্ব দুর্জয় ক্লেশ, রাজ-স্থানে সমাবেশ,
তাপতমস্বিনী পরিণত।
যখন যবন আসি, সমর-তরঙ্গে ভাসি,
পৃথুরাজে পরাভূত করে,
হিন্দুর প্রতাপ লেশ, যাহা কিছু অবশেষ,
ছিল মাত্র চিতোর নগরে।

যথা ঘোর অমানিশা, তমোপূর্ণ দশ দিশা,
আকাশে জলদ আড়ম্বর,
মেঘহীন এক দেশে বিমল উজ্জ্বল বেশে,
দীপ্তি দেয় তারক সুন্দর ;
অথবা তরঙ্গ-রঙ্গ, জলধির অঙ্গ সঙ্গ,
স্রোতে হয় তৃণ তিন খান,
তমোময় সমুদয়, কিছু নাহি দৃষ্ট হয়,
পরিক্লান্ত পোতপতি-প্রাণ ;
বিপদ বারণ হেতু, শৈলোপরি যেন কেতু,
প্রদীপ্ত আলোক শোভা পায় ;
সেরূপ ভারত দেশে, স্বাধীনতা-সুখ শেষে,
ছিল মাত্র রাজপুতনায়।
কি হইল হায় হায় ! সে নক্ষত্র লুপ্তকায়,
নিভিল সে আলোক উজ্জ্বল ;
যবনের অহঙ্কার, চূর্ণ হয়ে কত বার,
এই বার হইল সফল।
চিতোরের অনুগত, সামন্ত ভূপতি যত,
একে একে স্বাধীনতা-চ্যুত ;
সোলাঙ্কি প্রমরা হার, পুরীহর আদি আর,
শুদ্ধবংশ কত রাজপুত।
কোথায় অবন্তী আর ? কোথা দেব-গিরি, ধার ?
কোথায় মন্দোর হারাবতী ?
আলাউদ্দীনের দণ্ড, করে সব লণ্ড ভণ্ড,
কি বর্ণিব যে হলো দুর্গতি।
ভাঙ্গিয়া পাড়িল যত, দেবালয় শত শত,
শিল্পচাতুরীর একশেষ ;
লুটে নিল সব ধন, চিতোরের সিংহাসন,
ছত্র দণ্ড অস্ত্র রাজবেশ।

পোড়াইয়ে ছার খার, করিলেক ঘর দ্বার,
বাদশার আদেশে কেবল
পদ্মিনীর মনোহর, অট্টালিকা পরিকর,
নষ্ট না করিল দুষ্ট দল।
হের হে পথিক-জন! অদ্যাপি সে সুশোভন,
অট্টালিকা আছে বর্ত্তমান;
সরসীর গর্ভ থেকে, নীরদনিকর ঢেকে,
উঠিয়াছে পর্ব্বত প্রমাণ।
কি হইল হায় হায়! কোথা সব মহাকায়,
তেজঃপুত রাজপুতগণ?
প্রভাতে উঠিয়ে তারা, যুঝিয়ে দিবস সারা,
প্রদোষেতে মুদিল নয়ন।
কে ভাঙ্গিবে সেই ঘুম? ঘোর কালানল ধূম,
ঘেরিয়াছে পলকের দ্বার;
মুদিয়াছে হৃদপদ্ম, বীরত্ব মধুর সদ্ম,
নাহি তাহে শ্বাসের সঞ্চার।
ধরাতলে লোটাইয়ে, নাসারন্ধ্র প্রসারিয়ে,
তুরঙ্গ পতিত শত শত;
বিস্ফারিত, তবু তায় শ্বাস নাহি আসে যায়,
চিবুকেতে রসনা নির্গত।
অদূরে আরোহী তার, প্রদোষের পদ্মাকার,
আধ-বিমুদিত নেত্রে পড়ি;
যে তনু কাঞ্চন সম, ছিল প্রিয়া প্রিয়তম,
ধূলায় যেতেছে গড়াগড়ি।
যত সব রাজপুত্র, বীরত্ব ধীরত্ব-সূত্র,
নৃপবংশ-সমাজে প্রধান;
বলবীর্য্যে নাহি তুল, যার ভয়ে অরিকুল,
চির দিন ছিল কম্পমান।

পরম পৌরুষ বল, সাহস সুখের স্থল,
স্বাধীনতা আনন্দ আকর ;
অগণিত অসম্ভব, গুণরত্নরাজী সব,
বিভূষিত যত বীরবর।
তাঁহাদের কীর্ত্তি-ভানু, দিন দিন পরমাণু
প্রায় হয় কালের দশনে ;
বিনাশে নিস্তার পায়, আছে মাত্র সদুপায়,
কবিতার অমৃত সিঞ্চনে।
করাল কালের কাণ্ড, যেন সদা ক্রীড়া-ভাণ্ড,
এ ব্রহ্মাণ্ড আয়ত্ত তাহার ;
কি মহৎ কিবা ক্ষুদ্র, কি ব্রাহ্মণ কিবা শূদ্র,
তার কাছে সব একাকার।
সিংহাসন অধিষ্ঠাতা, শিরোপরে হেমছাতা,
ধাতাপ্রায় প্রতাপ যাঁহার ;
তাঁহার যেরূপ গতি, অন্নদাস ছন্নমতি,
মরণেতে তারো সে প্রকার।
যে পথে মান্ধাতা গত, কোটি কোটি কত শত,
সেই পথে যায় দীনগণ ;
মান্ধাতা, মনুর জন্য, নাহি আর পথ অন্য,
এক পথ আছে চিরন্তন।
থাকে কিছু কীর্ত্তিলেশ, নাম মাত্র থাকে শেষ,
সেহ শুদ্ধ কবির কল্যাণে ;
কে জানিত যুধিষ্ঠিরে, ভীষ্ম দ্রোণ কর্ণ বীরে,
যদি ব্যাস না বর্ণিত গানে।
কোথায় মাহিষমতী, কোথা বা সে দ্বারাবতী,
কোথায় হস্তিনা শৌরসেনী ?
কোথায় কৌশাম্বী আর ? কিবা চিহ্ন আছে তার ?
বহে যথা তটিনীর শ্রেণী।

যেই পথে তারা গত, সেই পথে অবনত,
ভরদ্বাজ ঋষির আশ্রম ;
পাতার কুটীর বলি, কভু কাল মহাবলী,
করে নাই স্বতন্ত্র নিয়ম।
মধুমাসে মনোহর, সৌরভেতে ভর ভর,
প্রফুল্ল ফুলের কত শোভা,
কিন্তু দেখ নিরখিয়ে, ক্ষণে যায় শুকাইয়ে,
ক্ষোভিত ক্ষুধিত মধুলোভা।
কালের নাহিক বোধ, নাহি মানে উপরোধ,
বড় সুখে, বড় রূপে, বাদী ;
সুখপুষ্প যথা ফুটে, অতি বেগে তথা ছুটে,
কট মট বিকট নিনাদী।
কিবা চারু রূপধর, কিবা বহু ধনেশ্বর,
কিবা যুবা নানা গুণধর ;
কালের সুভোগ্য সব, হয় তার মহোৎসব,
পেলে হেন খাদ্য পরিকর।
শোক তাপে জরা যেই, যাহার বিপক্ষ নেই,
কাল তারে চিবায় সঘনে ;
এমন নিদয় আর, ত্রিজগতে মেলা ভার,
শিহরিত শরীর, স্মরণে।
হাঁরে রে নিষাদ কাল ! এ কি তোর কর্ম্মজাল,
শোভা না রাখিবি ভববনে ?
যথা কিছু দেখ ভাল, না ঠাহর ক্ষণ কাল,
জালে বদ্ধ কর সেই ক্ষণে।
ওরে ও কৃষক কাল ! কি কর্ষিছে তব হাল ?
জঞ্জাল জঙ্গল বৃদ্ধি পায় ;
উত্তম বাছের বাছ, ফলপ্রদ যত গাছ,
অনায়াসে উপাড়িয়ে যায়।

সুকৃষক যেই হয়, পরিপক্ব শস্যচয়,
সে করে ছেদন সুসময় ;
তুই কাল নিদারুণ, নাস্তি জ্ঞান গুণাগুণ,
কাটিছ তরুণ শস্যচয়।
ধিক্ কাল কালামুখ! ভারতের কোন সুখ,
না রাখিলি ভুবন ভিতর ;
কোথা সব ধনুর্দ্ধর, কোথা সব বীরবর ?
সব খেয়ে ভরিলি উদর।
কি আছে এখন আর ? দাসত্ব-শৃঙ্খল সার,
প্রতি পদে বাঁধা পদে পদে ;
দুর্ব্বল শরীর মন, ম্রিয়মাণ হিন্দুগণ,
তত্ত্বহীন মত্ত দ্বেষ-মদে।
ফলত সকলি ভ্রম, ঘোরতর মোহ তমঃ
সদাচ্ছন্ন মানব-নয়নে ;
সুখ-সূর্য্য সুবিমল, বিষাদ-বারিদ-দল,
পরিবর্ত্ত হয় ক্ষণে ক্ষণে।
যশোরূপ ইন্দ্রধনু, অসার তাহার জনু,
তনু তনু হয় পতিপলে ;
কিবা প্রেম কিবা আশা, সৌন্দর্য্য মাধুর্য্যবাসা,
অচিরাৎ ভস্ম কালানলে ;
সুখ দুঃখ বলাবল, প্রভুত্ব দাসত্ব বল,
কালচক্রে ঘূরিতেছে সদা ;
কভু ঊর্দ্ধে কভু নীচে, কভু আগে কভু পিছে,
এই ভাব দেখ যদা তদা।

৺ রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়।

গঙ্গার উৎপত্তি।

হরি-নামামৃত, পানে বিমোহিত,
সদা আনন্দিত নারদ ঋষি,
গায়িতে গায়িতে অমরাবতীতে
আইলা একদা উজিল দিশি।

হরষ অন্তরে, মহা সমাদরে,
স্বগণ-সংহতি অমর-পতি,
করি গাত্রোত্থান, করিয়া সম্মান,
সাদর সম্ভাষে তোষে অতিথি।

পাদ্য অর্ঘ দিয়া, মুনিরে পূজিয়া,
চন্দ্রাগ্নি প্রভৃতি অমরগণ ;
করিয়া মিনতি, কহে ঋষিপতি,
"কহ কৃপা করি করি শ্রবণ ;

কিরূপে উৎপত্তি, হলো ভাগীরথী,
গাও তপোধন, প্রাচীন কথা ;
বেদের উকতি, তোমার ভারতী,
অমৃত-লহরী-সদৃশ গাথা।"

গুণী-বিশারদ, মুনি সে নারদ,
ললিত পঞ্চমে মিলায়ে তান,
আনন্দে ডুবিয়া, নয়ন মুদিয়া,
তুম্ব বাজাইয়া ধরিলা গান।

"হিমাদ্রি অচল দেব-লীলাস্থল,
যোগেন্দ্র-বাঞ্ছিত পবিত্র স্থান ;
অমর কিন্নর যাহার উপর
নিসর্গ নিরখি জুড়ায় প্রাণ।

যাহার শিখরে, সদা শোভা করে,
অসীম অনন্ত তুষাররাশি ;
যাহার কটিতে ছুটিতে ছুটিতে,
জলদ-কদম্ব জুড়ায় আসি।

যেখানে উন্নত, মহীরুহ যত,
প্রণত উন্নত শিখর-কায় ;
সহস্র বৎসর, অজর অমর,
অনাদি ঈশ্বর মহিমা গায়।

সেই হিমগিরি শিখর-উপরি,
অঙ্গিরাদি যত মহর্ষিগণ ;
আসিত প্রত্যহ, ভকতির সহ,
ভজিতে ব্রহ্মাণ্ড আদি কারণ।

হেরিত উপরে, নীলকান্তি ধরে,
শূন্য ধূ ধূ করে ছড়ায়ে কায় ;
হেরিত অযুত, অযুত অদ্ভুত,
নক্ষত্র ফুটিয়া ছুটিছে তায়।

মণ্ডলে মণ্ডলে, শনি শুক্র চলে,
ঘুরিয়া ঘেরিয়া আকাশময় ;
হেরিত চন্দ্রমা, অতুল উপমা
অতুল উপমা ভানু-উদয়।

চারি দিকে স্থিত দিগন্ত-বিস্তৃত
হেরিত উল্লাসে তুষাররাশি ;
বিস্ময়ে প্লাবিত, বিস্ময়ে ভাবিত
অনাদি পুরুষে আনন্দে ভাসি।”

বলিতে বলিতে, আনন্দ-বারিতে,
দেবর্ষি হইল রোমাঞ্চ-কায় ;

যন ঘনস্বর, গভীর প্রখর,
তানপূরা-ধ্বনি বাজিল তায়।

গায়িল নারদ, ভাবে গদগদ,
"এমন ভজন নাহি রে আর;
ভূধরশিখরে, ডাকিয়া ঈশ্বরে,
গায়িতে অনন্ত মহিমা তাঁর।

ইহার সমান, ভজনের স্থান,
কি আছে মন্দির জগতমাঝে;
জলদ-গর্জ্জন, তরঙ্গ-পতন,
ত্রিলোক চমকি যেথানে বাজে।

কিবা সে কৈলাস, বৈকুণ্ঠনিবাস,
অলকা অমরা নাহিক চাই;
জয় নারায়ণ, বলিয়া যেমন,
ভুবনে ভুবনে ভ্রমিতে পাই।"

নারদের বাণী, শুনি অভিমানী,
অমরমণ্ডলী বিমর্ষ হয়;
আবার আহ্লাদে, গভীর নিনাদে,
সঙ্গীততরঙ্গ বেগেতে বয়।

"ঋষি কয় জন সন্ধ্যা সমাপন,
করি এক দিন বসিলা ধ্যানে;
দেবী বসুন্ধরা মলিনা কাতরা,
কহিতে লাগিলা আসি সেথানে;

"রাখ ঋষিগণ, সমূলে নিধন,
মানব-সংসার হ'ল এবার;
হ'ল ছারখার, ভুবন আমার,
অনাবৃষ্টি-তাপ সহে না আর।"

শুনে ঋষিগণ, করে দৃঢ় পণ,
যোগে দিল মন একান্ত-চিতে ;
কঠোর সাধনা, ব্রহ্ম আরাধনা,
করিতে লাগিলা মানব-হিতে।

মানব-মঙ্গলে, ঋষিরা সকলে,
কাতরে ডাকিছে করুণাময় ;
মানবে রাখিতে, নারায়ণচিতে,
হইল অসীম করুণোদয়।

দেখিতে দেখিতে, হ'ল আচম্বিতে,
গগনমণ্ডল তিমিরময় ;
মিহির নক্ষত্র, তিমিরে একত্র,
অনল বিদ্যুৎ অদৃশ্য হয়।

ব্রহ্মাণ্ড ভিতর, নাহি কোন স্বর,
অবনী অম্বর স্তম্ভিত প্রায় ;
নিবিড় আঁধার, জলধি-হুঙ্কার,
বায়ু-বজ্রনাদ নাহি শুনায়।

নাহি করে গতি গ্রহ-দলপতি,
অবনীমণ্ডল নাহিক ছুটে ;
নদ-নদী-জল হইল অচল,
নির্ঝর না ঝরে ভুধর ফুটে।

দেখিতে দেখিতে, পুনঃ আচম্বিতে,
গগনে হইল কিরণোদয় ;
ঝলকে ঝলকে, অপূর্ব্ব আলোকে,
পূরিল চকিতে ভুবনত্রয়।

শূন্যে দিল দেখা, কিরণের রেখা,
তাহাতে আকাশ প্রকাশ পায়—

ব্রহ্ম সনাতন অতুল চরণ
সলিল-নির্ঝর বহিছে তায় ।

বিন্দু বিন্দু বারি পড়ে সারি সারি
ধরিয়া সহস্র সহস্র বেণী ;
দাঁড়ায়ে অম্বরে কমণ্ডলু করে
আনন্দে ধরিছে কমলযোনি ।

হায় কি অপার আনন্দ আমার
ব্রহ্মসনাতন-চরণ হ'তে ;
ব্রহ্মা-কমণ্ডলে জাহ্নবী উথ'লে
পড়িছে দেখিনু বিমানপথে ।

গভীর গর্জ্জনে দেখিনু গগনে
ব্রহ্ম-কমণ্ডলু হ'তে আবার,
জলস্তম্ভ ধায় রজতের কায়,
মহাবেগে বায়ু করি বিদার ।

ভীম কোলাহলে নগেন্দ্র অচলে
সেই বারিরাশি পড়িল আসি ;
ভূধর-শিখর সাজিয়া সুন্দর
মুকুটে ধরিল সলিল-রাশি ।

রজত-বরণ স্তম্ভের গঠন
অনন্ত গগন ধরেছে শিরে,
হিমানী-আবৃত হিমাদ্রি পর্ব্বত
চরণে পড়িয়া রয়েছে ধীরে ।

চারি দিকে তার রাশি স্তূপাকার
ফুটিয়া ছুটিছে ধবল ফেনা ;
ঢাকি গিরি-চূড়া হিমানীর গুঁড়া
সদৃশ খসিছে সলিলকণা ।

ভীষণ আকার ধরিয়া আবার
তরঙ্গ ধাইছে অচল কায় ;
নীলিম গিরিতে হিমানীরাশিতে
ঘূরিয়া ফিরিয়া মিশায়ে যায়।

হইল চঞ্চল হিমাদ্রি অচল
বেগেতে বহিল সহস্র ধারা ;
পাহাড়ে পাহাড়ে তরঙ্গ আছাড়ে
ত্রিলোক কাঁপিল আতঙ্কে সারা।

ছুটিল গর্ব্বেতে গোমুখী পর্ব্বতে
তরঙ্গ সহস্র একত্রে মিলি,
গভীর ডাকিয়া আকাশ ভাঙ্গিয়া
পড়িতে লাগিল পাষাণ ফেলি।

পালকের মত ছিঁড়িয়া পর্ব্বত
কুঁদিয়া চলিল ভাঙ্গিয়া বাঁধ,
পৃথিবী কাঁপিল তরঙ্গ ছুটিল
ডাকিয়া অসংখ্য কেশরিনাদ।

বেগে বক্রকায় স্রোতঃস্তম্ভ ধায়
যোজন অন্তরে পড়িছে নীচে ;
নক্ষত্রের প্রায় ঘেরিয়া তাহায়
শ্বেত ফেনরাশি পড়িছে পিছে।

তরঙ্গনির্গত বারিকণা যত
হিমানী চূর্ণিত আকার ধরে ;
ধূমরাশি প্রায় ঢাকিয়া তাহায়
জলধনু-শোভা চিত্রিত করে।

শত শত ক্রোশ জলের নির্ঘোষ
দিবস রজনী করিছে ধ্বনি ;

অধীর হইয়া প্রতিধ্বনি দিয়া
পাষাণ খসিয়া পড়ে অমনি।

ছাড়ি হরিদ্বার শেষেতে আবার
ছড়ায়ে পড়িল বিমল ধারা ;
শ্বেত সুশীতল স্রোতস্বতী-জল
বহিল তরল পারা পারা।

অবনীমণ্ডলে সে পবিত্র জলে
হইল সকলে আনন্দে ভোর ;
"জয় সনাতনী পবিত-পাবনী,"
ঘন ঘন ধ্বনি উঠিল ঘোর।

শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

মোহনলালের খেদ।

নিবিয়াছে মহাঝড় ; রণ-প্রভঞ্জন
ভীম পরাক্রমে নর-মহীরুহ-চয়
উপাড়ি ধরায়, শান্ত হয়েছে এখন ;
সবিষাদে সমীরণ ধীরে ধীরে বয়।
মূর্চ্ছান্তে মোহনলাল মেলিয়া নয়ন,
দেখিলা সমরক্ষেত্র, মুহূর্ত্ত তুলিয়া
ম্লান মুখ ; ক্ষত দেহে রক্তপ্রস্রবণ
ছুটিল, পড়িল শিরে আকাশ ভাঙ্গিয়া।
চাহি অস্তমিতপ্রায় প্রভাকর পানে,
বলিতে লাগিলা শোক-উচ্ছ্বসিত প্রাণেঃ—

"কোথা যাও, ফিরে চাও, সহস্রকিরণ!
বারেক ফিরিয়া চাও, ওহে দিনমণি!
তুমি অস্তাচলে, দেব, করিলে গমন,
আসিবে ভারতে চির-বিষাদ-রজনী!
এ বিষাদ-অন্ধকারে নির্ম্মম অন্তরে,
ডুবায়ে ভারত-ভূমি যেও না তপন ;
উঠিলে কি ভাব বঙ্গে নিরীক্ষণ ক'রে,
কি দশা দেখিয়া, আহা! ডুবিছ এখন
পূর্ণ না হইতে তব অর্দ্ধ আবর্ত্তন,
অর্দ্ধ পৃথিবীর ভাগ্য ফিরিল কেমন!

"অদৃষ্ট-চক্রের কিবা বিচক্ষণ গতি,
দেখিতে দেখিতে কত হয় আবর্ত্তন ;
কাহার উন্নতি হবে, কার অবনতি,
মুহূর্ত্তেক পূর্ব্বে, আহা, বলে কোন জন
কালি যেই স্থানে ছিল বৈজয়ন্ত ধাম
আজি দেখি সেই স্থানে বিজন কানন
ভীষণ সময়স্রোত, হায়, অবিরাম,
কত রাজ্য, রাজধানী,—করে নিমগন;

সিরাজ সময়স্রোতে হইয়া পতন,
হারাল পলাশিক্ষেত্রে রাজ্য, সিংহাসন।

কোথায় ভারতবর্ষ, কোথায় ব্রিটন!
অলঙ্ঘ্য পর্ব্বতশ্রেণী, অনন্ত সাগর।
অগণিত রাজ্য, উপরাজ্য অগণন,
অর্দ্ধেক পৃথিবী মধ্যে ব্যাপি কলেবর।
ইংলণ্ডের চন্দ্র সূর্য্য দেখে না ভারত;
ভারতের চন্দ্র সূর্য্য দেখে না ব্রিটন;
পবনের গতি কিংবা কল্পনার রথ,
কোন কালে এত দূর করেনি গমন;
আকাশকুসুম কিংবা মন্দার যেমন,
জ্ঞানিত ভারতবাসী ইংলণ্ড তেমন।

'সেই সে ইংলণ্ড আজি হইল উদয়,
ভারত অদৃষ্টাকাশে স্বপনের মত;
এই রবি শীঘ্র অস্ত হইবার নয়,
খরতর সমুজ্জল, হইবে নিয়ত।
এক দিন, দুই দিন, বহু দিন আর,
কাষ্ঠ পুতুলের মত অভাগা যবন,
বঙ্গরঙ্গ-ভূমে নাহি করিবে বিহার;
কলঙ্কিত করিবে না বঙ্গ-সিংহাসনে।
আজি নহে কালি, কিংবা দুই দিন পরে,
অবশ্য যাইবে বঙ্গ ইংলণ্ডের করে।

"কি ক্ষণে উদয় আজি হইলে তপন!
কি ক্ষণে প্রভাত হ'ল বিগত শর্ব্বরী;
আঁধারিয়া ভারতের হৃদয়-আসন,
স্বাধীনতা শেষ আশা গেল পরিহরি।
যবনের অবনতি করি দরশন,
নিরখিয়া মহারাষ্ট্র গৌরববর্দ্ধিত,
কোন্ হিন্দুচিত্ত নাহি—নিরাশা-সদন—
হয়েছিল স্বাধীনতা-আশায় পূরিত?
কিন্তু তব অস্ত সনে, কি বলিব আর,
সেই আশাজ্যোতিঃ আজি হইবে আঁধার।

"নিতান্ত কি দিনমণি ডুবিলে এ বার,
ডুবাইয়া বঙ্গ আজি শোক-সিন্ধু-জলে?
যাও তবে, যাও, দেব, কি বলিব আর?
ফিরিও না পুনঃ বঙ্গ-উদয়-অচলে।
কি কাজ বল না, আহা! ফিরিয়া আবার?
ভারতে আলোকে কিছু নাহি প্রয়োজন;
আজীবন কারাগারে বসতি যাহার,
আলোক তাহার পক্ষে লজ্জার কারণ।
কালি পূর্ব্বাসার-দ্বার খুলিবে যখন
ভারতে নবীন দৃশ্য করিবে দর্শন।

"আজি গেলে, কালি পুনঃ হইবে উদয়,
গেল দিন, এই দিন ফিরিবে আবার;
ভারত-গৌরব-রবি ফিরিবার নয়,
ভারতের এই দিন ফিরিবে না আর।
ফিরিবে না মৃতদেহ বিগত জীবন,
বাঁচিবে না রণাহত অভাগা সকল;
মৃতদেহ-নিপীড়িত শুষ্ক তৃণগণ,
কিছু দিন পরে পুনঃ পাবে নব বল;
এবে মৃত-দেহতলে, বৎসর অন্তরে,
জনমিবে পুনর্ব্বার তাদের উপরে।

"এস সন্ধ্যে! ফুটিয়া কি ললাটে তোমার
নক্ষত্র-রতন-রাজি করে ঝলমল ?
কিংবা শুনে ভারতের দুঃখ-সমাচার,
কপালে আঘাত বুঝি করেছ কেবল,
তাহে এই রক্তবিন্দু হয়েছে নির্গত ?
এস শীঘ্র, প্রসারিয়া ধূসর অঞ্চল,
লুকাও ভারত-মুখ দুঃখে অবনত;
আবরিত কর শীঘ্র এই রণস্থল;
রাশি রাশি অন্ধকার করি বরিষণ,
লুকাও অভাগাদের বিকৃত বদন।

"আসিলে যামিনী দেবী যে বঙ্গ-ভবনে,
আমোদে পূর্ণিত হ'ত সঙ্গীতহিল্লোল
উথলিত ব্যাপি ওই সুনীল গগন;
আজি সে বঙ্গেতে শুধু রোদনের রোল।
পতিহীনা, পুত্রহীনা, ভ্রাতৃহীনা নারী,
ভ্রাতার বিয়োগে ভ্রাতা, করে হাহাকার;
বজ্রসম পুত্রশোক, সহিতে না পারি,
কাঁদে কত পিতা ভূমে হয়ে দীর্ঘাকার।
আজি অন্ধকার-পূর্ণ বঙ্গের সংসার
কোন ঘরে নাই ক্ষীণ আলোক-সঞ্চার।

"ছিল না ঐশ্বর্য্যে বীর্য্যে এই ধরাতলে
সমকক্ষ যবনের,—বীর-পরাক্রম
অস্তাচল হ'ত খ্যাত উদয়-অচলে।
সে বীর জাতির এই দৃঢ় সিংহাসন,
ছিল পঞ্চশত বর্ষ হিমাদ্রি মতন,
অচল, অটল, রাজনৈতিক-সাগরে।
কে জানিত আজি তাহা হইবে পতন
বাঙ্গালীর মন্ত্রণায়, বণিকের করে ?
কিংবা ভাগ্যদোষে যদি বিধি হয় বাম,
শেলপাতা বাজে বুকে শেলের সমান।

"পঞ্চশত বর্ষ পূর্ব্বে যে জাতি দুর্ব্বার,
বিক্রমে ভারতরাজ্য করিল স্থাপন;
তাহাদের সন্তান কি যত কুলাঙ্গার,
হারাইল আজি যারা সেই সিংহাসন ?
ছিল যেই জাতি শ্রেষ্ঠ শৌর্য্যবীর্য্যে রত
সদা তরবারি করে, সদা রণস্থলে;
সেই জাতি এবে মগ্ন বিলাসে সতত;
ঝুলিতেছে দিবানিশি রমণী-অঞ্চলে;
কিছু দিন পরে আর,—বিধির বিধান,—
ক্রীড়াপটে বিরাজিবে মোগল পাঠান।

"অথবা অভাগাদের দোষ অকারণ,
দোষ বিধি, দোষ মন্দভাগিনী ভারত,
চিরস্থায়ী কোন রাজ্য ভারতে কখন
হইবে না, চিরস্থির নক্ষত্র যেমত।
না জানি কি গুপ্ত বিষ ভারত-সলিলে
ভাসে সদা, বহে স্নিগ্ধ মলয় পবনে;
তেজোময় বীরসিংহ ভারতে পশিলে,
কামিনীকোমল হয় তার পরশনে,
ইন্দ্রিয়লালসা বহে সবেগে ধমনী,
বীর্য্য হয় ভোগলিপ্সা, পুরুষ রমণী।
"প্রবেশিল যে বীরত্ব-স্রোত দুর্নিবার,
আর্য্যজাতিসনে এই ভারত-ভিতরে,

কি রত্ন না ফলিয়াছে গর্ব্ভেতে তাহার ?
তুচ্ছ এক কহিনুর, মুকুটে আদরে
পরেন ইংলণ্ডেশ্বরী ;—তৃতীয় নয়ন
উমার ললাটে যেন ; ভারত তোমার
কত শত কহিনুরে পূজেছে চরণ
আর্য্য মন-রত্নাকর দিয়ে উপহার !
ভারতে যখন বেদ হইল সৃজন,
ভাঙ্গে নাই রোমানের গর্ব্ভস্থ স্বপন।

"সেই জাতি অস্ত্রবলে কাটিয়া ভূধর,
অনন্ত অজেয় সিন্ধু করিল বন্ধন ;
রোধিত যাদের অস্ত্রে শূন্যে প্রভাকর,
পাতালে কাঁপিত ডরে বসুধাবাহন ;
যাহাদের তীক্ষ্ণ শরে গগন ভেদিয়া,
কনক চম্পকরাশি করিল হরণ ;
যাহাদের গদাঘাতে বেড়ায় ঘুরিয়া,
অনন্ত আকাশ-পথে সহস্র বারণ ;
যাহাদের কীর্ত্তিকথা অমৃত-সমান,
এখনো মানব জাতি সুখে করে পান ;

"হে বিধাতঃ ! কোন্ পাপ করিল সে জাতি ?
কেন তাহাদের হ'ল এত অবনতি ?
সেই সিংহাসনে, বীর রাবণ-অরাতি
বিরাজিত, বিরাজিত কুরুকুলপতি,
সংখ্যাতীত নরপতি—প্রণামে যাহার
চরণে হইয়াছিল মুকুট অঙ্কিত,—
কুরুক্ষেত্র-জয়ী বীর দয়ার আধার,
ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির ছিল বিরাজিত ;
বসিল,—লজ্জার কথা বলিব কেমনে !
যবনের ক্রীতদাস সেই সিংহাসনে !

"সেই দিন যেই রবি গেলা অস্তাচলে
ভারতে উদয় নাহি হইল আবার ;
পঞ্চশত বর্ষ পরে দূর নীলাচলে,
ঈষদে হাসিতেছিল কটাক্ষ তাহার।
কিন্তু পলাশীতে যেই নিবিড় নীরদ,
করিল তিমিরাবৃত ভারত-গগন !
অতিক্রমি পুনঃ এই অনন্ত জলদ,
হইবে কি সেই রবি উদিত কখন ?
জগতে উদয় অস্ত প্রকৃতিনিয়ম ;
কিংবা জলধর-ছায়া থাকে কতক্ষণ।

"যে আশা ভারতবাসী চিরদিন তরে,
পলাশীর রণরক্তে দিয়ে বিসর্জ্জন,
বলিবে, স্মরিবে, নাহি ভাবিবে অন্তরে
কল্পনে ! সে কথা মিছে কহ কি কারণ ?
থাকুক্ পলাশীক্ষেত্র এখন যেমন ;
থাকুক্ শোণিতে সিক্ত হত যোদ্ধৃবল ;
প্রত্যহ ভারত-অশ্রু হইয়া পতন,
অপনীত হবে এই কলঙ্ক সকল।"
নিরাশা-শোণিত-স্রোত করিল নির্গম
সবেগে, মোহনলাল মুদিল নয়ন।

শ্রীযুক্ত নবীনচন্দ্র সেন।

সমাপ্ত।